810.30924
I 61 a

56

অগ্রদূত

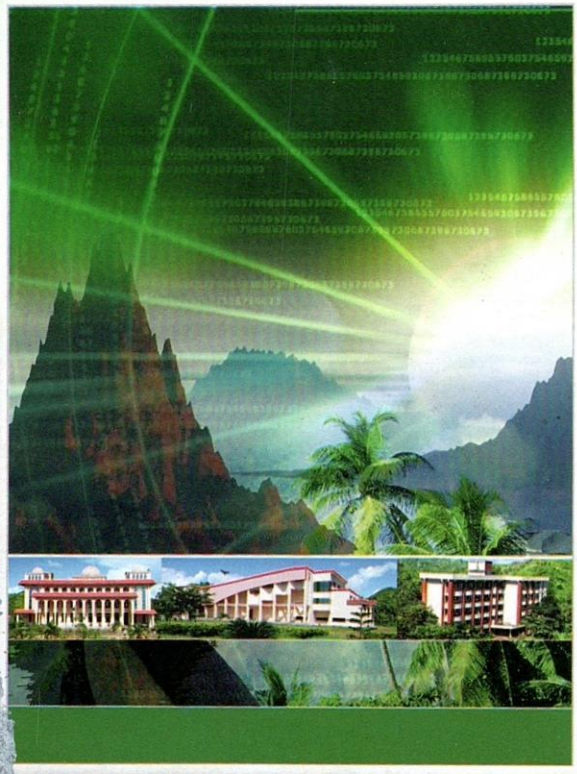

CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, CTG.
Acc. No: D-708
Date: 23-07-2016

কুর'আনিক সায়েন্সস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

Qur'anic Sciences & Islamic Studies
International Islamic University Chittagong

অগ্রদূত

পৃষ্ঠপোষক
মোঃ শাফী উদ্দীন আল মাদানী

উপদেষ্টামন্ডলী
ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ
ড. সিরাজ উদ্দীন
মোঃ রশীদ জাহেদ
মোঃ মুস্তাফা কামেল
মোঃ আলী হোসাইন
মোঃ মুঈন উদ্দীন

সম্পাদক
মোঃ শফিকুর রহমান

সহযোগিতায়
মোঃ হারুনুর রশিদ
মোঃ আরিফ বিল্লাহ

সম্পাদনা পর্ষদ
মুহাম্মদ সুহাইল ছালেহ
আফলাতুন কাউসার
খালেদ মোর্শেদ
মোঃ ফখরুদ্দীন
মারুফ উল আলম

সহযোগিতায়
মোঃ শহিদুল ইসলাম
ইফতেখার আহমদ
ইলিয়াস আরমান
গিয়াস উদ্দিন
শিহাব উদ্দীন

কম্পিউটার কম্পোজ
মুবিনুর রহমান
ওবাইদুল্লাহ্ খান
আতীক হোসাইন

প্রকাশনায়
কুর'আনিক সায়েন্সেস ইসলামিক এন্ড স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১০

মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ
NOKSHA
১৬৭ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম-৪২০৩
ফোন: +০৩১ ২৮৫২৩৪৯, ০১৮১৯৩৯৭৯৯৪

বাণী

ভাইস চ্যান্সেলর
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

সুসংহত জাতিগঠনের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন আমাদের আজকের প্রত্যাশা। প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে এটিই সময়ের দাবী। শিক্ষার সঠিক মান এবং কাঙ্খিত ফলাফল একটি জনগোষ্ঠীকে যেমন জনশক্তিতে পরিণত করে, তেমনি জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা সংযুক্ত না হলে শিক্ষার সঙ্গে মানবিকবোধ ও নৈতিক জীবনবোধের রূপকল্প শিক্ষার্থীর চিন্তায় ও মননে নির্মিত হয় না।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর কুর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রদের উদ্যোগে 'অগ্রদূত' নামক একটি শিক্ষামূলক স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সাহিত্য সত্য, সুন্দর ও শাশ্বত জীবনের প্রতীক। শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নান্দনিকতাকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয় সাহিত্য চর্চা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অপসংস্কৃতির চর্চা যখন সুস্থ সংস্কৃতিচর্চাকে আঘাত করছে, তখন কুর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রদের এ প্রকাশনা সত্যিই ব্যতিক্রমধর্মী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ- যা সাহিত্য চর্চায় উৎসাহব্যাঞ্জক সংযোজন হবে এবং সুস্থ রুচিবোধের বিকাশ সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

কুর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্ররা 'অগ্রদূত' শিরোনামে যে প্রকাশনার জন্ম দিতে চলেছে- তা জ্ঞান প্রদীপ্ত হোক, নান্দনিক হোক সর্ববিবেচনায়– আমি এর সাফল্য কামনা করি এবং এ প্রয়াসের সাথে যাঁরা জড়িত তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ্)

বাণী

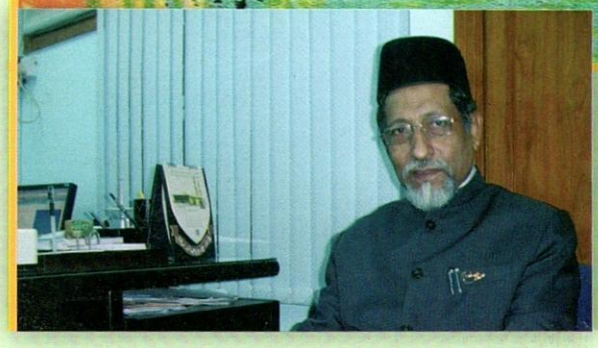

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের কথা অকপটে মানুষের কাছে তুলে ধরা মুমিনের অন্যতম সুমহান কর্তব্য। পৃথিবীর মানুষের জন্য একমাত্র নির্ভুল প্রেসক্রিপশন ইসলাম। পৃথিবীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিবেদিত গোষ্ঠী হচ্ছে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী অপপ্রচার চালাচ্ছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রক বাতিল শক্তি এবং তাদের দোসররা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, আজও হচ্ছে। কখনো এই অপপ্রচারের তীব্রতা কম থাকে, আবার কখনো তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বর্তমান সময়ে এই অপপ্রচার ভয়াবহ ঝড়ের রূপ ধারণ করেছে।

এমনি সময়ে কুর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করার প্রত্যয়ে "অগ্রদূত" প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির অগ্রযাত্রা সূচনা করতে চায়। আমি এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং এটি চিন্তা- জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক)

বাণী

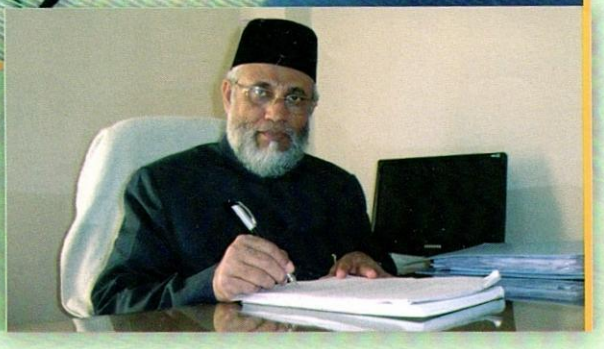

সেক্রেটারী
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট

ইসলামী শরীয়াহ ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার আলো নিয়ে বর্হিবিশ্ব থেকে উচ্চ ডিগ্রীধারী একঝাঁক মেধাবী দেশী-বিদেশী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আদর্শ, শিক্ষিত, নৈতিক ও শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম গঠনের প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম"। এর রয়েছে নিরিবিলি, কোলাহল ও রাজনীতিমুক্ত, পাহাড় ও প্রকৃতির ছায়াঘেরা মায়াভরা সুবিশাল ও দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস, যা পরিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক মানের স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম জ্ঞান-বিজ্ঞান, মেধাবিকাশ শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা, উল্লেখযোগ্য অবদান ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। এখানকার প্রাজ্ঞ শিক্ষকগণ প্রায় সকলেই বিশ্বের বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। জ্ঞান-পিপাসু, চিন্তাশীল ও গবেষক শিক্ষকগণ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রেখে চলেছেন। IIUC'র আছে একদল সুদক্ষ, সুশৃঙ্খল ও মননশীল পরিচালনা কমিটি যাদের নিরলস অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে IIUC'র অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পছন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান IIUC যেখানে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ক্যাম্পাস।

IIUC- শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাতে অনবদ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় 'কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ" বিভাগ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিকাশের লক্ষ্যে প্রকাশ করতে যাচ্ছে 'অগ্রদূত' নামক ম্যাগাজিন।

আমি 'অগ্রদূত' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ প্রকাশনার সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম এমপি)

বাণী

বিভাগীয় প্রধান
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে "আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম" অন্যতম। এটি শুধু বাংলাদেশই নয়, সমগ্র বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হওয়া যেমন গৌরবের শিক্ষক হওয়াও তেমনি মর্যাদা, সম্মান ও আনন্দের।

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও স্বার্থক হয়। আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দূর্নীতি, অনিয়ম, সন্ত্রাস ও অপসংস্কৃতির চর্চায় একাকার। এক্ষেত্রে "আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম" ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষা, নৈতিকতা ও মেধাবিকাশ বিঘ্নিত হয়, এমন সব কর্মকান্ড থেকে মুক্ত। এখানে একজন শিক্ষার্থীকে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়। "কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ" বিভাগের প্রধান হিসেবে বলতে পারি, আমাদের স্কলার শিক্ষকগণ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী। এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এটি এক ব্যতিক্রম ধর্মীয় বিভাগ যেখানে মাদ্রাসার একজন সাধারণ শিক্ষার্থী নিজেকে যুগোপযোগী ও সমাজ বিনির্মাণের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ বিভাগ দেশী-বিদেশী শিক্ষক-শিক্ষার্থী দ্বারা সমৃদ্ধ। বর্তমানে এখানে চায়না, নেপাল, সিরিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া ও আলজেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নরত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের মত এ বিভাগ থেকে স্কলারশীপের মাধ্যমে এক সেমিষ্টারের জন্য "আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া"তে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া আরো কিছু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অনুরূপ স্কলারশীপের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ম্যাগাজিন এক অর্থে শিক্ষার দর্পণ। "কুর'আনিক সায়েন্সস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ" বিভাগের শিক্ষার্থীরা 'অগ্রদূত' নামক যে ধ্রুবতারা প্রকাশ করতে যাচ্ছে আমি তার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং সহযোগিতার জন্য এ বিভাগের সকল শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মুহাম্মদ শাফী উদ্দিন মাদানী)
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

সম্পাদকীয়

সহকারী অধ্যাপক
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

শিক্ষা মানবতার উন্নত গুণাবলী বিকাশের সোপান। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। শিক্ষার সাথে নৈতিকতার নিবিড় সম্পর্ক যদি না থাকে, তাহলে এ ধরণের শিক্ষা জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। খোদাভীতিহীন শিক্ষা নৈতিকতার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত ফলে শিক্ষিত মানুষই নিজেই তখন দূর্নীতির বেড়াজালে আটকে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ্, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নৈতিকতা সমন্বিত শিক্ষা বিশ্ববাসীকে উপহার দেয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ তৎপরতা থেকে বিন্দু মাত্র পিছিঁয়ে নেই। এরি ধারাবাহিকতায় যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে সুপ্ত মেধা বিকশিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগটি ইসলামী শরীয়াহ ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সেমিনার আয়োজন, ম্যাগাজিন প্রকাশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খেলধুলাসহ বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। ইতোপূর্বে এ বিভাগ থেকে আরো ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। এবারের ম্যাগাজিন সম্পাদনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হলে শুরুতে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহর মেহেরবাণীতে পরবর্তীতে নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের বিভাগীয় প্রধান স্যারসহ অন্যান্য সকল সহকর্মীর সহযোগিতা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। ছাত্রদের মধ্য থেকে যাদের সহযোগিতা ম্যাগাজিন প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, তারা হলো : মুহাম্মদ সুহাইল ছালেহ, আফলাতুন কাউসার, মারুফ উল আলম, খালেদ মোর্শেদ, শহীদুল ইসলাম, মুবিনুর রহমান, ওবাইদুল্লাহ্ খান (আশরাফ), আতীক হোসাইন, ইফতেখার আহমদ প্রমুখ।

এই ম্যাগাজিন প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখা দেয়া, বিজ্ঞাপন প্রদান কিংবা অন্য যে কোনভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ। কুর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও আমাদের প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় কিয়ামত পর্যন্ত আলোকবর্তিকা হয়ে যুগোপযোগী ও নৈতিকতা সমন্বিত শিক্ষা বিশ্ববাসীকে উপহার দিবে, মহান আল্লাহর নিকট এটাই আমার প্রত্যাশা।

(মোঃ শফিকুর রহমান)
সম্পাদক
অগ্রদূত ২০১০

খালেদ মোর্শেদ

আফলাতুন কাউসার

মুহাম্মদ সুহাইল ছালেহ

ফকরুদ্দীন

মারুফ উল আলম

সম্পাদনা পরিষদ

সত্যের একমাত্র উৎস মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। বিবেক যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সত্যের উৎস রূপে গ্রহণ করে, তখন গোটা মানব প্রকৃতিতে মহা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সংশয়জনিত দুর্বলতা মুক্ত হয়ে সে বিবেক শক্তিশালী হয়। মানব প্রকৃতি হয় তখন পরিশীলিত সত্তা রূপে বিকশিত ও সমুন্নত।

অন্যদিকে জীবন ও মৃত্যুর ফায়সালা হয় আসমানে, জমীনে নয়। এই যাঁর বিশ্বাস, সত্য কথনে তিনি হন নির্ভীক। নির্দ্বিধায় তিনি সত্যকে তুলে ধরেন ব্যক্তির কাছে, ব্যক্তি সমষ্টির কাছে, শাসিতের কাছে, শাসকের কাছে, শক্তিহীনের কাছে এবং শক্তিধরের কাছে। তাঁর একমাত্র বিবেচ্য বিষয়, প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি আচরণ যেন আল্লাহর সন্তোষ হাসিলের ওয়াসিলা হয়।

আল্লাহর সন্তোষ হাসিলের ওয়াসিলার অতি ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস "অগ্রদূত"। এটি একদিকে "কুর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ" বিভাগের পরিচিতি তুলে ধরবে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-আদর্শ-মহত্ব ও অগ্রযাত্রাকে বেগবান করবে।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভাগীয় প্রধান, শ্রদ্ধেয় স্যার জনাব মোঃ শাফীউদ্দীন আল মাদানী ও জনাব শফিকুর রহমান স্যারসহ এ বিভাগের সকল স্যারের প্রতি, যাঁদের অক্লান্ত শ্রম, মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা, উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা না হলে "অগ্রদূত" আলোর মুখ দেখত না।

সবার জীবন হোক,
"ফুলের মত সুরভিত
চাঁদের মত প্রদীপ্ত
জোৎসনার মত আলোকিত
নদীর মত প্রবাহিত
স্নিগ্ধ শিশিরের মত।"
এই প্রত্যাশায়, শুভেচ্ছার অজস্রতায় –

সূচীপত্র

জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে প্রফেসর আনিসুজ্জামানের সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত বক্তব্য : একটি পর্যালোচনা	*প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহ্‌বুব উল্লাহ*	১১
ইসলাম ও নবীজী (স:) এর প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী:একটি পর্যালোচনা	*প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক*	১৫
আল কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞান	*মোস্তফা কামিল*	২২
রাসূল (সাঃ) ব্যবহৃত দাওয়াতের মাধ্যম ঃ একটি পর্যালোচনা	*মুহাম্মাদ আমিনুল হক*	২৫
'জন' নয় গুণ বড়	*মুহাম্মদ সুহাইল সালেহ্‌*	৩১
বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা	*মুহাম্মদ আসাদুল করিম*	৩৩
আলোকিত জীবনের জন্য	*মোঃ আব্দুল কাদের*	৩৫
আমাদেরকে 'ইক্‌রা'র কাছে ফিরে যেতে হবে	*আফলাতুন আল কাউছার*	৩৭
নিয়্যত : ইবাদতের মৌলিক শর্ত	*খালেদ মোর্শেদ*	৩৯
বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানের অবদান	*মো: ফয়জুল ইসলাম*	৪১
সৃষ্টির বৈচিত্র ঃ মহান প্রভুর রঙ	*মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান*	৪৩
দি হাল্রেড বনাম স্যাটানিক ভার্সেস: প্রাসঙ্গিক কথা	*মুবিনুর রহমান*	৪৫
পলাশীর ট্রাজেডী ঃ আমাদের জন্য একটি শিক্ষা	*মোঃ ফখরুল্লাহ*	৪৭
তাহাজ্জুদ ঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের সোপান	*মোঃ আবদুর রহিম*	৪৮
তারুণ্যের সংকটময় পথ	*আবুল কালাম আজাদ*	৫০
নারীর অধ:পতন ও করণীয়	*রহমত উল্লাহ্‌*	৫২
আল কুরআনে বৈজ্ঞানিক দিক নির্দেশনা	*মোঃ এরশাদুর রহমান*	৫৩
যৌবনের গান: ইসলামী দৃষ্টিকোণ	*তোফায়েল আহমাদ*	৫৫
দারিদ্র, অর্থনীতি এবং মুহাম্মদ (সঃ)	*মু. ইমরান হোসাইন*	৫৭
কুরআন-হাদিস চর্চায় প্রযুক্তি	*মোহাম্মদ আতিক হোসেন*	৫৯
ভিন্ দেশী ভিন্ন ভাষী ঃ ভ্রাতৃত্ব অনুপম	*মুহাম্মাদ আমিমুল এহছান*	৬১
বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ঃ ইসলাম ও দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি উপহাস	*এন. এইচ. মাসুম*	৬৩
সামান্য কম বেশী	*মারুফ উল আলম*	৬৫
Al-Qur'an and Orientalism	*Mohammad Forkan Uddin*	৬৬
কবিতা		৬৭-৬৮
কালের সূচনাতে	*মোঃ ফখরউদ্দিন*	
কলরব	*মো: আহসান উল্লাহ*	
আমি হবো	*আহসান হাবীব*	
ডাক	*হোছাইন মোঃ রিয়াদ*	
মা জননী	*নাসীম বিন ইয়াছিন*	
অগ্রদূত	*মো: ইমরান হোসেন*	
জানার আছে অনেক কিছু	*এফ আই আজাদ*	৬৯
কৌতুক		৭০

জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে প্রফেসর আনিসুজ্জামানের সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত বক্তব্য : একটি পর্যালোচনা

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহ্‌বুব উল্লাহ*

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান মহাজোট সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন না করে তদপরিবর্তে একটি শিক্ষা কমিটি গঠনপূর্বক স্বল্প সময়ের মধ্যে এই শিক্ষা কমিটি দ্বারা জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ক একটি প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করেছে। খসড়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার পূর্বে দেশের সচেতন মানুষের কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে এবং এ জন্যে খসড়া প্রতিবেদনটি ওয়েভ সাইটে দেয়া হয়েছে। কমিটি বলেছে যে, জনগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত মতামত পাওয়ার পর মতামতের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি রচনা করা হবে।

শিক্ষা কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদনের খসড়াটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পর দেশের সচেতন মহল থেকে নানা ধরনের মতামত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হচ্ছে। এ প্রবণতা গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে খুবই পরিপূরক বলে আমি মনে করি। সমাজ জীবনে তো বটেই, এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনেও জাতীয় সমস্যাদি নিয়ে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা হওয়া আবশ্যক এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমেই সকল মত ও পথের যৌক্তিক সমন্বয়ে জাতীয় সকল বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছা প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই ধারাবাহিকতার আলোকেই গত ২৮ অক্টোবর বুধবার দৈনিক সংবাদপত্র 'নয়া দিগন্তে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বনামধন্য শিক্ষক প্রফেসর আনিসুজ্জামানের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রফেসর আনিসুজ্জামান ১৯৭২ সালে গঠিত ড. কুদরাত এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের এবং ১৯৯৭ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রফেসর আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের বিদ্বান সমাজের একজন পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি একাধারে প্রথিতযশা শিক্ষক, গবেষক, প্রাবন্ধিক, লেখক ও সুবক্তা। নয়াদিগন্তে প্রকাশিত প্রফেসর আনিসুজ্জামানের সাক্ষাৎকারটি আমি অতি গুরুত্বের সঙ্গে পাঠ করেছি। এই সাক্ষাৎকারটি সংক্ষিপ্ত হলেও এরই মধ্যে তিনি অনেক বক্তব্য ও মতামত খোলামেলাভাবে দিয়েছেন যা ভাবনার উদ্রেক করে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক ভাবনা ও আদর্শগত অবস্থান এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ঐ সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় নৈতিকতাকে সংযুক্ত করার পক্ষে নন বিধায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন- "আমি ধর্ম শিক্ষার পক্ষে নই"। কেন এবং কী কারণে তিনি ধর্ম শিক্ষার পক্ষে নন এর ব্যাখ্যাও তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে দিয়েছেন যা বিশ্লেষণের ও পর্যালোচনার দাবী রাখে বলে মনে করি। কেন না তাঁর বক্তব্য যেমন যৌক্তিক নয়, তেমনি ধর্ম ও ধর্মীয় নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে অপর্যাপ্ত ও ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন তাই প্রতীয়মান হয়। সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষাকে বিযুক্ত রাখার আদর্শিক ধারণা প্রসূত বক্তব্য রাখার ব্যক্তিগত অধিকার প্রফেসর আনিসুজ্জামানের একশতভাগ রয়েছে। কিন্তু এক সময়ের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের ও জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্যে এ বক্তব্য তিনি দিতে পারেন কি না এবং জাতির নিকট তা গ্রহণযোগ্য কি না তা অবশ্যই একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে বিবেচ্য ও মূল্যায়িত হতে পারে। অধিকন্তু সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার বিযুক্তিকরণ সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন সমাজজীবনের বাস্তবতায় ও যুক্তিশাস্ত্রের আলোকে তা কতটা যৌক্তিক তাও মূল্যায়িত হওয়া আবশ্যক। জাতীয় শিক্ষানীতির সহজ ও সোজা অর্থ হচ্ছে জাতির জন্য শিক্ষানীতি। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে যদি জাতির আশা-আকাঙ্খা, বোধ-বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা এবং নানাবিধ চাহিদার প্রতিফলন ও সেগুলোকে শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করে শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যাবলী সন্নিবেশিত না হয়, তাহলে সেই শিক্ষানীতিকে জাতীয় শিক্ষানীতি হিসেবে বিবেচনা ও গ্রহণ করা যাবে না। "আমি ধর্ম শিক্ষার পক্ষে নই" প্রফেসর আনিসুজ্জামান তাঁর সাক্ষাতকারে এই উক্তি করে জাতীয় শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে খোলামেলা যে অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন, সে দর্শনগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের জনগণের তথা বাংলাদেশী জাতির শিক্ষাদর্শন হিসেবে খুব যৌক্তিক কারণেই গ্রাহ্য হতে পারে না। কেন না বাংলাদেশের ৮৬ শতাংশ মানুষ যেমন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, তেমনি বাকী ১৪ শতাংশের মধ্যে

* উপাচার্য, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

রয়েছে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যথা- হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও প্রকৃতি পূজারী উপজাতি জনগোষ্ঠী, যারা তাদের স্ব-স্ব-ধর্মে বিশ্বাসী। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা দার্শনিকেরা শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিকতা ও নীতিবোধ সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এই নৈতিকতার ও নীতিবোধের প্রধান উৎস যে ধর্ম তা স্বীকার করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানীরা এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ধর্ম শুধু পরলৌকিক বিষয় নয়, ইহলোকে এবং সামাজিক জীবনে ধর্মের, ধর্মীয় আচার-রীতি, বোধ ও বিশ্বাসের এবং ধর্মীয় নীতিবোধের প্রায়োগিক গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে শান্তি-সৌহার্দ্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মানবরচিত আইন ও সেক্যুলার নীতিবোধ যথেষ্ট নয়। পাশ্চাত্যের সেক্যুলার নীতিশাস্ত্রে একজন মানুষ কিংবা মানবসমাজ কেন নীতিবান হবে অর্থাৎ কেন অন্যায়, অবিচার, হানা হানি, দুর্নীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, দুরাচার, অসদাচারণ, পাশবিকতা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকবে এর কোন প্রাক-শর্তা ভিত্তিক নীতিবোধ আশ্রিত জীবনাচারের রূপকল্প ও সূচী নেই। good for goodness ইহজাগতিকতাবাদীদের শ্লোগান হতে পারে কিন্তু এতে কোন জীবনদর্শনের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। মানবজীবনকে যখন ইহজগৎ ও পরজগতের সমন্বয়ে রূপায়িত করা হয় তখন তা ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং কেবল তখনই ধর্মীয় নীতিবোধ মানবতাবোধে উত্তরিত হয়। সেক্যুলার দর্শনের নীতিশাস্ত্রের পেছনে এ নৈতিকতাবোধ সৃষ্টির কোন মানবিক ও মানসিক চাহিদা উপস্থিত নেই এবং good হওয়ার আবশ্যকতা কোন প্রাক-শর্তাধীন নয়। প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসীর তার ধর্মবিশ্বাসজাত নৈতিকতার স্বরূপ ও আবশ্যকতা, এর আচরণগত সূচক এবং জীবনদর্শন ও জীবনাচারে তা কার্যকর ও প্রতিফলিত করার জন্য ধর্ম-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া বাঞ্চনীয় ও অত্যাবশ্যক। ধর্ম হচ্ছে জীবনকে অর্থপূর্ণ ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বাসলব্ধ জীবনাচার। প্রায় প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয় নৈতিকতার ধারণা প্রধানত: চারটি বিশ্বাসের উপর প্রতিস্থাপিত ও তা থেকে উৎসারিত। এ চারটি বিশ্বাস হচ্ছে- (১) আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস; (২) ইহলোক ও পরলোকে বিশ্বাস (৩) সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে পাপ ও পূণ্যের বিভাজন ও পার্থক্যে বিশ্বাস; এবং (৪) মানুষের কর্মে প্রতিফলিত পাপ ও পুণ্যের ভিত্তিতে পরলোকে শাস্তি (দোজখ) ও পুরস্কার (বেহেশত) প্রাপ্তির ধারণায় বিশ্বাস। এই চারটি বিষয়ের সমন্বিত বিশ্বাস থেকেই ধর্মীয় নৈতিকতার তথা আচরিত নৈতিকতার উৎসারণ ঘটেছে। অন্যদিকে ইহজাগতিক (সেক্যুলার) নৈতিকতার উৎস হচ্ছে মানব রচিত নীতিশাস্ত্র ও মানব রচিত আইন। মানব রচিত নীতিশাস্ত্র মানুষকে নৈতিকতাবোধে উজ্জীবীত হতে বলে বটে কিন্তু অনৈতিক কাজ করলে আইনের প্রয়োগে শাস্তির বিধান ছাড়া আর কোন প্রাক-শর্ত এর পেছনে নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইহজাগতিক মানব রচিত নীতিশাস্ত্র ও মানব রচিত ও মানব প্রয়োগকৃত আইন মানুষকে বিশ্বাসে ও বোধে কেন নীতিবান হতে হবে এর কোন বিশ্বাসসঞ্জাত বাধ্যবাধকতা নেই। সমাজ জীবনে আইনকে ফাঁকি দেয়া যায়; আইন প্রয়োগকারীকে প্রভাবিত করা যায়; পাপকে পুণ্য হিসেবে অবস্থা ভেদে সংজ্ঞায়িত করা যায়; শক্তির মদমত্ততা দ্বারা আইনকে অবজ্ঞা কিংবা ভ্রুক্ষেপ করা যায়। একই সঙ্গে দেখা যায় যে, মানব রচিত নীতিশাস্ত্র নৈতিকতার কোন মানদন্ড ভিত্তিক সূচক তৈরী করতে সক্ষম হয় নি। ফলে দেখা যায়, যাহা এক সমাজে নৈতিক আচরণ বলে গ্রাহ্য তাহাই আবার আরেকটি সমাজে অনৈতিক বলে বিবেচিত। অর্থাৎ ইহজাগতিক নৈতিকতার কোন সার্বজনীন মানদন্ড নেই।

মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে মানব সমাজ বিবর্তনের সকল পর্যায়েই নানা ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজের শান্তি, প্রগতি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে অতি আবশ্যক প্রায়োগিকতা অর্জন করেছে, যার উৎসে রয়েছে ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, যুগে যুগে মানুষের চিন্তায় ও চেতনায় কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমধর্মী নাস্তিক্যবাদীর আর্বিভাব ঘটেছে। এদের সংখ্যা অতীতেও যেমন নগন্য ছিল, এখনও নগন্য লক্ষ করা যায়। নাস্তিক্যবাদ সমাজের জন্যে কোন নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি, ফলে মানুষের মধ্যে আস্তিক্যবাদই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাহ্য হয়েছে। মানুষের শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্য যদি আলোকিত নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করা হয়, তাহলে ধর্ম শিক্ষা বিযুক্ত শিক্ষা আদতে কোন শিক্ষাই হতে পারে না। ধর্মীয় শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে মানুষকে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও প্রযুক্তি জ্ঞান দেয়া গেলেই কর্মজীবনে ও সমাজজীবনে মানুষ তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দক্ষতাকে ধর্মীয় নৈতিকতার আলোকে কার্যকর করতে সক্ষম হবে, নতুবা জ্ঞানীর জ্ঞান সমাজের জন্যে ক্ষতি বয়ে আনবে, যে প্রবণতা আমরা পাশ্চাত্যের সেক্যুলার জ্ঞানীদের কর্মকান্ডে লক্ষ্য করছি। একই সঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে যে, ধর্মের আনুষ্ঠানিক লেবাস ধারণ করে যারা ধর্মীয় উম্মাদনার আশ্রয়ে সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে ধর্মভিরুতার নামে ধর্মান্ধতায় লিপ্ত তারা প্রকৃতার্থে ধর্মীয় চেতনা থেকে শুধু বিযুক্তই নয়, ধর্মের নামে তারা ধর্ম ও ধর্মীয় নৈতিকতার বিরুদ্ধাচরণ করছে। তাদের কর্মকান্ডের জন্য ধর্ম দায়ী নয়, দায়ী ধর্মীয় জ্ঞান ও ধর্মের মর্মবাণী সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ অজ্ঞতা দূর করতে হলে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে তাদের স্ব স্ব ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার মাধ্যমে গভীরতর জ্ঞান লাভের

সুযোগ করে দিতে হবে। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের ও দর্শনের সেতুবন্ধন খুঁজে বের করতে হবে। পৃথিবীর ছয়টি প্রধান ধর্মের কোনটিই সমাজের শান্তি, প্রগতি উন্নয়নের বিরুদ্ধে নয়। প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয় মূল্যবোধই মানবিক নৈতিকতা সৃষ্টির সহায়ক। ধর্মীয় শিক্ষাকে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মূল শিক্ষায় অর্ন্তভূক্ত না করে ধর্মীয় শিক্ষাকে আলাদা করে রাখার ফলেই পৃথিবীতে তথাকথিত ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতের কারো কারো মধ্যে অনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতার কারণে সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ হানাহানি, মারামারি, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ বিগ্রহ, মানবিক নির্যাতন পাশবিকতা ইত্যাদি সম্প্রসারিত হচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত পন্ডিতদের অধিকাংশই ধর্মীয় বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করতঃ ধর্মের গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করার কারনেই তারা ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন। সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সৃষ্ট এক ধরনের মনস্তাত্বিক বোধ, যা প্রকৃত শিক্ষার অভাব কিংবা কুশিক্ষার কারণেই সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে আমরা যেমন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ্য করছি তেমনি ভাষাভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক, বর্ণভিত্তিক, জাতীয়তাবোধভিত্তিক এবং অর্থনৈতিক ও আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষমতাভিত্তিক এবং নানা আদর্শভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ্য করছি। একজন ধর্ম বিশ্বাসীর ধর্ম-বিশ্বাস যদি মৌলিক হয় এবং এ বিশ্বাসকে মৌলবাদ বলা হয়, তাহলে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এরূপ যাবতীয় দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে একজন বিশ্বাসীর মৌল বিশ্বাসই মৌলবাদ। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা যেমন ধর্মের অপব্যাখ্যার মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়, তেমনি অন্যান্য সেক্যুলার কেন্দ্রিক আদর্শবাদের অপব্যাখ্যা থেকেও সৃষ্টি হয়। সমাজ বিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই যে, প্রতিটি আদর্শবাদই একেকটি ধর্ম। মানব সমাজে বিজ্ঞানে বিশ্বাস একটি ধর্মীয় বিশ্বাস, যা পজিটিভ ফিলসফী হিসেবে আখ্যায়িত। গণতন্ত্রও একটি আদর্শিক বিশ্বাস যা ধর্মবিশ্বাসেরই প্রতিরূপ। একই কথা খাটে অন্যান্য আদর্শবাদের ক্ষেত্রেও। কাজেই ইহজাগতিকতাবাদ কিংবা সেক্যুলারিজমও প্রকারান্তরে একটি ধর্ম। কী কারনে ধর্ম শিক্ষার পক্ষে নন এ সম্পর্কে যুক্তি দিতে গিয়ে সাক্ষাৎকারে প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেছেন- "আমি ধর্ম শিক্ষার পক্ষে নই।" ধর্ম শিক্ষায় যে সমস্যা দেখা দেয়, তা হলো শুরুতেই একটা পার্থক্য জ্ঞান তৈরী হয়। নিজের ধর্ম বড় এবং অন্যের ধর্মকে ছোট করে শেখানোর প্রবণতা থাকে। এটা ধর্ম শিক্ষার একটা খারাপ দিক। ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে একটা অসুবিধা হচ্ছে যে, আমাদের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পড়ানোর সুযোগ নেই। এতে অমুসলমান ছাত্রদের অসুবিধা হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, নৈতিক শিক্ষা দিতে পারলেই ভাল হতো। যেই আমরা ধর্ম শিক্ষা দিতে যাই তখন দেখা যায় ক্লাসের মধ্যে হিন্দু ছাত্র, খ্রিষ্টান ছাত্র- এই যে ভাগ হয়ে যায় এটা খুব ভালো না। এতে প্রথম থেকেই পার্থক্যের ধরণটা প্রবল হতে থাকে"। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উক্তি করেছেন.... "আমাদের সাধারণ মাদ্রাসায় দেখেছি তাদের ইংরেজী, বাংলা বইগুলো বেশ ভালো। কিন্তু সেগুলো পড়ানো হয় না। বিশেষ করে হিন্দু লেখকের লেখা পড়াতে চায় না। বইতে আছে, সিলেবাসে আছে, কিন্তু সেটা পড়ানো হয় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে পড়ানো হয় না"। উপর্যুক্ত উদ্বৃত বক্তব্য প্রফেসর আনিসুজ্জামানের মতো একজন স্বনামধন্য পন্ডিতের বিধায় তাঁর এ বক্তব্য যেমন অতীব গুরুত্ব বহন করে তেমনি এ বক্তব্য যুক্তিশাস্ত্রের বিচারে ও সমাজ বাস্তবতার আলোকে কতটা গ্রাহ্য কিংবা অসার তা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রফেসর আনিসুজ্জামান ধর্ম শিক্ষার পক্ষে নন, কেন না তিনি মনে করেন ধর্ম শিক্ষা মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান এই পার্থক্য সৃষ্টি করে। প্রফেসর আনিসুজ্জামানের এই বক্তব্য সঠিক হতো যদি আমরা লক্ষ্য করতাম যে সমাজ জীবনে ও বিশ্বসমাজে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসজনিত বিভাজন নেই। যদি মানব সমাজ ধর্মহীন হয়ে যেতে পারতো তাহলে ধর্মীয় পার্থক্য ও বিভাজন থাকতো না। প্রফেসর আনিসুজ্জামানের বক্তব্যের মূল চেতনা হচ্ছে সমাজ জীবনকে ধর্মমুক্ত করা যা নাস্তিকতারই পরিচায়ক। অন্যদিকে বলা যায় সমাজ জীবনে প্রফেসর আনিসুজ্জামান কী কেবল ধর্মভিত্তিক পার্থক্যই লক্ষ্য করেন, অন্য কোন রূপ পার্থক্য লক্ষ্য করেন না? মানুষের মধ্যে কী ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য পাশ্চাত্যবাদী আদর্শভিত্তিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। যিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন অর্থাৎ যিনি গণতন্ত্রী তিনি কী সাম্রাজ্যবাদী, কিংবা যিনি সাম্রাজ্যবাদী তিনি কি পুঁজিবাদী? যিনি বস্তুবাদী তিনি কি ভাববাদী? পৃথিবীতে আদর্শগত পার্থক্যের কারণে মানব সমাজে সর্বযুগেই নানা মাত্রার পার্থক্য ছিল পার্থক্য আছে এবং পার্থক্য থাকবে। মানুষের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য থাকবে। আদর্শগত পার্থক্য আছে বলেই সমাজে চিন্তার ও কর্মের বৈচিত্র্য আছে। আর এ কারনেই সমাজ জীবন পরিবর্তনশীল, অনড় নয়। প্রফেসর আনিসুজ্জামান যে ধর্মনিরপেক্ষবাদী দর্শনে বিশ্বাস করেন সেই ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নেই। নিরেশ্বরবাদীদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নেই?

ঈশ্বরবাদ যদি ধর্ম হয় তাহলে নিরেশ্বরবাদও একই কারণে একধরনের ধর্মীয় মতবাদ। তাহলে ঈশ্বরবাদী ও নিরেশ্বরবাদীদের মধ্যে কি পার্থক্য নেই?

প্রফেসর আনিসুজ্জামান সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে বোধ ও বিশ্বাসগত পার্থক্যের সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেই তাঁর বক্তব্যের অগ্রাহ্যতা ও অসারতা তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। প্রফেসর আনিসুজ্জামানের অবশ্যই অনুধাবনে নেয়া উচিত যে, সমাজ জীবনে যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি ধর্মীয় পরিচয়ের পার্থক্য থাকে তাহলে বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা না দিলেই এ পার্থক্য ঘুচবে না। বরং প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসীর ধর্মকে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধকে যদি বিদ্যালয়ে শিক্ষা চর্চার অংশ করা হয় তাহলে সকল ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযোগ, সহমর্মিতা ও সমঝোতা গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কেন'না সকল ধর্মের মধ্যেই সততা, মানবতা ও নৈতিকতার কথা বলা হয়েছে। মানবাচরণকে বিশুদ্ধ করাই হচ্ছে ধর্মীয় নৈতিকতার মূল উপজীব্য। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত দার্শনিক রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক ও সত্যাগ্রহ দর্শনের উদ্‌গাতা করমচাঁদ গান্ধীর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য- The essence of religion is morality..... that those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means. (M.K. Gandhi, An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth, Penguin Books, 2009, P. 10) প্রফেসর আনিসুজ্জামান মনে করেন যে, নৈতিকতার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। মহাত্মা গান্ধীর এই বক্তব্য প্রফেসর আনিসুজ্জামানদের মতো পন্ডিতদের নৈতিকতা সম্পর্কিত বক্তব্যের ও ধারণার সর্ম্পূণ পরিপন্থী। অথচ এই পন্ডিতজনেরাই মহাত্মা গান্ধীকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিক হিসেবে পরিগণিত করার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসে লিপ্ত।

প্রফেসর আনিসুজ্জামানের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান যে, তিনি ধর্ম শিক্ষাকে নৈতিকতা সম্পন্ন বিজ্ঞানমনস্ক সুনাগরিক সৃষ্টির সহায়ক মনে করেন না এবং এও মনে করেন যে, ধর্ম হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চা ও প্রগতিশীল চিন্তার পরিপন্থী। এখানে শুধু বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের এ প্রসঙ্গে অর্থাৎ ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রদত্ত একটি বহুল পরিচিত মন্তব্য উল্লেখ করছি - Science without religion is lame and religion without science is blind. (The Spiritual and Ethical Foundation of Science and Technology; in Islamic Civilization, Osman Bakar, IAIS Journal of Civilization Studies, Vol. 1. Number 1, October, 2008, P. 91) বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের এই মন্তব্যের পর বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের সম্পর্ক ও গুরুত্ব নিয়ে আর অধিক কিছু বলার বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলে হয় না।

প্রফেসর আনিসুজ্জামানসহ এই ঘরানার পন্ডিতদের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এই যে, এরাঁ দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যাপকতর পড়াশুনা না করেই গভীরতর জ্ঞানের পরিবর্তে ভাসাভাসা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ধর্মসহ যাবতীয় বিষয়ে অযৌক্তিক ও একপেশে চূড়ান্ত মন্তব্য করে ফেলেন। অথচ এরাঁই গনমাধ্যমের প্রপাগান্ডার কারণে বাংলাদেশে প্রখ্যাত-বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছেন ও গণ্য হচ্ছেন। আর এ জন্যেই আমাদের জাতীয় দুর্গতির অবসান হচ্ছে না। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও অন্যান্য ধর্ম শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নেই বলে প্রফেসর আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম শিক্ষা না দেয়ার পেছনে এ বিষয়টি তিনি একটি যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। এটি কোন যুক্তি হতে পারে না, যেমন- মাথা ব্যথা থাকলে মাথা কেটে ফেলা কোন যুক্তি হতে পারে না। যুক্তি হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করা। অর্থাৎ ইসলামধর্ম শিক্ষা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্মও যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া যায় সে ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা। মাদ্রাসায় হিন্দু লেখকদের ও রবীন্দ্রনাথের লেখা পাঠ্যসূচীতে থাকার পরও এগুলো পড়ানো হয় না বলে আনিসুজ্জামান সাহেবের অভিযোগ কতটা সঠিক তা জানি না। তিনি কি শুনা কথা অভিযোগ আকারে করেছেন না কি বিভিন্ন মাদ্রাসায় অনুসন্ধান চালিয়ে তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা তিনিই বলতে পারবেন। এ ধরনের অভিযোগের পেছনে কিছুটা সত্যতা যদি থেকেও থাকে, তবুও এ জাতীয় অভিযোগ গণমাধ্যমে পরিহার করা উচিত, কেননা খোদ এ ধরনের অভিযোগই যুগপৎ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি লেখকের বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব ও সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক বলে প্রতীয়মান। বরং এ জাতীয় অভিযোগের পেছনে যদি কোন সারবত্তা থেকেই থাকে তাহলে প্রয়োজন যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই এর প্রতিকার করা।

* সংকলিত

ইসলাম ও নবীজী (স:) এর প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী: একটি পর্যালোচনা

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক*

প্রাক কথা:

সাম্প্রতিককালে মুসলিম বিশ্ব অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, পশ্চিমা জগৎ কারণে অকারণে ইসলামকে তাদের সকল সমালোচনা ও অভিযোগের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে চলেছে। তারা যে কোন সুযোগে এ ধরণের মন্তব্য করতে কুণ্ঠাবোধ করে না যে ইসলাম একটি অসহিষ্ণু ও সন্ত্রাসী ধর্ম, মুসলমানরা মূলত সন্ত্রাসবাদী এবং বিশ্বের সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের হোতা, আর ইসলামের নবী হচ্ছেন একজন সংকীর্ণমনা পশ্চাদপদ চিন্তাধারার ধারক। মানব সমাজে বিভক্তি সৃষ্টিকারী ও অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ)। এ প্রসঙ্গে প্রথমত: আমাদেরকে দেখতে হবে আসলে কি এ দৃষ্টিভঙ্গী একটি নেহাৎ সাম্প্রতিক বিষয়? না ইসলামের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের এ দৃষ্টিভঙ্গী দীর্ঘ দিনের এবং এটি তাদের স্থায়ী নীতি। আমাদের এও দেখা দরকার পাশ্চাত্যের এ দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কারণ কী এবং এর উৎস কোথায়? এ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে এ বিষয়গুলো পর্যালোচনার চেষ্টা করা হবে।

পাশ্চাত্যের সংজ্ঞা:

পাশ্চাত্য কারা? আমি এখানে পাশ্চাত্য বলতে মূলত: ইউরোপীয় ও আমেরিকানদেরকেই বুঝিয়েছি, যাদের অধিকাংশই আহলুল কিতাব বা নবী মুহাম্মদ পূর্ববর্তী দুই নবী তথা যিশু খ্রীস্ট ও হযরত মূসার অনুসারী। এদের ধর্মীয় পরিচয় হচ্ছে এরা খ্রীস্টান অথবা ইহুদী সম্প্রদায়ের এ বিবেচনায় ইউরোপ, আমেরিকার বাইরে বসবাসরত ইহুদী খ্রীস্টানরাও এ সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত। যেমন: কানাডা, ও অস্ট্রেলিয়াবাসী ইহুদী- খ্রীস্টান সম্প্রদায়।

কার্যত: ইসলাম ও নবীজীর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের তথা ইহুদী খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের অসংঙ্গত আচরণ, অশোভনীয় মন্তব্য এমন কি শিল্পীর তুলিতে তার অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত ঘৃণার বহি:প্রকাশের ঘটনা অহরহ ঘটে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে মুসলিম বিশ্বের অধিবাসীদের অনেকেই এগুলোকে বিবেচনা করছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা রূপে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই, এসব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সুদূর অতীতের সাথে সম্পৃক্ত ইতিহাসের এক ধারাবাহিকতা। যার সূচনা হয়েছিল খোদ নবীজীর জীবদ্দশায় এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন রূপ, রং ও উপায় অবলম্বন করে এহেন আচরণ অব্যাহত রাখে।

গেল বছর এক ডেনিশ কার্টুনিস্ট প্রিয় নবীজীর একটি আপত্তিকর ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করে মহানবী (স:) ও ইসলামের প্রতি তার চরম ঘৃণা ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। এতে সারা দুনিয়া ব্যাপী হৈ চৈ পড়ে যায়। কিন্তু ঐ কার্টুনিস্ট তার কর্মকান্ডের জন্য দু:খ প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এটি কিন্তু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। অতি সাম্প্রতিক কালে এক অস্ট্রেলিয়া শিল্পী কর্তৃক নবীজীর আরেকটি ব্যঙ্গ চিত্র অংকন করে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হলে এর বিরুদ্ধে সে দেশের মুসলিম অধিবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মতামত যাচাইয়ের উদ্যোগ নেয়। এখনও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। আমরাও ঐ কার্টুনের বিপক্ষে ই. মেইল মতামত দেই। ভয় হচ্ছে সে দেশের খ্রীস্টান অধিবাসীগণ এ কার্টুন প্রকাশের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলে তা অনুমতিপ্রাপ্ত হতে পারে।

এর চেয়ো ও দু:খের বিষয় যে, পাশ্চাত্যের অনেক খ্রীস্টান চার্চের দেয়ালে অথবা ছাদে নবীজীর ব্যঙ্গ চিত্র শোভা পাচ্ছে যা ইসলাম ও মহানবী (স:) সম্পর্কে তাদের ধর্মগুরুদের বিকৃত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। যদি আহালুল কিতাব বা ঐশী গ্রন্থের অধিকারী বলে দাবীদারদের এ অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ অনুসারীদের মনোভাব কী হতে পারে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

---

* উপ-উপাচার্য, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

আমরা অতীব দু:খের সাথে লক্ষ্য করছি যে পশ্চিমা দুনিয়ায় কবি, সাহিত্যিক দার্শনিক ও রাজনীতিকদের একটি বড় অংশ ইসলাম ও নবীজীর প্রতি শত্রুতা পোষণকারীদের দলভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, খ্রীস্টান পোপ বেন্ডিক্ট ষোড়শ (Bendict xvi) সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে ধর্ম দর্শনের উপর এক বক্তৃতা প্রদানকালে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম হচ্ছে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম এবং ইসলামের নবী সন্ত্রাসের হোতা। এ ধর্মীয় নেতা তো নিশ্চয় ইসলাম সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কারণে এ মন্তব্য করেন নি, বরং জেনে শুনেই শত্রুতার বশবর্তী হয়েই এহেন মন্তব্য করেছেন। আরো দু:খের বিষয় যে, মুসলিম দুনিয়ার পক্ষ থেকে তাঁর এ অসত্য ভাষণের জন্য দু:খ প্রকাশ করার দাবী উঠলে তিনি দম্ভভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ইসলাম ও নবীজীর প্রতি বৈরী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ কি অজ্ঞতা?

নবীজীর প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ ও তাঁর চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে পশ্চিমাদের এ প্রচেষ্টার মূল কারণ কিন্তু অজ্ঞতা নয়, বরং জেনে শুনে শত্রুতা পোষণ। পবিত্র আল-কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে:

"যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা তাঁকে (নবী মুহাম্মদকে) আপন সন্তান-সন্ততির মতই চিনে, এতদসত্ত্বেও তাদের একটি দল জ্ঞাতসারেই সত্যকে গোপন করে থাকে।" (২:১৪৬)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নবীজী ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও তাদের এহেন ঘৃণিত দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈরী মনোভাব পোষণের কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তর খোদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই দিয়েছেন। মূলত: এর প্রধান কারণ হচ্ছে শত্রুতা। পবিত্র আল কুরআনের ভাষায়:

"এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানব সন্তান এবং জিনদের মধ্য হতে কিছু শত্রু সৃষ্টি (চিহ্নিত) করেছি। যারা পরস্পরে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে এরা তা করতে পারত না; সুতরাং তারা যে সব অপকর্ম করছে তাদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দাও।" (৬:১১২)

বলা বাহুল্য আল কুরআনে উল্লেখিত এ শত্রুতার ধারা বর্তমান কালেও অব্যাহত আছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সিনিয়রের পিতা ও বুশ জুনিয়রের দাদা জর্জ বুশ তাঁর রচিত। **Muhammad the Founder of Islamic Imperialism"** শীর্ষক একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "আরবরা একটি অসভ্য ও অধ:পতিত জনগোষ্ঠী যাদের স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, যেমনটি রেড ইন্ডিয়ানদের ভাগ্যে ঘটেছে। যতদিন না Saracenc তথা আরব সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে ততদিন পর্যন্ত সদাপ্রভু ইহুদীদেরকে তাদের মূল পূর্বপুরুষদের ভূখন্ডে পূন:প্রতিষ্ঠিত করার গৌরবময় কর্মটি সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন না"। এ লেখক আরো মনে করেন যে, ইসলাম হচ্ছে একটি বিপদ যা ভন্ড নবী (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল এবং এর সাফল্যের মূল কারণ ছিল চতুর্থ শতাব্দী থেকে সৃষ্ট পোপদের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। এ লেখক আরো মনে করেন যে, নবীজী ছিলেন মূলত: একজন বড় যাদুকর। তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য নানারূপ ছল-চাতুরী, ধোকাবাজী, অনৈতিকতা ও অশ্লীলতার আশ্রয় নিয়েছিলেন।"[৫]

পক্ষান্তরে আমরা যদি এসব ঐশী গ্রন্থের অনুসারী তথা আহলুল কিতাবদের বাদ দিয়ে বিশ্বের অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের দিকে তাকাই তাহলে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র ভেসে ওঠে। এদের উপাসনালয়সমূহে কখনও ইসলাম ও নবীজী সম্পর্কে কোন বিকৃত চিত্রাংকনের দৃশ্য দৃষ্ট হবে না। এদের অনেককেই ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল অথবা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী দেখতে পাবেন। এমন কি যারা ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন তাদেরকেও ইসলাম ও নবীজীর প্রতি এহেন অশোভনীয় মন্তব্য করতে দেখা যায় না, যে রূপ দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্য জগৎ ও ইহুদী খ্রীস্টানগণ পোষণ করে থাকে এবং আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে পাশ্চাত্যের পন্ডিত দার্শনিকগণ। পাশ্চাত্যের বড় বড় পন্ডিত, নামজাদা দার্শনিক ও বিশ্ববিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের অধিকাংশই ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি তাদের বিকৃত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে কুণ্ঠাবোধ করে নি তাদের দর্শন ও সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে।

---

[৫] R.W. Souther Wester Views of Islam in the Middle Age. (Cambridge, 1962) P.19

দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় পাশ্চাত্য দার্শনিক, পন্ডিত ও তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেক ভিন্নতা সত্ত্বেও অন্ততঃ একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, আর তা হলো ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি শত্রুতা ও বৈরীভাব পোষণ করা। যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশ্চিমা জগতে লালিত হয়ে আসছে। ইসলাম ও ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের এহেন মনোভাবের প্রধান কারণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলামের আবির্ভাব এবং মাত্র অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে আরব উপদ্বীপের গণ্ডী ছাড়িয়ে আফ্রিকা, ইউরোপের রোম ও পারস্য পর্যন্ত এর বিস্তৃতি এবং বিশ্বের বুকে একটি অপ্রতিরোধ্য উদীয়মান শক্তি হিসেবে ইসলামের আবির্ভাব। তাই অন্ততঃ একথা স্বত:সিদ্ধ যে পশ্চিমা জগতের এ দৃষ্টিভঙ্গী কোন সাম্প্রতিক বিষয় নয় বরং সহস্রাব্দ কাল থেকে শতাব্দীর পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে এ মনোভাব লালিত হয়ে আসছে। যার বহি:প্রকাশ ঘটেছে তাদের দর্শন ও সাহিত্যে, ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে, তাদের গল্প গাঁথা ও শিল্পকর্মে এমন কি ধর্মযাজকদের ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায়।

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা দুনিয়ার বিকৃত মনোভাবের একটি জলন্ত নজীর হচ্ছে প্রখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১) রচিত **"Divine Commedy"** গ্রন্থে ইসলামের নবীকে নরকের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থানকারী রূপে চিত্রিত করা। এ গ্রন্থটি এখনও পাশ্চাত্যে বহুলভাবে জনপ্রিয়। যার কমপক্ষে ৭৫টি ইংরেজী অনুবাদ ২২টি ফরাসী অনুবাদ ও অনুরূপ সংখ্যা জার্মান অনুবাদসহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রতি বছর এর লক্ষ লক্ষ কপি পাঠকের হাতে পৌঁছে থাকে। বিংশ শতাব্দীর জনৈকা পশ্চিমা লেখিকা Toma নবীজী সম্পর্কে এ মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করে নি যে (নাউযুবিল্লাহ) ইসলামের নবী মুহাম্মদ তার দলে ভিড়াবার উদ্দেশ্যে লোকদেরকে সস্তা যৌনতা চর্চাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কর্মকান্ডে উৎসাহিত করতেন।[১]

পাশ্চাত্য জগতে নবীজী সম্পর্কে এটিই সাধারণ প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে যে কিছু সংখ্যক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী লোক নাই তা নয়। এরা ইসলামকে একটি ঐশী ধর্ম ও নবীজীকে আল্লাহর রাসূল (স:) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এদের সংখ্যা বৈরী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণকারীদের তুলনায় একেবারেই নগন্য। মুসলিম বিশ্বে এদের দৃষ্টিভঙ্গীকে খুব গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হলেও পশ্চিমা দুনিয়ায় এর কোন প্রভাব আছে বলে মনে হয় না। বরং ইসলাম ও নবীজীর বিরুদ্ধে কোন অসঙ্গত মন্তব্য কিংবা কুরুচীপূর্ণ চিত্র প্রকাশিত হওয়ার দরূন বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও এর জন্য দু:খ প্রকাশ করতেও তারা প্রস্তুত নয়। যেমনটি ঘটেছে নবীজীকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের জন্য ডেনমার্ক সরকারের এবং ইসলাম সম্পর্কে অসত্য তথ্য ভাষণ দেয়ার দরূন খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপ Bendict ষোড়শ এর পক্ষ থেকে দু:খ প্রকাশে অস্বীকৃতি।

নবীজীর ইসলাম অভিযোগের হোতা কারা?

যারা ইসলাম ও নবীজীর বিরুদ্ধে সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করে থাকে তাদেরকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা (ক) ধর্মীয় নেতা ও চার্চের অভিভাবকবৃন্দ। (খ) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (গ) প্রচার মাধ্যম, যথা সংবাদপত্র, সিনেমা ভিডিও টি ভি চ্যানেল ইত্যাদি এবং (ঘ) ধর্ম নিরপেক্ষ দার্শনিক ও চিন্তানায়কগণ।

ভেবে দেখুন এ চার শ্রেণীকে বাদ দিলে আর বাকী থাকে কারা? বাকী থাকে শুধু সাধারণ জনগণ। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার ও অপপ্রচার সমূহের শ্রোতা, পাঠক কিংবা দর্শকশ্রেণী বৈধ কেউ নয়। পশ্চিমা জগতের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চার্চের অবস্থা এই, এসব চার্চের দেয়ালে কিংবা ছাদে এমন কিছু চিত্র শিল্প শোভা পাচ্ছে যাতে ইসলামের নবীকে দেখানো হয়েছে তিনি যেন নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)[২] বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে খ্রীস্টবাদ ও খ্রস্টীয় গীর্জাসমূহ একক কৃতিত্বের(?) দাবীদার। বিশ্বের অন্য কোন ধর্মীয় উপাশনালয়ে ভিন্নধর্মের প্রতি এহেন দৃষ্টিভঙ্গীর বহি:প্রকাশের কোনই উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুস্কর। বরং ইসলাম তো খ্রীস্টানদের নবীকে একজন সত্য নবী ও মেরীকে একজন পূণ্যবতী নারী হিসেবেই বিশ্বাস করে।

---

[১] দেখুন, বাসেম খাফাজী রচিত লিমাযা য়াকরাহুনাহু আল বয়ান ম্যাগাজিনের বিশেষ প্রকাশনা- ২০০৬. পৃ. ৩৪.

[২] এমনকি কোথাও কোথাও এহেন চিত্রের সাথে নবীজীর বিকৃত নাম পর্যন্ত উল্লেখ থাকে।

(খ) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদাহরণ হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পিতার উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এমন কি প্রেসিডেন্ট বুশ জুনিয়র ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি কী আচরণ করেছে তা বিশ্ববাসীর কাছে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট।

(গ) সংবাদ মাধ্যম ও মিডিয়ার অপপ্রচার বিষয়ে লিখতে গেলে একটি পূর্নাঙ্গ গ্রন্থেও সংকুলান হবে না। এখানে শুধু কয়েকটি উদাহরণ পেশ করতে চাই।

যে কোন সংবাদ মাধ্যম বা মিডিয়ার পেছনে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা অপরিহার্য যারা এর প্রধান পৃষ্ঠপোষণের ভূমিকায় থাকে। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্যনীয় যে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে যে সব মিডিয়া সক্রিয় সেগুলোর প্রায় সবকটির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় রয়েছে কোন না কোন খ্রীস্টান পাদ্রী অথবা ধর্মীয় সংস্থা, যেমন,

i. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের লিঞ্চবুর্গ নগরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি Radio and T.V. Channel হতে একটি সাপ্তাহিক Program সম্প্রচারিত হয়। এর দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা এক কোটি। এ প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাম ও নবীজীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করা ও মিথ্যাচার প্রচার। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন একজন এভেঞ্জেলিক পাদ্রী। তিনি Liberty University নামক একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক। এদের একটি ইন্টারনেট ওয়েব সাইট রয়েছে যার শিরোনাম <www.falwell.com> এ ওয়েব সাইটটি ইসলাম সম্পর্কে বিকৃত তথ্যে পরিপূর্ণ।

ii. পেট রবার্টসন (Pat Robertson) নামক অন্য একজন খ্রীস্টান পাদ্রী কয়েকটি মিডিয়া চ্যানেলের অধিকারী। ইনি ইসরাঈলের একজন গোঁড়া সমর্থক হিসেবে পরিচিত। Club ৭০০ শীর্ষক তার একটি চ্যানেল রয়েছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এর দর্শক সংখ্যা এক কোটির অধিক এবং পৃথিবীর অন্তত ৯০টি দেশ থেকে এর সম্প্রচার দৃষ্ট হয় এবং ৫০টির অধিক ভাষায় এর প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হয়। এ চ্যানেলের উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রীস্টবাদের প্রচার ও ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার। এ চ্যানেলটির শিরোনাম হচ্ছে <Christian Broadcasting>।

উক্ত পেট রবার্টসন ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থীতা লাভেরও চেষ্টা করেছিলেন। তার একটি ওয়েব সাইট হচ্ছে www.pat robertson.com ইনি Regent University নামক এক মৌলবাদী খ্রীস্টান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামের নবী (সঃ) সম্পর্কে তার নিম্নবর্ণিত মন্তব্যটিতে তার দৃষ্টিভঙ্গীর একটি চিত্র ফুটে উঠেছেঃ "মুহাম্মদ আল-কুরআনে যা লিখেছেন তা একবার পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, তিনি তাঁর গোত্রীয় লোকদেরকে মুশরিকদেরকে নিধন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি একজন চরমপন্থী ধর্মান্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন একজন ডাকাত (নাউযুবিল্লাহ)। আমার দৃষ্টিতে এ লোকটি মানুষকে যেদিকে আহবান করেছিলেন তা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত আল কুরআনের ৮০% ইহুদী খ্রীস্টানদের ধর্ম গ্রন্থ সমূহের নকল। আল কুরআনে ৫০০ বারের অধিক মূসার উল্লেখ এ কথারই প্রমাণ করে যে, এ গ্রন্থটি ইহুদী ধর্ম বিশ্বাস হতে চুরি করা। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে মুহাম্মদ মদীনায় ইহুদী খ্রীস্টানদেরকে নিধন করার উদ্যোগ নেন। আমি মনে করি এ ব্যক্তিটি ছিলেন একজন হত্যা ও রক্তপাতকারী ব্যক্তি"।[১]

ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম (Franklin Graham)

ইনি একজন মার্কিন ধর্ম যাজক। নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভূক্ত একটি গ্রাম্য এলাকায় বাস করেন। তাঁর পিতা বিলী গ্রাহাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন থেকে নিয়ে বিল ক্লিন্টনের সময়কাল পর্যন্ত রাষ্ট্র প্রধানদের পাদ্রী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ফ্রাংকলিন গ্রাহাম তদ্বীয় পিতার গৃহীত গোটা বিশ্বব্যাপী খ্রীস্টবাদ প্রচারের অভিযান পরিচালনা করা এবং এ কর্মসূচীর পৃষ্ঠপোষণ করার ধারা অব্যাহত রাখেন। তার নিজস্ব ওয়েব সাইট হচ্ছে <www.Samaritan.org> এ ওয়েব সাইট হতে ছয়টি প্রধান প্রধান ভাষায় ইসলাম সম্পর্কিত তথ্যাদি বিকৃতভাবে

[১] দেখুন ড. বাসেম খাফাজী লিমাযা য়াকরাহুনাহু, আল বয়ান প্রকাশনা সংস্থা, আল রিয়াদ. ২০০৬. পৃঃ ৪০

প্রচারের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ইনি সম্প্রতি **The Name** শীর্ষ একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে ইসলাম সম্পর্কে সাংঘাতিক আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। যেমন: *"ইসলাম ধর্মটি মুহাম্মদ নামক এক যুদ্ধংদেহী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির হাতে প্রবর্তিত। তাঁর দর্শন ও শিক্ষার মূল চরিত্র হচ্ছে সামরিক কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটানো।"*[২]

তার ভাষায় ইসলামের মূল টার্গেট হচ্ছে গোটা বিশ্বের কর্তৃত্ব গ্রহণ। অতীব উদ্বেগজনক ও দু:খের বিষয় হচ্ছে এই, ইসলাম ও নবীজীর প্রতি চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে খ্রীস্টান জগতের বৃহত্তম ধর্মগুরু ও ভ্যাটিকানের প্রধান ধর্ম যাজক ও পোপ বেন্ডিক্ট ষোড়শ। তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও খ্রীস্টবাদের দাবী অনুযায়ী মানবতাবাদী, শান্তির দূত ও অন্যের অধিকারের প্রতি বেশী শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পরিবর্তে অবতীর্ণ হয়েছেন ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স:) এর প্রতি অধিকতর আক্রমণাত্মক ভূমিকায়।

ইনি বিগত ২০০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে জার্মানীর রিজেন্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তথা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণে যুক্তির গুরুত্ব শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন: "আমাকে দেখানতো মুহাম্মদ বিশ্ববাসীর কাছে এমন কোন নতুন বস্তু পেশ করেছেন? তিনি কিছু শয়তানী কার্যক্রম ও অমানবিক কর্মকান্ড বৈ আর কিছুই দেখাতে পারবেন না, যেমন তার নির্দেশ ছিল তরবারীর বলে ধর্ম প্রচার"[৩]

তার এহেন অসত্য ভাষণে মুসলিম বিশ্বে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তার এ বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবী উঠে। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হলেন না। ইউরোপের অন্যতম মুসলিম দেশ Turkey ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হওয়ার আবেদন করলে এ পোপ এ বলে উক্ত প্রস্তাবের চরম বিরোধিতা করেন যে, তুরস্ক এক ভিন্ন সংস্কৃতির অনুসারী।

বলা বাহুল্য Bendict xvi ভ্যাটিকানের প্রধান পোপের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই চরম ইসলাম বিরোধী মনোভাবের ধারক ছিলেন। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত অন্য একটি গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ধর্ম বিশ্বাস যা কোন সভ্য সমাজের উপযোগী নয়।

ভ্যাটিকানের পূর্ববর্তী ধর্মগুরু Pope Paul বিশ্বের বড় বড় ধর্মমত সমূহের অনুসারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু বেডিক্ট ষোড়শ এ পদমর্যাদায় আসীন হওয়ার পর এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। Pope Paul কর্তৃক গঠিত ধর্মসমূহের মধ্যে "সংলাপ কমিটি" এর পরিবর্তে এর নামকরণ করেন "বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সংলাপ কমিটি" রূপে। এটি ইব্রাহীমী ধর্মসমূহের পারস্পরিক স্বীকৃতির নীতি হতে উল্টোপথে যাত্রার নামান্তর। শুধু তাই নয়, ভ্যাটিকান সিটি হতে প্রকাশিত মাসিক ম্যাগাজিন **"Islamo Christiana"** পত্রিকাটির প্রকাশনাও স্থগিত করে দেয়া হয়।

(iii) প্রচার মাধ্যমে অপপ্রচার:

পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার যেন এখন একটি অপরিহার্য ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশেষভাবে ১১ই সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনার পর ইসলাম যেন একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম এবং মুসলমানগণ যেন একটি সন্ত্রাসী জনগোষ্ঠীর নামান্তরে পরিণত হয়েছে। অথচ ১১ই সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনার জন্য মুসলমানরা দায়ী কি না তা এখনও অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়।

আমেরিকার একটি জনপ্রিয় ইলেক্ট্রনিক ম্যাগাজিন **National Review** একটি **corner discussion** এ কিছু ইসলামী ও আরব দেশ সমূহে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ যুক্তিসংগত কি না তা নিয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত করা হয় এবং এ বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের আয়োজন করা হয়। এ আলোচনায় এ পুস্তকের ৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় যে "আল কুরআনে উল্লিখিত কাহিনী সমূহ মূলত: পুরাতন নিয়ম **(Old Testament)** ও নতুন নিয়ম **(New**

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১

[3] Papal address at University of Regensburg, See Levreria Editrice Vaticana, Code: ZE 06091209

testament) গ্রন্থদ্বয় হতে ধার করা কাহিনী। তবে পাশ্চাত্য ও উন্নত বিশ্বে বাইবেলের তুলনায় আল কুরআনের প্রভাব অতীব নগন্য। উল্লেখ্য যে ইসলাম ও খ্রীস্টানদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই, ইসলামের উপাস্য ও খ্রীস্টবাদের উপাস্য অভিন্ন নয়।

জেরী ভাইন্স (Jerry Vines):

ইনি ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত একটি চার্চের তত্তাবধায়ক। এ চার্চের অনুসারীদের সংখ্যা ২৫০০০। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুশীল সমাজে ইনি একজন বাস্তববাদী সত্যনিষ্ঠ ধর্মযাজক হিসেবে পরিচিত। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ তাঁর অন্যতম ভক্ত ছিলেন। আমেরিকায় ফি বছর অনুষ্ঠিত বার্ষিক চার্চ ও ধর্মযাজক সভায় ইনি একজন গুরুত্বপূর্ণ বক্তা রূপে চিহ্নিত।

২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তৃতা দান কালে ইনি ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে চরম মিথ্যাচার করে বক্তব্য পেশ করেন। তার ভাষায় মুহাম্মদ (সা:) একজন বিকৃত চরিত্রের লোক ছিলেন, 'নাউযুবিল্লাহ' অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের প্রতি ছিল তার বিশেষ আকর্ষণ। তিনি ১২ জন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন ইত্যাদি। - নবীজীর বিরুদ্ধে তার এ মিথ্যাচারের জন্য উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মযাজকদের কেউ কোনরূপ নিন্দা জানাতেও রাজি হয় নি। এমন কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশও এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন নি। ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের উদ্দেশ্যে এ পাদ্রী একটি ওয়েব সাইট চালু করেন যার শিরোনাম হচ্ছে <www.tbcjax.com.> [১]

এ জনমত যাচাইয়ে যে সব শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের প্রস্তাব রাখা হয়, সেগুলো হচ্ছে তেহরান, বাগদাদ ও দামেস্ক। তার সাথে গাজা উপত্যকা ও রামাল্লার নামও সাম্ভাব্য টার্গেট হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন বোমা তৈরীতে সক্ষম হয় যাতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। এ আলোচনায় এমন প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে যে, মক্কা নগরীকেও বোমা হামলার আওতায় আনা যায় কি?

লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে এ বিদ্বেষাত্মক আক্রমন শুধু যে ধর্মযাজক সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সীমিত তা নয় বরং সাম্প্রতিককালে এটি যেন একটি জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ লিবারেল গোষ্ঠী মনে করে যে, ইসলামের মধ্যে যে এক অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তি রয়েছে তা উত্থানের সুযোগ দিলে এ ধর্ম বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। তাই ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে যেভাবেই হোক নিন্দাবাদ ও সমালোচনা অব্যাহত রাখতেই হবে।

ইসলামকে ঠেকানোর জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ:

বিশেষভাবে প্রাণীধানযোগ্য যে, ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের বৈরীতা শুধু যে দৃষ্টিভঙ্গী, বক্তৃতা ও প্রচার মাধ্যমেই সীমিত তা নয় বরং কয়েকটি দেশ মৌলিক মানব অধিকারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির টুটি চেপে ধরার জন্য নানারূপ পদক্ষেপ ও ছল চাতুরীর উদ্যোগ নেয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ফ্রান্সের মত দেশ যারা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার পক্ষে পাইওনিয়ার হিসেবে পরিচিত, তারাই সংসদে আইন পাশ করে মুসলিম ছাত্রীদের জন্য স্কুলে এবং মুসলিম নার্সদের জন্য হাসপাতালে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সাম্প্রতিককালে তাদের অনুকরণে অস্ট্রেলিয়াতেও স্কুল ছাত্রীদের জন্য হিজাব নিষিদ্ধ হবে কিনা এ বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। পাঁচ শতাংশেরও কম মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশে জনমত যাচাইয়ের ফলাফল কী হবে তা বলাই বাহুল্য। অথচ ধর্ম বিশ্বাস ও তা র্চচা প্রত্যেকের জন্য একটি মৌলিক মানবাধিকার। যেহেতু মহিলাদের হিজাব করা মুসলিম ধর্মীয় বিধানের অংশ তাই এ অধিকারে হস্তক্ষেপ মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল।

২০০৯ সালের শেষের দিকে সুইজারল্যান্ডের পিপলস পার্টি মুসলমানদের মসজিদসমূহে মিনার নির্মাণের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে জনমত জরীপের উদ্যোগ নেয়া হয়। সুইজারল্যান্ডের মুসলিমগণ এ উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এ কারণে

---

[১] দেখুন ড. বাসেম খাফাজী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৪২

যে, সে দেশে মুসলমানদের অনুপাত মাত্র ৬% । জনমতে মিনারে বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার দাবীদারগন বিজয়ী হয় । এ জনমত জরীপে মিনারের পক্ষে ভোট পড়ে ৪২.৫ শতাংশ এবং এর বিপক্ষে ভোট পড়ে ৫৭.৫ শতাংশ । বস্তুত ৬% মুসলমানদের দেশে তাদের পক্ষে ৪২.৫ শতাংশ ভোট পড়ার অর্থ এই ৩৬% এর বেশী অমুসলিম মুসলমানদের পক্ষেই রায় দিয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক খবর । প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, মিনার নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের প্রধান প্রবক্তা প্রখ্যাত সুইস রাজনীতিবিদ ও পিপলস পার্টির অন্যতম নেতা দানিয়েল স্ট্রেইচ (Daniel Straich) নিজেই এখন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে মসজিদের মিনার নির্মানের পক্ষে আন্দোলনকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ ।

বিখ্যাত মার্কিন ম্যাগাজিন সপ্তাহিক **Newsweek** পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি সুইজারল্যান্ডে গগনচুম্বী মিনারসহ সুইজারল্যান্ডে পঞ্চম মসজিদটি নির্মান করতে চান, যা হবে ইউরোপের সুন্দরতম মসজিদ । তিনি মনে করেন তার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার এটিই সর্বোত্তম পদ্ধতি । তার ব্যাপারে **Newsweek** পত্রিকার মন্তব্যের কিছু অংশ হুবহু উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি ।

"Streich propagated his Anti-Islamic Movement far and wide in the country, sowed seeds of indignation and scorn for Islam among the people, and paved the way for public opinion against pulpits and minarets of mosques.

But now Streich has become a soldier of Islam. His thoughts finally brought him so close to this religion that he embraced Islam. He is thinking of a movement contrary to his previous one to promote religious tolerance and peaceful living in spite of the fact that ban on mosque, minerets has gained a legal status. This is the greatest quality of Islam that it comes up with even greater vigour, when it is faced with confrontation." (Newsweek)

মনে হয় এভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কৃত ওয়াদা পূরণ করবেন । আল্লাহ বলেন:

"তারা চায় আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর (ইসলাম) কে পূর্ণতা দিয়েই ছাড়বেন যদিও অবিশ্বাসীগণের কাছে তা অপছন্দনীয়ই বটে । "(আল কুরআন)

দ্রষ্টব্য: এ প্রবন্ধের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে আল বয়ান ম্যাগাজিন কর্তৃক প্রকাশিত ও ড. বাসেম খাফাজী রচিত গ্রন্থ **লিমাযা য়াকরাহুনাহু'র** সাহায্য নেয়া হয়েছে । আমি এজন্য আল বয়ান ম্যাগাজিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ।

আল কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞান

মোস্তফা কামিল*

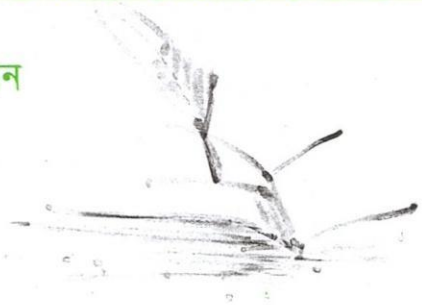

জ্ঞানের আহ্বান দিয়ে ইসলামের সুচনা:

মহান আল্লাহ তা'লা বলেন (يايهاالذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আয়াতে করিমা থেকে বুঝা গেল শুধু নিজে বাঁচলে হবে না পরিবার-পরিজন, সমাজ, অর্থাৎ সাবাইকে বাঁচাতে হবে। বাঁচতে হলে জানতে হবে। বাঁচানোর পদ্ধতি জানতে হবে। জানার নামই হল ইলম বা জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া নিজে ও পরিবারকে বাঁচানো সম্ভব নয়। আমাদের শক্তি এবং জ্ঞান একমাত্র মুক্তির উপায়। অতএব বাঁচতে হলে জ্ঞানী হতে হবে। এজন্যই জ্ঞান অর্জনের আহ্বান দিয়ে ইসলামের সূচনা। সর্ব প্রথম বলা হয়েছে (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم) [العلق: ١-٥] অর্থ: তোমার প্রভুর নামে পড়, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার সম্মানিত প্রভুর নামে পড় যিনি তোমাকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।

এই লেখা-পড়ার নামই জ্ঞান, প্রথমেই জ্ঞান অর্জন করার জন্য বলা হয়েছে। এবং বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করা হয়েছে। ওহী নাজিলের সূচনাটি ঈমানের আহ্বান দিয়ে হয় নি। বলা হয় নি যে (قولوا لااله إلا الله تفلحون) অর্থ: তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই সফলকাম হবে। অথচ এই কালিমা-তাওহীদের বিশ্বাস ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্তর এবং মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। বরং বলা হয়েছে জ্ঞান অর্জন কর।

কারণ আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণের পূর্ব-শর্ত জ্ঞান। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন: (فاعلم أنه لا إله الله) অর্থ: 'সুতরাং তুমি যেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।' আমাদের প্রথমে জানতে হবে এবং তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাহলে বুঝা গেল জ্ঞানই হল সব কিছুর মূল। শিক্ষার সাইকোলজিক্যাল সংজ্ঞা হচ্ছে অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অব হিউম্যান ফ্যাকাল্টি। আল্লাহ মানুষের জ্ঞান বিকাশের জন্য বিভিন্ন স্তর করে দিয়েছেন এবং সে জন্য মানুষের এসব মানবিক পর্যায়গুলোর পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য এসেছে শিক্ষা। সে জন্য শিক্ষাকে বলা হয় "নলেজ ইজ পাওয়ার"।

ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব:

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানীরাই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও মর্যাদবান তাদের সমকক্ষ কেউ হতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون) [الجمعة : ٩] 'যারা জানে আর জানে না তারা কি সমান হতে পারে?' আরো উল্লেখ আছে, তোমাদের মধ্যে জ্ঞানীদেরকে আল্লাহ অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেন,। (هل يستوي الأعمي والبصير) চাক্ষুষ আর অন্ধ ব্যক্তি কি সমান? এছাড়াও আরো অনেক আয়াত আছে।

ইসলাম যে জ্ঞানের দিকে আহ্বান করে:

* সহকারী অধ্যাপক, কুর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

কুরআনুল কারিম হল ট্রেজারি অব টোটাল নলেজ। সব জ্ঞানের আধার। পদার্থ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, মেডিক্যাল সায়েন্স, সমাজ বিজ্ঞান তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখার বিষয়ে কুরআনুল কারিমে কোন না কোনভাবে আলোচনা এসেছে। কুরআনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা তা ধর্মীয় বিষয় বা বস্তুগত বিষয়ে হোক। কুরআনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে যোগ্য সৎ তথা আলোকিত মানুষ সৃষ্টি করা, যারা মানবতার কল্যাণে কাজ করবে। নিম্নে কুরআনে বর্ণিত বিজ্ঞানের কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হল:-

পদার্থ বিদ্যা (Physics):

পদার্থ বিদ্যা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ বলেন, (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ) "তার আরও এক নিদর্শন হচ্ছে- নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা রুম : ২২)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেন:

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)(٢٧)

"তুমি কি দেখ নি আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর তাদ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফল-মুল উৎপাদন করেন। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ সাদা-লাল ও অধিক কালো কৃষ্ণ। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির : ২৭, ২৮)

এ আয়াতগুলোর আলোকে বুঝা যাচ্ছে "জ্ঞানী" বলার উদ্দেশ্য হল যারা ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি সৃষ্টির রহস্যের ব্যাপারে সম্যক ধারণা রাখে। আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য নিয়ে চিন্তা করে।

এই আয়াতগুলো পদার্থ বিদ্যা শিখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য আহবান করেছেন। এই আয়াত দ্বারা পদার্থ বিদ্যাকে বুঝানো হয়েছে।

ফাতিরের আয়াতের মধ্যে বলা হচ্ছে- পদার্থ বিদ্যা ছাড়া আকাশ থেকে পানি বর্ষণের রহস্য সম্পর্কে জানা যাবে না। কেমেস্ট্রির জ্ঞান ছাড়া তার গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যাবে না। উদ্ভিদ বিদ্যা ছাড়া উদ্ভিদ এবং ফলমুলের জ্ঞান অর্জন করা যাবে না। ভূতত্ত্ব (Geology) জ্ঞান ছাড়া পাহাড় এবং তার লাল, সাদা, কালো স্তর সম্পর্কে জানা যাবে না; এবং প্রাণী বিদ্যা ছাড়া চতুষ্পদ জন্তু, পোকামাকড় এবং মানুষের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানা যাবে না। ওলামা হচ্ছেন যারা মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আল্লাহর আয়াত নিয়ে গভীর গবেষণা করেন। কেন না তারা যখন বিশ্বাসী হন তখন প্রকৃতির বিভিন্ন গোপন রহস্যের জ্ঞান তাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করে।

জীববিজ্ঞান (Biology):

জীব বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥)خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦)

মানুষের দেখা উচিত কী বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে, সবেগে স্থলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্য থেকে। (সূরা তারেক : ৫-৭)

সৃষ্টির মৌলিকত্ব নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ প্রাণী বিদ্যা আবিষ্কার করেছে এবং তার মধ্যে আশ্চর্য জনক হলো, মানুষের জীবকোষ ও সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর পরিবর্তন ও উন্নতি। আর তাই হচ্ছে জীববিজ্ঞান।

মনো বিজ্ঞান (Psychology):

কুরআন নির্দেশ দিয়েছে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার জন্য। আর তা স্পষ্ট হয়েছে এই আয়াতের মধ্যে: আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١) "বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদশর্নাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও তোমরা কি অনুধাবন করতে পার না?" (সূরা জারিয়াত : ২০-২১)

মানুষ নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা, গবেষণা করা, তাদের নিয়ে পর্যালোচনা করা, মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়, যার প্রতি আল-কুরআন আমাদেরকে উৎসাহিত করছে।

সমাজ বিজ্ঞান (Sociology)

বিশ্বে যা কিছু মুসলমানদের সম্মুখে আছে তা নিয়ে গবেষণা করা যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ববর্তী জাতিদের রাষ্ট্রীয় শক্তি, পৃথিবী আবাদ,তাদের উত্থান-পতন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে। আর তাই হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(٩)

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না। অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা জমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী আবাদ করত, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না বরং তারা নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছিল।" (সূরা রূম : ৯)

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান: (Medical Sciences)

কুরআন কারীমে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মূলনীতি গুলো সুচারুভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার যাবতীয় দিকগুলো ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করেছে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদের গুণাবলী বর্ণনা দিতে গিয়ে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ মুসা (আঃ) এর ব্যপারে বলেন (إن خيرمن أستأجرت القوي الأمين) মেডিক্যাল সায়েন্সের আলোকে পাকস্থলী যাবতীয় রোগের জন্মস্থান। তার সুস্থতার জন্য যথা সময়ে পরিমিত খাবার গ্রহণ পূর্ব শর্ত,যার সু-স্পষ্ট নীতিমালা মহান রাব্বুল আলামিন কুরআনে বর্ণনা দিয়ে বলেন। (كلوا واشربوا ولاتسرفوا) পানাহার গ্রহণ কর, বাড়াবাড়ি করিওনা । রাসূল (সা.) বলেছেন: (المعدة بيت الداء) পাকস্থলী যাবতীয় রোগের নিরাপদ স্থান। খাদ্য গ্রহণের নীতিমালার বর্ণনা দিয়ে রাসূল (সা.) বলেছেন: (ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه فإذا كان لامحالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) অর্থ: মানুষ যে সমস্ত পাত্র পূর্ণ করে তার মধ্যে সব চাইতে মন্দ পাত্র হল পেট, যদি তোমরা তা পূর্ণ করতে বাধ্য হও, তাহলে তার তিন ভাগের এক ভাগ খাবার গ্রহণ করবে আর এক ভাগ পানি গ্রহণ করবে। আর এক ভাগ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য রেখে দিবে। এই পদ্ধতিতে যদি আমরা খাবার গ্রহণ করি, তাহলে আমরা অনেক মারাত্মক ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকতে পারব। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মৌলিক শর্ত। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলেছেন: মানুষ যে সব রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তার অধিকাংশই অপরিষ্কার হাতে খাদ্য গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে ইসলাম পবিত্রতাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাসূল (সা.) বলেছেন:(الطهور شطرالأيمان) অথবা (النظافة من الأيمان) পবিত্রতা ঈমানের অংশ। ঘুম থেকে উঠার পর হাত ধৌত করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন: (إذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمسن يده في إناءٍ حتي يغسلها ثلاث مرات) অর্থ: তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে তিন বার হাত ধৌত না করে কোন পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে না।

রাসূল (সাঃ) ব্যবহৃত দাওয়াতের মাধ্যম ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মাদ আমিনুল হক*

ভূমিকাঃ

আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করা দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এ দাওয়াতী কাজের জন্যই আল্লাহ তায়ালা সকল নবী রাসূলকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। সকল মুমিন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ডাকা। বিশেষ করে যারা দ্বীনি ইলম চর্চা করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) অর্থাৎঃ যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? তিনি আরো বলেনঃ (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) অর্থাৎঃ 'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।' হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর নবুয়্যাত প্রাপ্তি কাল থেকে ইসলামের রিসালাতকে পর্যালোচনা করলে এ রিসালাতের মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালার ক্রমধারা অবলম্বনের দিকটি কারো নজর এড়ানোর কথা নয়। আল্লাহর রাসূলের উপর গোটা কুরআন একত্রে নাযিল হয় নি। বরং তা ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا) অর্থাৎঃ আমি কুরআনকে যতি চিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি।

ইসলামের পাঁচটি রুকনের প্রতি দৃষ্টি দিলে ক্রমধারা অবলম্বনের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। ইসলামের প্রথম রুকনে সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ইসলামের শুরুর দিকে মানুষের মনে তাওহীদের আসল মর্মবাণী ভালোভাবে প্রোথিত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর তাদের উপর নামাজ ফরজ করা হয়েছে। এরপর তাদের উপর রোযা, যাকাত, জিহাদ, হজ্জ ক্রমান্বয়ে ফরজ করা হয়।

'এমনিভাবে অন্যায় কাজ নিষিদ্ধকরণ, যেমনঃ মদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে ধাপে ধাপে। প্রথমে মদের ক্ষতিকর দিকসমূহ ও গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। এরপর চূড়ান্তভাবে মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

---

* সহকারী অধ্যাপক, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) যখন মানুষের মাঝে দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন, তা শুরু করলেন তাঁর অতি নিকটজনদের দিয়ে। প্রথমে তিনি খাদিজা (রা.), আবু বকর (রা.), চাচাত ভাই আলী ইবনে আবু তালিব, যায়েদ বিন হারিছা প্রমুখের মাঝে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌঁছালেন। পরবর্তীতে দাওয়াত দেয়ার পরিধি বাড়ালেন ক্রমান্বয়ে।

নবী করিম (স.) মক্কাবাসীকে দাওয়াত দেয়ার পর মক্কাবাসীরা তাঁর উপর প্রচন্ড চড়াও হলো এবং বিভিন্ন রকমের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। নবী (স.) মক্কাবাসীদের অত্যাচারকে দীর্ঘ সময় হজম করলেন। এরপর তায়েফবাসীকে, এরপর আরবের সকল গোত্র প্রধানদের দাওয়াত দিলেন। এমনিভাবে রাসূলের (স.), সাহাবীগণও রাসূলের (সঃ) প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করে তাদের সকল কাজের মধ্যে ক্রমধারা অবলম্বন করেছিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) মানুষকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে যেমনি ক্রমধারা অবলম্বন করেছেন, তেমনিভাবে তিনি দাওয়াতী কাজে মাধ্যম ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও ক্রমধারা অবলম্বন করেছেন এবং সফল হয়েছেন। আমি এ লেখায় আল্লাহর রাসূল (সঃ) দাওয়াতী কাজ সম্পাদনে যে সমস্ত মাধ্যম ব্যবহার করেছেন তার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। যাতে করে দায়ী ইলাল্লাহগণ দাওয়াতী কাজের মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রমধারা অবলম্বন করে সফলতা অর্জন করতে পারেন।

দাওয়াহ কী?

দাওয়াহ শব্দটি আরবী دعوة (দাওয়াতুন)। আভিধানিক অর্থ- আহ্বান, নিমন্ত্রণ, প্রার্থনা, দু'আ, ডাকা, সাহায্য কামনা ইত্যাদি। দাওয়াহ শব্দটি 'আম। কখনো কল্যাণের অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো অকল্যাণের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কল্যাণের অর্থে যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ(وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ) অর্থাৎঃ আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের দিকে আহ্বান জানান। আর অকল্যাণের অর্থে যেমনঃ আল্লাহ বলেনঃ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ অর্থাৎঃ ইউসুফ বললঃ হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে (খারাপ) কাজের দিকে আহ্বান করেছে ,তার চেয়ে কারাগারই আমার নিকট শ্রেয়।। আল্লাহ দাওয়াতের এ উভয় অর্থকে কুরআনের অন্য একটি আয়াতে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন, যেমনঃ আল্লাহ বলেনঃ (أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ) অর্থাৎঃ তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর ইংরেজীতে দাওয়াহ শব্দটির অর্থ করা হয়েছে এভাবে- Missionary activity, Missionary work, Propaganda. আর পারিভাষিক অর্থে দাওয়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে- কাউকে কোন কিছুর দিকে আহ্বান করা। পরিভাষায় ইসলামী দাওয়াত হচ্ছে- "تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة" অর্থাৎঃ মানুষের কাছে ইসলামকে পৌঁছে দেওয়া, ইসলামকে তাদের মাঝে শিক্ষা দেওয়া ও বাস্তব জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়নের নামই ইসলামী দাওয়াহ।

মাধ্যম বলতে কী বুঝি?

মাধ্যম বলতে আমরা- 'যার মধ্যস্থতা বা সহায়তায় কোন কাজ সাধিত হয়' তাকেই বুঝি। আর আরবীতে এর অর্থ হচ্ছে- واسطة، أداة، سبيل وسيلة আর ইংরেজীতে এর অর্থ হচ্ছে- Means, Medium, Agency, Instrument, Device, Implement, Tool, Way, Access, Channel. অতএব, দাওয়াতী মাধ্যম বলতে আমরা 'যার মধ্যস্থতায় বা সহায়তায় ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করা হয় তাকেই বুঝি'।

ক্রমধারা কী?

বাংলায় ক্রমধারা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অনুক্রম, পরম্পরা, পর্যায়, ধারাবাহিকভাবে ইত্যাদি। আর ইংরেজীতে এর অর্থ হচ্ছে- Gradual advancement or progress, Progression by steps; Successive steps. আর আরবীতে এর অর্থ হচ্ছে- التدرج، التسلسل

আর পারিভাষিক অর্থে ক্রমধারা হচ্ছে- "التقدم بالمدعو شيئًا فشيئًا للبلوغ به إلى غاية ما طلب منه وَفْقَ طرق مشروعة مخصوصة" অর্থাৎঃ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে নির্দিষ্ট ও বৈধ পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হওয়ার নামই ক্রমধারা।

দাওয়াতের মাধ্যমে রাসূলের (স.) ক্রমধারাঃ

মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল যে মাধ্যমগুলি গ্রহণ করেছেন তা আমরা পর্যালোচনা করলে দাওয়াতী মাধ্যম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি (স.) যে ক্রমধারা অবলম্বন করেছেন তা সহজেই অনুধাবন করতে পারব। যা তিনি একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করেছেন। নবী (স.) দাওয়াতী কাজে যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন তাকে আমরা মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমনঃ

★ প্রথম মাধ্যম : মৌখিক কথা
★ দ্বিতীয় মাধ্যম : যুদ্ধ
★ তৃতীয় মাধ্যম : চিঠি-পত্র
★ চতুর্থ মাধ্যম : দাওয়াতী দল প্রেরণ
★ পঞ্চম মাধ্যম : উত্তম আদর্শ

নিম্নে এ বিষয়গুলির উপর আলোচনা করা হলো-

প্রথম মাধ্যমঃ মৌখিক কথাঃ

মৌখিক কথার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানুষের অনুভূতি প্রকাশের প্রাকৃতিক মাধ্যম। পবিত্র কুরআনে দাওয়াতী মাধ্যম হিসাবে القول বা কথার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পবিত্র কুরআনে তিনশতেরও অধিক আয়াতে "قل" তথা হে নবী আপনি 'বলুন' শব্দটির বর্ণনা এসেছে। যেমনঃ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا) (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى) এমন কোন রাসূল পাওয়া যাবে না যাঁরা তাঁদের জাতিকে মৌখিক দাওয়াত দেন নি এবং তাদেরকে তাওহীদের কথা বর্ণনা করেন নি। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবী রাসূলকে স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) অর্থাৎঃ- "আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বুঝাতে পারে"। অতএব মুখনিঃসৃত কথার দ্বারা স্বজাতিকে আহ্বান করা সব রাসূলেরই দাওয়াতী মাধ্যম ছিল। রাসূল (স.) এর মাক্কী জীবনে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার প্রধান মাধ্যম ছিল মুখের 'কথা'। আমরা যখন রাসূল (স.) এর মাক্কী জিন্দেগী পর্যালোচনা করি তখন এর সত্যতা খুঁজে পাই। আল্লাহর রাসূল (স.) তখনকার সময় গোপনে গোপনে মৌখিক দাওয়াত দিতেন। এরপর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসলো- (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) অর্থাৎঃ- অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। আল্লাহর রাসূল (সঃ) প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করলেন। তিনি সাফা পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে কুরাইশদেরকে ভয় প্রদর্শন ও আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন এবং তাঁর চাচা আবু তালিবকে ডেকে বললেনঃ (أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ) অর্থাৎঃ- "হে আমার চাচা! আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, যে কালেমার দোহাই দিয়ে আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করব"।

আল্লাহর রাসূল (স.) কথাকে যে দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন তা আমর ইবন 'আবসা (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়। আবু উমামা হতে মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ

"قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ فَقُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ"

হাদীসে উল্লেখিত আমর ইবন 'আবসা (রা.) এর উক্তিঃ (فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا) রাসূল (স.) এর সাথে এই ব্যক্তির কথোপকথন স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসূল (স:) উক্ত ব্যক্তিকে কথার মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। মাক্কী জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাসূলের দাওয়াতের মূল মাধ্যমই ছিল 'কথা'। অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নবীজীর সর্ব প্রথম ও প্রধান দাওয়াতী মাধ্যম ছিল কথা।

দ্বিতীয় মাধ্যমঃ সৈন্য দল প্রেরণ ও যুদ্ধ

রাসূলের (স:) মাক্কী জীবনে তাঁর দাওয়াতী মাধ্যম ছিল 'কথা'। দীর্ঘ তের বছর মৌখিকভাবে দাওয়াতী কাজ পরিচালনার পর আল্লাহ তায়ালা নবী (স.) কে মদীনায় হিজরতের আদেশ করলেন। এরপর তাঁকে তরবারী দিয়ে কিতালের জন্য আদেশ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা লৌহ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করেন। যার মাধ্যমে হক্ব ও আদল প্রতিষ্ঠা করা যায়। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান না মানবে ও সত্যকে অস্বীকার করবে তার সামনে যেন আল্লাহর রাসূল (স:) ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারেন এবং সত্য অস্বীকারকারীকে বাধা প্রদান করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ অর্থাৎঃ- "আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন; কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী"।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন যে, তিনি কিতাব ও আদল নাযিল করেছেন যাতে করে মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এরপর তিনি লৌহ নাযিল করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি কুরআন ও ইনসাফকে ত্যাগ করবে তাকে লৌহ দিয়ে হত্যা করা হবে। এখানে হাদীদ বা লৌহ দিয়ে জিহাদের হাতিয়ারকে বুঝানো হয়েছে যেমনঃ তলোয়ার, তীর, ধনুক, ঢাল এমনিভাবে বর্তমান সময়ের বিমান, বোমা, কামান, ক্ষেপণাস্ত্র, গ্রেনেড ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে (স:) শক্তি অর্জনের সকল পথ অবলম্বন করতে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) অর্থাৎঃ- "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য, যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর"। নবী (স.) খোদায়ী নির্দেশনাবলী খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন এবং দাওয়াতী মাধ্যম হিসেবে যুদ্ধকে বেছে নিয়েছেন। যা ইসলামকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবে এবং শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার ও তাদের আস্থাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল্লাহর রাসূল (স.) মোট ১৯ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। "ইবনু দাক্বীক আল ঈদ বলেনঃ জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল, কেননা জিহাদ হচ্ছে দ্বীন প্রসার, প্রচার ও কুফুরী শক্তি মোকাবেলার অন্যতম মাধ্যম"।

তৃতীয় মাধ্যমঃ চিঠি-পত্রঃ

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আল্লাহর রাসূল (স:) চিঠি-পত্রকে দাওয়াতী মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কেউ কেউ আল্লাহর রাসূলের এ দাওয়াতকে অবজ্ঞা করলো, যেমন কিসরাবাসী। আবার কেউ কেউ এ দাওয়াতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল, যেমন কায়সারবাসী।

দাওয়াতের এ মাধ্যম সম্পর্কে সীরাত ও হাদীস গ্রন্থসমূহে এর ব্যাপক বর্ণনা পাওয়া যায়। আনাস (রা.) থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى) অর্থাৎঃ- "নবী (স.) কিসরা, কায়সার ও নাজ্জাসীর কাছে এবং অন্য প্রতাপশালী শাসকদের নিকটও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখলেন"। অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসূল (স.) কাফেরদের নিকট দাওয়াত দেয়ার

জন্য চিঠি লিখেছেন। নিম্নে বাইযানটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূলের পত্রটির কথাগুলি তুলে ধরা হলো যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন-

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ وَ { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }

বুখারী (র.) আরো বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত-

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى...."

উপরের পত্র দুটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর রাসূল (স:) একে যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার মাধ্যম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থ মাধ্যমঃ দাওয়াতী দল প্রেরণঃ

দিক্ দিগন্তে তাওহীদের বাণী ছড়িয়ে দিতে যুদ্ধ, চিঠি-পত্র ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ দু'মাধ্যমের ফল হিসেবে আল্লাহর রাসূলের নিকট দূর-দুরান্ত থেকে অনেক প্রতিনিধি দল এসে তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করতে শুরু করলো। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) অর্থাৎ- যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

আল্লাহর রাসূল (স:) ঐ সমস্ত আগন্তুক দলকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তাদের কওমের কাছে দ্বীন ও ইসলাম শিখানোর জন্য প্রেরণ করেন। অনুরূপভাবে তিনি কিছু ফকীহ সাহাবীকে দ্বীনী প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করলেন।

পঞ্চম মাধ্যমঃ উত্তম আদর্শঃ

দাওয়াতী ময়দানে মৌখিক দাওয়াত, যুদ্ধ, চিঠি-পত্র, দাওয়াতী দল প্রেরণ যদি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে আল্লাহর রাসূলের উত্তম আদর্শ হবে সবচেয়ে বড় দাওয়াতী মাধ্যম। এটি ভাষা, অস্ত্র ও লেখাবিহীন এক অনন্য শক্তিশালী মাধ্যম। যা ব্যবহার করে আল্লাহর রাসূল বিশ্ব দরবারে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তায়ালা রাসূলের (স:) উত্তম আদর্শের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেনঃ (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) অর্থাৎ "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী"। তিনি আরো বলেনঃ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) অর্থাৎ "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"। আল্লাহ আরো বলেনঃ (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) অর্থাৎ "তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না"। রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ (كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ) অর্থাৎ "কুরআনই রাসূলের চরিত্র ছিল"। সকল প্রকার সুন্দর, সৃষ্টিশীল, উত্তম ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর এ চারিত্রিক উৎকর্ষতা, দৃঢ়তা ও মহান ব্যক্তিত্বই মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আকৃষ্ট করেছে প্রবলভাবে। রাসূলের আল আমিন উপাধিতে ভূষিত হওয়া, আমানতদারিতা, সত্যবাদীতা, সুবিচার, মহানুভবতা, কোমল ব্যবহার শত্রুদের সাথে ন্যায়পরায়ণ আচরণ ও ধৈর্য্য এ সবগুলোই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে ইসলামকে জানতে, গ্রহণ করতে ও মানতে। ফুলের মধু নেয়ার জন্য যেমন মৌমাছিরা ফুলের কাছে জড়ো হয়, তেমনি ইসলামকে জানার জন্য তৎকালীন মানুষেরা রাসূলের (স:) কাছে জড়ো হতো। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) অর্থাৎ "আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল

হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে, আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো"। আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) অর্থাৎ "তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়"। একদা রাসূল (স.) এর কাছে এক বেদুঈন ব্যক্তি দেখা করতে আসলো। রাসূল (স.) তখন মসজিদে সাহাবীদের সাথে কথাবার্তা বলতে ছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ বেদুঈন ব্যক্তির প্রস্রাবের বেগ আসলে, সে মসজিদের মধ্যেই প্রস্রাব করে দেয় এতে সাহাবীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারার জন্য তেড়ে আসলে আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁদেরকে বারণ করে বললেনঃ

" دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ"

অর্থাৎ "উক্ত বেদুঈনকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সদাচরণ করার জন্য প্রেরণ করেছেন, রূঢ় আচরণ করার জন্য প্রেরণ করেন নি"। জাহেলী যুগের মানুষেরা যতটা না দাওয়াত শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার চেয়ে বেশী ইসলাম গ্রহণ করেছেন রাসূলের বাস্তব আদর্শ দেখে। তৎকালীন মানুষেরা রাসূলকে পড়তেন, তাঁর ভাবাদর্শকে পর্যবেক্ষণ করতেন, তাঁর মহৎ আচরণের দিকে খেয়াল করতেন; অত:পর আপনা আপনিই রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলামের ঘোষণা দিতেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) দাওয়াতের ময়দানে মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন চমৎকারভাবে। তাঁর এ ধারাবাহিকতা রক্ষায় কোন ছেদ পড়েনি। যার কারণে তিনি সফলও হয়েছেন।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা যে শিক্ষা পেতে পারি তা হচ্ছে-

১. যে কোন কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা আল্লাহই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

২. রাসূল (স.) দাওয়াতী কাজে ক্রমধারা অবলম্বনের ন্যায় দাওয়াতী মাধ্যমেও ক্রমধারা অবলম্বন করেছেন।

৩. তিনি (স.) ক্রমধারা অবলম্বনের ক্ষেত্রে যেটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে আগে করেছেন।

৪. তিনি (স.) দাওয়াতী মাধ্যম হিসেবে প্রথমে-মৌখিক দাওয়াত, এরপর যুদ্ধ, এরপর দেশ বিদেশের বাদশাদের কাছে চিঠি প্রেরণ, এরপর দাওয়াতী দল পাঠানোকে গ্রহণ করেছেন।

৫. তিনি কখনো শত্রুদের বিরুদ্ধে আগে যুদ্ধের ঘোষণা দেননি। বরং শত্রুদের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধকে মোকাবেলা করেছেন মাত্র। ইসলাম শান্তির ধর্ম, যুদ্ধের ধর্ম নয়।

৬. তৎকালীন সময়, পরিবেশ, স্থান ও সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল (স.) দাওয়াতের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করেছেন।

৭. তাঁর গৃহীত প্রত্যেকটি মাধ্যমেই উত্তম আদর্শ সমানভাবে বিদ্যমান ছিল।

অতএব, আমরা যারা দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করতে চাই; আমাদেরকে অবশ্যই রাসূলের দাওয়াতী কাজে ক্রমধারা অবলম্বনের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে এবং বর্তমান আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে আধুনিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই আমরা সফল দায়ী ইলাল্লাহ হতে পারব। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

'জন' নয় গুণ বড়

মুহাম্মদ সুহাইল সালেহ্*

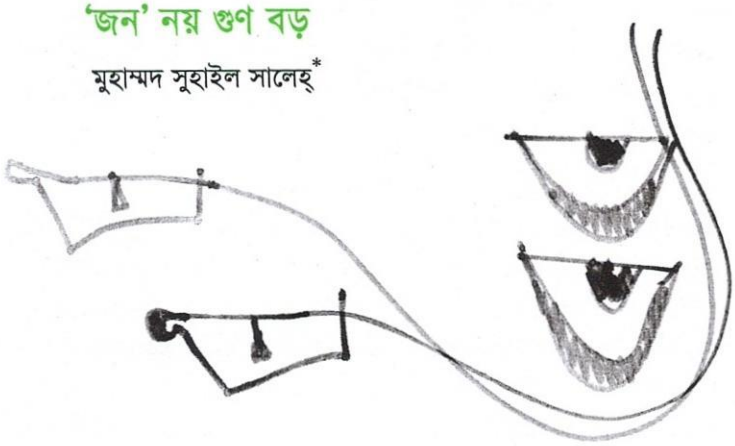

পৃথিবীর ইতিহাস বড়ই বিচিত্র, এই কারণে যে, এটা হাজারো সভ্যতার উত্থান পতনের স্বাক্ষী। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া এই সব সভ্যতার সবাই পৃথিবীর কাছে বরণীয় নয়। পৃথিবী তার অস্তিত্ব জুড়ে তাদেরকেই বরণ করেছে যারা গুণের লালন করেছে গণের নয়। অন্য কথায় বলতে গেলে যারা জ্ঞানের পূজা করেছে এবং শ্রেষ্ঠত্বের ধ্যান করেছে তারাই মানব ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করেছে। আজকের পৃথিবী ও তার ব্যতিক্রম নয়। রাসূল (সাঃ) এর সময়কাল থেকে খ্রীস্টাব্দ ১৫০০ সাল পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতা সমূহের শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তার কারণ? কারণ পরিষ্কার। তারা মহান আল্লাহর সেই বাণীকে অনুসরণ করেছিল যার মাধ্যমে তিনি তার রাসূল (সাঃ) কে এই বার্তা পৌছিয়েছেন যে, 'পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। কেন তিনি প্রথমে পড়তে বললেন? তিনি তো প্রথমে সেজদা করতে বলতে পারতেন। এই ব্যাপারে ব্যাখ্যার সীমা নেই। তবে এ কথাই বলা যায়, এই সর্বজ্ঞানীর সাথে গভীর সম্পর্কের জন্য জ্ঞানের বিকল্প নেই। আর যারা জানে তারাই শ্রেষ্ঠ। ইসলামী সভ্যতা যতদিন এই বিশ্বাস লালন করেছে ততদিন তারা পৃথিবী শাসন করেছে।

ইসলামী সভ্যতার বর্তমান অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমরা অনেক উঁচু উঁচু দালান নির্মাণ করছি। অন্যদিকে অমুসলিম সভ্যতা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান চর্চাগার তথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে এবং করছে। আমরা যখন তাজমহল নির্মাণ করেছি তখন তারা হার্ভাড কিংবা অক্সফোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। এখান থেকে বুঝা যায় আমাদের অবস্থান কোথায় হওয়া উচিৎ।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে উদ্বোধন হলো পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে সবচেয়ে উঁচু দালান- 'বুরজ্ আল খলিফা 'দুবাইতে। এটা কে বলা হচ্ছে, জীবন্ত আশ্চর্য, শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। এটা তৈরীতে মোট খরচ পড়েছে ২০ বিলিয়ন ডলার। কষ্ট হলেও বিশ্বাস করতে হবে। এটা ভাববার কোন কারণ নেই যে, দুবাই তার নিজস্ব বিশেষজ্ঞ দিয়ে এই উঁচু ভবন নির্মান করেছে। এর সম্পূর্ণ ক্রেডিট হলো নন-দুবাই এবং নন-মুসলিমদের। এর ডিজাইন, নকশা, কাঁচামাল সবকিছু পশ্চিম থেকে, কেবল অর্থ এসেছে দুবাই থেকে।

---

* ছাত্র, মাস্টার্স

গল্প এখানে শেষ নয়। দুবাইয়ের এই অর্জন দেখে সৌদি আরব বসে নেই। প্রিন্স আল-ওয়ালিদ বিন তালাল, যিনি বাদশা আব্দুল্লাহর ভাতিজা, ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি ১ কি:মি: উঁচু একটা দালান নির্মাণ করবেন যেটা ২৫,০০০ ফিট 'বুরজ্ আল খলিফা' কে ছাড়িয়ে যাবে। পশ্চিমা বিশ্ব আমাদেরকে দিয়ে তাদের প্রযুক্তির পরীক্ষা চালাচ্ছে, কিন্তু চাবি তাদের হাতেই রয়ে গেছে।

সুতরাং উৎকার্ষের চাবি কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের কাছেই রয়ে গেছে। ইতিহাস বলে যে, ইসলামী বিশ্ব পৃথিবীর অন্ধকার এবং দূরবর্তী অঞ্চল গুলোতে পর্যন্ত জ্ঞানের মশাল জালিয়েছিলো। প্রতিষ্ঠা করেছিল গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্র। মুসলিম খলিফাগণ নজীর বিহীন ভাবে এই সব জ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু এই স্বর্ণালী যুগ খুব বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মুসলিম বিশ্বের সূর্য ক্রমান্বয়ে মলিন হতে লাগলো যখন তারা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব ভুলে গিয়েছিল। তারপর ইতিহাসের গভীর পরিবর্তন ঘটলো যখন ইউরোপিয়ানরা মুসিলম বিশ্বের গর্ব ও ঐতিহ্যকে দখল করে নিলো কিংবা আমরা যখন তা ধরে রাখতে পারলাম না বা ইচ্ছুক ছিলাম না। ইউরোপিয়ানরা আমাদের কাছ থেকে নেয়া জ্ঞানের আলো দিয়ে ঘোষণা করল রেনেসাঁ যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তারা তৈরী করল বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো বর্তমানে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ চর্চাপিঠে পরিণত হয়েছে।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্পদের অপব্যবহার আল্লাহ কতদিন সহ্য করেন তা দেখার বিষয়। আল্লাহ যেভাবে তার রাসূলের (সাঃ) নবুওয়াতের প্রথম বিন্দুতে তাকে জ্ঞানের তথা শ্রেষ্ঠত্বের সাধক হতে আদেশ করেছিলেন, তিনি তা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল বিশাল। তাঁর পরবর্তী মুসলিমরা তার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করতে পেরেছিলেন বলে তাঁরাও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পেরেছিলেন। আমরা তা পারি নি তাই আমরা শ্রেষ্ঠ নই, মর্যাদাবান নই। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ আমাদের আছে। ইতিহাস বলে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান যারা নিয়ন্ত্রণ করেছে তারাই পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বর্তমান সমস্যা সংকুল পৃথিবীকে আমরা যদি সমস্যামুক্ত করতে চাই, আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথা আল-কুরআনের পথে এবং অনুকরণ করতে হবে মুহাম্মদ (স:) গৃহীত পদক্ষেপগুলো, যা আস্সুন্নাহ নামে পরিচিত ও বিদ্যমান। সামগ্রিকভাবে পৃথিবীবাসী যত দ্রুত এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করবে, ততই ত্বরান্বিত হবে তাদের কল্যাণময়, শান্তিময় ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার স্বপ্নের বাস্তবায়ন। কেন না যুগ যুগ ধরে প্রমাণিত হয়ে আসছে, কল্যাণময়, শান্তিময়, সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ ও যাবতীয় সমস্যাবলীর একমাত্র নির্ভুল ও যুগোপযোগী সমাধান হচ্ছে সঠিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা আল-কুরআন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "আমি এমন এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে পূর্বাপর সকল সমস্যার সমাধান বিদ্যমান।"

শিক্ষাঙ্গনের সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে এই কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য সাফল্য সহজেই অর্জিত হবে এবং আমরা ফিরে পাব আমাদের হারানো স্বর্ণালী যুগ, হারানো সালতানাত।

সম্পদ আমাদের আছে কিন্তু আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। সুতরাং সময় এসেছে চিন্তা করার, আমরা কি উঁচু উঁচু দালান নির্মাণ করতে থাকব নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করব।

বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা

মুহাম্মদ আসাদুল করিম*

প্রাককথা:

পবিত্র কুরআনে সূরা "আল-ক্বামারের" ১৭, ২২, ৩২, ও ৪০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন- "অবশ্যই আমি কুরআনকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সহজ করে নাজিল করেছি, অতএব আছে কি তোমাদের কেউ এর শিক্ষা গ্রহণ করার?"

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করে যুগে যুগে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তাফসীর এবং অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালনের প্রয়াস পেয়েছেন। আমাদের দেশে অনূদিত ও প্রকাশিত কুরআনের প্রতিটি গ্রন্থই নানা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, যেমন প্রত্যেক ফুলেরই রং এবং গন্ধ আলাদা।

মূলকথা:

বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা একসময় নামায ও দোয়া-দরুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ১৭-১৮ শতকে বাংলায় ব্যাপক কুরআন চর্চার সূচনা হয় মাত্র। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন মাওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া।

এ পর্যন্ত অনেক মুফাস্‌সিরই কুরআনের তাফসীর করে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখলে তাফসীর চর্চা আরো বেশী আদরনীয় ও গ্রহণীয় হবে বলে আমার বিশ্বাস।

- কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে অভিন্ন দৃষ্টিভংগী পোষণ করা, যাতে কুরআন চর্চার ক্ষেত্রে কোন বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।
- যথা সম্ভব বিতর্কিত বিষয় সমূহ পরিহার করা।
- কুর'আন চর্চার মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা।
- কুর'আন বুঝার আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপ প্রদান করা।
- তাফসীর শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালা জানা।
- তাফসীরে তারারী (৩১০ হিঃ) থেকে তাফসীরে ফী যিলালিল কুরআন (১৩৮৭হিঃ) পর্যন্ত এই হাজার বছরের তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রত্যেক মুফাস্‌সিরেরই থাকা প্রয়োজন।
- উসূলে তাফসীরের ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতীর 'আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন'; এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর 'আল ফাউযুল কাবীর' তাফসীর শাস্ত্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- উলুমে তাফসীর ও তাওয়ারীখে তাফসীর পর্যায়ে আমাদের ইতিহাসের কয়েকটি প্রধান প্রধান তাফসীর পড়া একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর তাবারী 'জা'মেউল কুরআন আন্ তা'য়ীলল কুরআন' ইমাম আবু জাফর বিন জারীর (৩১০হিঃ)।

প্রথমে ফিকাহর তাফসীর হিসেবে 'জাওয়ামেউল আহ্‌কাম' ইমাম আহমদ বিন আলী রাযীর 'আহকামুল কুরআন' ও হাদীস ভিত্তিক বিশাল সংগ্রহ হাফেজ ইমাদুদ্দীনের 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' (৭৭৪ হিঃ)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর 'তাফসীর আলকাবীর' (বৃহৎ ১৬ খন্ডে সমাপ্ত)

---

* ছাত্র, মাস্টার্স

আল্লামা যামাখশারীর 'আল-কাশ্‌শাফ' (৫২৮হি:), 'জামে আল-কুরতুবী' আল্লামা আলুসীর "রুহুল মা'আনী", মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর 'বায়ানুল কুরআন' (উর্দু-১২ খন্ডে সমাপ্ত)।

আধুনিক তাফসীরসমূহের মধ্যে রয়েছে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর 'তাফহীমুল কুরআন' (বাংলা ১৯ খন্ডে সমাপ্ত); আল্লামা রশীদ রেযার 'আল-মানার' (প্রকাশিত খন্ড-১২)

শাইখুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ ওসমানীর 'তাফসিরে ওসমানী' (বাংলা ৭খন্ডে সমাপ্ত); আবু সলিম মোহাম্মদ আবদুল হাই এর 'আসান তাফসির' (১ম খন্ড); আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর 'তাফসীরে সাঈদী', আল্লামা আসাদের 'ম্যাসেজ অব দি হোলি কুরআন' আল্লামা ইউসুফ আলীর 'দি হোলি কুরআন' (১ম খন্ড); সর্বশেষ সাইয়েদ কুতুব শহীদের কালজয়ী তাফসীর 'ফি যিলালিল কুরআন' (বাংলা ২২ খন্ডে সমাপ্ত)

শেষকথা:

আজ বিশ্ব অর্থনীতিতে যে ধ্বস নেমেছে, যে রাজনৈতিক বিবাদ দেখা দিয়েছে, যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে 'Might is right' এই ডিপ্লোমেটিক পলিসিতে যারা Super power হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, এগুলোর কোনটাই রাতারাতি আমাদের উপর সওয়ার হয়নি। ইতিহাসের যে সময়টাতে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর উপর কুরআন নাযিল হয়েছিল, তখন এর সব কয়টি সমস্যাই হুবহু আজকের মতোই সেখানে মজুদ ছিলো। মানব জাতির এক চরম যুগ-সন্ধিক্ষনে আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করলেন। মাত্র ২৩ বছর সময়ের মধ্যেই কীভাবে কোন্ কর্মনীতি ও কর্মকৌশল অবলম্বন করে একটি অশিক্ষিত, বর্বর, সভ্যতা বিবর্জিত মানব গোষ্ঠীকে মাত্র কয়েকটি বছরে বিশ্ব সভ্যতার শীর্ষ দেশে পৌঁছে দিয়েছে - সে যাদু মন্ত্রটা আজ আমাদের বের করতে হবে।

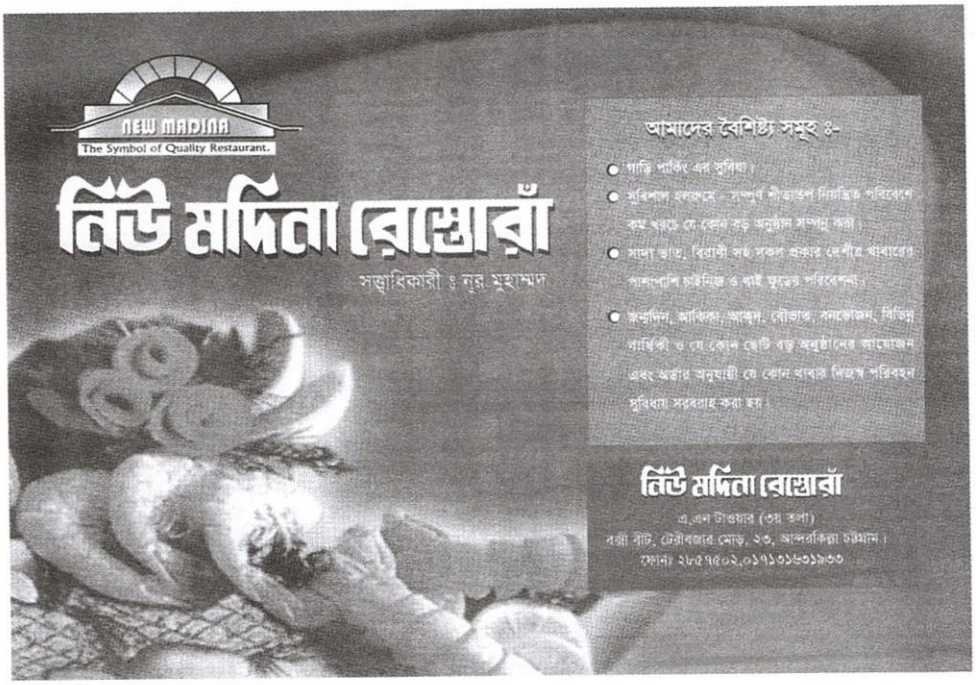

আলোকিত জীবনের জন্য

মোঃ আব্দুল কাদের*

শিক্ষার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় সৃষ্টি:

বস্তুবাদী শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন বসনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম আলীয়া আলী ইজেতবিগোভিচ। তিনি বলেছেন সভ্যতা মানুষকে শিক্ষিত করে। সংস্কৃতি (ধর্ম) মানুষকে আলোকিত করে। একটির প্রয়োজন জ্ঞানার্জন, অপরটির প্রয়োজন ধ্যান বা প্রার্থনা। ধ্যান নিজেকে জানার এবং পৃথিবীতে নিজের স্থানকে বুঝে নেয়ার একান্ত প্রচেষ্টা বা জ্ঞানার্জন, শিক্ষা কিংবা বাস্তব উপাত্তসমূহ সংগ্রহ প্রচেষ্টার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। টলস্টয় তার সারাজীবন অতিবাহিত করেন মানুষ ও মানুষের নিয়তি বিষয়ে চিন্তা করে, অপরদিকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবাদ পুরুষ গ্যালিলিও সারাজীবন নিজের চিন্তাকে বেঁধে রাখেন একটি বস্তুর পতনজনিত সমস্যার সাথে। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিস্টটল তাদের দর্শন চিন্তায় সত্যিকারের সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরী করতে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন বলেছেন। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগে আদর্শলিপি দেখে হাতের লেখা অভ্যাস করতে হতো। আর তাতে লেখা ছিল 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'চুরি করা মহাপাপ' 'গুরুজনের সম্মান করিবে', 'অহঙ্কার পতনের মূল' ইত্যাদি প্রবাদ বাক্যের অনুশীলনের মাধ্যমে। টলস্টয়ের "একজন মানুষের কতটুকু জমির প্রয়োজন" এ গল্পটি, যার নীতিকথা হলো "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু", বস্তুত পক্ষে এডুকেশন শব্দটির প্রতি অক্ষরে কাঙ্খিত স্বরূপ তথা নৈতিকতারই বর্ণচ্ছটা ফুটে ওঠে।

E	(ইকুইটি)	সকল কাজে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা।
D	(ডিউটিফুলনেস)	মানবতা, দেশ, জনগণ, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সদা সর্বদা কর্তব্যপরায়ণতা।
U	(ইউনিটি)	সত্য ও সুন্দরের জন্য ঐক্যবদ্ধ।
C	(কারেজ)	সত্য ও সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহসিকতা।
A	(একাউন্টিবিলিটি)	মেধা, সময় ও জাতীয় সম্পদের সম্যক ব্যবহারের দায়বদ্ধতা।
T	(ট্রান্সপারেন্সি)	আচার-ব্যবহার ও সকল কাজে সততা ও জবাবদিহিতা।
I	(ইনভেস্টিগেশন)	নব দিগন্তের উন্মোচন বা উদ্ভাবন।
O	(অবিডিয়েন্ট)	জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ ও আনুগত্য।
N	(এনমেসিয়াস)	মহৎ কাজের প্রতি আসক্তি।

মূলত শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে প্যারাডাইস লস্টের বিখ্যাত কবি মিল্টনের বক্তব্যে। তিনি বলেন - "Education is the harmonious development of body, mind and soul." অর্থাৎ, শিক্ষা হচ্ছে দেহ, মন এবং আত্মার সমন্বিত উন্নয়নের নাম।

আমরাই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ

নিউরোলজিস্টরা গবেষণা করে বলেছেন, আইনস্টাইনের সংরক্ষিত মগজ, সাধারণ মানুষ থেকে অনেকটা বড়। কিন্তু,ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতিভাই সৃষ্টিগত ভাবে সমান। মানুষের দেহের চল্লিশ ভাগের একভাগ হলো তার মস্তিষ্কের ওজন। আর মৌমাছির দেহের ওজনের একশত সাতচল্লিশ ভাগের একভাগ হলো মস্তিষ্কের ওজন। ক্ষুদ্র এই পতঙ্গগুলো মস্তিষ্ককে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে। তাদের বানানো কারুকাজময় মৌচাক আর তাদের শাসনব্যবস্থা দেখলেই তা বুঝা যায়। হাজার মানুষের ভেতর একজনও তার মস্তিষ্কের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে না। আমাদের দেহের ভেতর মাত্র তিন পাউন্ড ওজনের মস্তিষ্কের গঠন সব থেকে জটিল। পরম আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে,

---

* ছাত্র, ৮ম সেমিস্টার

পৃথিবীর সর্বকালের সর্ব- প্রকার যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বকে এক জায়গায় একত্র করে যদি এই মেমোরি সেলে রাখা যায়, তাতে এর এক-লক্ষ ভাগের এক ভাগ জায়গা পূরণ হবে না। সুবহানাল্লাহ্ ! তবে দুঃখের বিষয় হলো, আমরা এক হাজার ভাগের এক ভাগও কাজে লাগাই না বা লাগাতে পারি না।

রাসূলের (সঃ) জীবন গঠনের আন্দোলন

মহানবীর আগমনের প্রায় হাজার বছর আগে এথেন্সে হেমলক পানে আত্মহত্যা করেন সক্রেটিস। অতঃপর এই সহস্র বছরে রোমান এবং পারস্য সভ্যতা থিতিয়ে আসে। এই সময়টাকে ইউরোপের অন্ধকারের যুগ বলা হয়। ভারত বর্ষে কিছুটা জ্ঞানচর্চা থাকলেও আরবে ছিল তখন আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভীর ভাষ্য মতে সে সময়ে আরবে মাত্র হাতেগোনা আঠারো জন মানুষ লেখাপড়া জানতো।

মুহাম্মদ (সঃ) নবুয়্যাত পাওয়ার পরই জীবন গঠনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন একজন উম্মী। কিন্তু তিনিই হলেন জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধারক। মূলতঃ কুরআন কেন্দ্রিক জ্ঞানের এতটা চর্চা করতেন যে, তাঁর শিক্ষক মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি এত সাধনা করে শেষাবধি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলোনা"। তাঁর প্রেরণায় আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, তালহা, যোবায়ের (রঃ), এঁরা হলেন একেকজন জ্ঞানতাপস। আলী (রঃ) ছিলেন সেই সময়ের একজন বিজ্ঞানী। মহানবী জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয"। এর সময় সীমা সম্পর্কে বলেছেন, "তোমরা দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর"। রাসলের (সঃ) সাধনার চিত্রকে পূর্ণরূপে তুলে ধরে বিখ্যাত প্রাচ্য- ভাষাবিদ জার্মান পন্ডিত ইমানুয়েল ডিউস বলেন, "কুরআনের সাহায্যে আরবরা আলেকজান্ডারের জগতের চাইতেও বৃহত্তর জগৎ, রোম সাম্রাজ্যের চেয়েও বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। কুরআনের সাহায্যে একমাত্র তারাই রাজাধিপতি হয়ে এসেছিলেন ইউরোপে। সেথায় ভেনিসিয়রা এসেছিল ব্যবসায়ী রূপে। ইহুদীরা এসেছিল পলাতক বা বন্দী রূপে।

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন

ইসলামের মৌলিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের সর্বোত্তম মডেল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (সঃ) জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"। আল্লাহর রাসূল (সঃ) আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে সচেষ্ট ছিলেন। শিশু অবস্থায় দুধ পান, বাল্যকালে খেলার মাঠে, যুবক বয়সে হিলফুল ফুযুল গঠন করে মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে, স্বামী হিসেবে স্ত্রীদের হক পালন, পিতা হিসেবে ছেলে মেয়েদের আদর-যত্ন ও তত্ত্বাবধান, নানা হিসেবে নাতীদের আদর-সোহাগ, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন, ক্রেতা, বিক্রেতা, সেনাপতি, বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আমাদেরকে আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বীনদারীর কথিত লেবাসে দুনিয়ার ঝামেলামুক্ত হয়ে বৈরাগ্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে জীবন পরিচালনা করতে চান। আবার কেউ কেউ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দ্বীনের কথা বেমালুম ভুলে থাকেন। অথচ ইবাদত বন্দেগীর সকল ক্ষেত্রেই যদি আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করা হয়, তাহলে দ্বীনমুক্ত দুনিয়া যেমনি কল্পনা করা যায় না, তেমনি দুনিয়ার ঝামেলা মুক্ত হয়ে সত্যিকার অর্থে দ্বীনের অনুশীলন সম্ভব নয়। মূলতঃ দুনিয়ার বিভিন্ন কাজ কর্মের মধ্য দিয়েই দ্বীনের অনুসরণ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

আমাদেরকে 'ইক্‌রা'র কাছে ফিরে যেতে হবে

আফলাতুন আল কাউছার*

রাসূল (স:) বলেছেন: اَلْحِكْمَةِ ضَالَّةِ الْحَكِيْمِ حَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "জ্ঞানের কথা বিজ্ঞজনের হারানো সম্পদ, সুতরাং যেখানেই সে তা পাবে সবার আগে লুফে নিবে"-(তিরমিযি)। উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব বুঝতে পারি। ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম আয়াতও জ্ঞানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে। আলাহর নাযিলকৃত আয়াতের প্রথম শব্দ-ই "পড়"(اقرأ)। কুরআন আমাদেরকে পড়তে বলছে এবং নির্দেশ দিচ্ছে জ্ঞান চর্চার। এক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা হতাশাব্যাঞ্জক। দুনিয়ার শ্রেষ্ট জীবনব্যবস্থা আল-ইসলামের অনুসারীরা-ই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হবে–এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমানরা সত্যের অনুসারী হয়েও পৃথিবীর সবচেয়ে অবহেলিত ও পশ্চাদপদ জাতিতে পরিণত হয়েছ । পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলোর তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে তারা। এক সময় মুসলমানরা প্রবল প্রতাপে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। অর্ধপৃথিবী শাসন করেছিল তারা। জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সরব পদচারণা ছিল। মুসলমানদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল আন্দালুসিয়ার (স্পেন) কার্ডোভা। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো থেকে জ্ঞান পিপাসুরা উচ্চশিক্ষার্থে কার্ডোভায় যেত। অন্ধকার ইউরোপকে জ্ঞানের পথ দেখিয়েছিল মুসলমানদের কার্ডোভা-ই। মুসলমানদের বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বিপরীত। একসময় মুসলমানদের কাছে যা ছিল , এখন তা ইউরোপের ইহুদী-খ্রীস্টানদের হাতে চলে গেছে। মুসলমানরা এখন উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপ-আমেরিকার দিকে ছুটে যায় । পুরো- মুসলিম বিশ্ব আজ জ্ঞানের জগতে নেতৃত্বশূন্য। আজ মুসলমানদের করুণ অবস্থা। তারা আজ অধ:পতিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, নিগৃহীত। কেন তারা অধ:পতিত? কেন মার খাচ্ছে দেশে দেশে? কেন নির্যাতিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে দিকে? বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূল (স:) বলেছিলেন- تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ "আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধর তাহলে কখনো পথ হারা হবে না, একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, অপরটি তাঁর রাসূলের সুন্নাত"। উপরোক্ত হাদীসের আলোকে মুসলমানদেরকে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। বিপুল সংখ্যক মুসলমানরা না আল্লাহর কিতাব মানে,না রাসূলের হাদীস মানে। মুসলিম দেশগুলোতেই কুরআন পরিতাজ্য হয়েছে। কুরআনের প্রতি মুসলমানরা ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছে অনেক আগে-ই। কুরআন যেখানে মেনে চলছে না, সেখানে রাসূলের সুন্নাত কিভাবে মানবে? । রাসূলের তেইশ বছরের জিন্দেগী পুরো পৃথিবীর জন্য কিয়ামাত অবধি শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মুহাম্মদ-ই তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। শুধু মুসলমানরা নয়, অমুসলিম পন্ডিতরা-ই তা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে। সত্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারে নি তারা। কুরআনের ভাষায়: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) " রাসূলের জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ"। রাসূল (স:) দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মুসলমানদের ক'জন-ই রাসূলকে আদর্শ হিসেবে মানে?। মুসলমানদের পতনের অন্যতম কারণ, রাসূল (স:) এর আদর্শ থেকে সরে আসা। রাসুলের আদর্শ তারা জীবনে ধারণ করে না। শিক্ষা ও নেয় না । তারা যতদিন এ আদর্শ থেকে পিছু হটবে ততদিন নির্যাতিত হবে। যতদিন পর্যন্ত রাসূল (স:) কে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে ততদিন জাতি হিসেবে অধ:পতিত, নিগৃহীত জাতির পরিচয় বহন করতে হবে। নাস্তিক বার্ট্রান্ড রাসেল পর্যন্ত বলে গেছেন: Islam is the best religion in the world but Muslims are worst nation, because they are far away from their ideology. অর্থ- ইসলাম-ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কিন্তু মুসলিমরা পৃথিবীর নিকৃষ্টতর জাতি, কারণ তাঁরা তাঁদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে।

---

* ছাত্র, ৭ম সেমিষ্টার

বিশ্বে মুসলমানদের বর্তমান প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে বার্ট্রান্ড রাসেলের উক্তি-ই পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের করুণ অবস্থা । তাদের অধঃপতনের চিত্র ভেসে উঠে চারিদিকে। মুসলমানদের পতন মানে বিশ্বের পতন। মুসলমানদের পরাজয় মানে মানবতার পরাজয়। বিশ্বের দিকে দিকে মার খাচ্ছে মুসলমানরা। ইহুদী-খ্রীস্টানদের গণহত্যার নির্লজ্জ নৃত্য চলছে। অতীত পৃথিবীতে মানবতার রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছিল তারা। মুসলমানদের পতন না হলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ৫৫ মিলিয়ন মানবকে জীবন দিতে হত না। জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পরমাণুবোমার বলি হতে হয়েছে দুই লক্ষাধিক মানবকে। মানবতার উপর এই নগ্ন হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে মানবতার ধ্বজাধারী , গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা আমেরিকার দ্বারা। আমেরিকা এখনও বিশ্বকে গণতন্ত্রের দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে!। বিজ্ঞানকে মানবতার ধ্বংযযজ্ঞে ব্যবহার করেছিল আমেরিকা-ই। পৃথিবী জুড়ে মানবতার কবর রচনা করেছে এই দেশ। গেল আমেরিকার কথা। আবুল হাসান আলী নদভী ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল) নামক একটি বই লিখেছিলেন। মুসলমানদের উত্থান পতনের কাহিনী আর বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন তাতে। মুসলমানদের পতনে বিশ্বের যে ক্ষতি হয়েছে আর হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার মানব হত্যার ভয়ংকর নৃত্যই তা প্রমাণ করে। ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর যে হত্যা যজ্ঞ চালিয়েছিল সালাউদ্দিন আইয়ূবি কি তা করেছিল? বিশ্বের দিকে দিকে যুদ্ধ লেগে আছে আজ, এই যুদ্ধের ইন্ধন যোগাচ্ছে আমেরিকা, বৃটেন, ইসরায়েল। পুরো-পৃথিবীতে এদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বীজ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে আজ। খুন রাহাজানি আর সন্ত্রাসে ছেয়ে গেছে পুরো পৃথিবী। বিশ্বব্যাপী এই সন্ত্রাসের নেতৃত্বে আছে আমেরিকা আর বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদী। অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট আমাদেরকে তাই বলে। পুরো বিশ্বের উপর এ শয়তানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জ্ঞানের জগতে নেতৃত্বের মাধ্যমে। অন্যদিকে পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র হচ্ছে মিডিয়া। এ মিডিয়া এখন সন্ত্রাসী দেশ ইসরাঈলের নিয়ন্ত্রণে। পুরো বিশ্বের মিডিয়া শক্তি তাদের করতলে। এ মিডিয়ার মাধ্যমে পাপিষ্ট ইহুদীরা মুসলমানদের ঘরে ঘরে অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের নৈতিকতা কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এ মিডিয়ার কারণেই মুসলমানরা দ্বীন থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। মিডিয়া জগতে মুসলমানদের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। তারা মিডিয়া থেকে হাজার মাইল দূরে পড়ে আছে জ্ঞানের জগতে পিছিয়ে পড়ার কারণে। মুসলমানরা যতই জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে চলে যাবে-পৃথিবী ততই পিছিয়ে যাবে। বিশ্ব মানবতার উপর শয়তানের পূজারীদের অত্যাচার, নিপীড়ন ততই বেড়ে যাবে। মানবতার দুশমনদের নিরীহ মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি-খেলা বন্ধ হবে না, যদি মুসলমানরা এগিয়ে না আসে। পৃথিবী জাগবে না যদি মুসলমানরা ঘুমিয়ে থাকে। যাবতীয় অপশক্তিকে জ্ঞান দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। জ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জ্ঞান-যুদ্ধে পরাভূত করতে পারলেই প্রকৃত বিজয় আসবে। মুসলমানদেরকে জ্ঞানের জগতে নেতৃত্ব দিতে হবে। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে যেদিন ইউরোপ-আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের দিকে ছুটে আসবে সেদিনই আসবে পৃথিবীর শান্তি। অশান্ত এই পৃথিবীকে শান্ত করতে মুহাম্মদ (সঃ) এর রেখে যাওয়া আদর্শের কোন বিকল্প নেই।

মুহাম্মদ (সঃ) আজ বেঁচে নেই - আছে তাঁর আদর্শ। এই আদর্শই ইসলাম। মানবতার ধর্ম ইসলাম-ই বিশ্বের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে- যেমন দিয়েছিলেন নবী মুহাম্মদ (সঃ)। অস্ত্র-বোমা দিয়ে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেয়া যায়-নিরাপদ পৃথিবী গড়া যায় না। তাই-কোন অস্ত্র নয়, নয় বোমা জ্ঞান আর আদর্শই হবে নিরাপদ পৃথিবী গড়ার হাতিয়ার। মুসলমানদেরকে একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে হবে মানব সমাজকে। তাই ফিরে যেতে হবে জ্ঞানের দিকে, আদর্শের দিকে। কুরআনের প্রথম শব্দের দিকে ফিরে যেতে হবে মুসলমানদেরকে। এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

নিয়্যত : ইবাদতের মৌলিক শর্ত

খালেদ মোর্শেদ*

সভ্যতার ইতিহাস মহাপুরুষদের সাধনা, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মহিমায় ভাস্বর। মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে যুগে যুগে কত না ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করেছেন তাঁরা। সত্যের জ্যোতিতে বিশ্বালোককে উদ্ভাসিত করতে গিয়ে নিজেদের তিলে তিলে দহন করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ ও সত্যানুসন্ধিৎসা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় নি। কারণ জীবনের যাত্রাপথে কোটি কোটি নর-নারী আজও তাদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা পায়।

প্রতিভাবানরা তাঁদের মনস্বীতার মহিমায় বিশ্বজগতকে সুন্দর ও সুভাষিত করেন। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অনন্য সাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি, সুনিপুণ সঙ্গীত সাধনা বা নয়ন বিমোহন শিল্পকলা সৃষ্টির মাধ্যমে আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধির বহু অজানা দিগন্ত উন্মোচন করেন। কিন্তু, মহাপুরুষরা দেখান মুক্তির পথ। তাঁরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর মানুষকে ডাক দিয়ে বলেন, এগিয়ে চলো- অন্ধকার থেকে আলোতে, অসত্য থেকে সত্যে। তাঁদের আদর্শ ও সত্যদৃষ্টি দিশেহারা-পথহারা মানুষকে আজও নিত্যনতুন কল্যাণ বোধে উদ্দীপ্ত করে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মানবজাতির হৃদয়াকাশে যে নতুন জ্যোতির্মন্ডল উন্মুক্ত করে গেছেন, আত্মদ্বন্দ্বে কলুষিত ও স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন-চিত্ত অসহায় পঙ্গু ও দুর্বল মানুষের কাছে তা অন্ধকারে আলো, দুঃখে সান্ত্বনা, পতনে আশ্রয় ও রোগে মুক্তি। তিনি প্রতিভার ঐশ্বর্যে জগতকে বিমূঢ় করলেন না, ভোগ-বাসনার স্বপ্নে আচ্ছন্ন বিষয়ী মানুষদের উপর চৈতন্যের আলো নিক্ষেপ করলেন। ত্যাগ, মৈত্রী ও করুণার সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন জগৎবাসীকে। তাঁর উদার মানসিকতা-মানবিকতা ও অখন্ড সত্যদৃষ্টি শুধুমাত্র দেশ কাল বা সম্প্রদায়-বিশেষের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শত শত বৎসর ধরে অগণিত মানুষকে মঙ্গল ধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তাঁর স্মরণ সবসময় আত্মশুদ্ধির পথকে প্রশস্ত করে। কিন্তু জগতবাসীর যেহেতু বিগত আড়াই হাজার বছরের মধ্যে ত্যাগের বদলে ভোগ, মৈত্রীর পরবর্তে বিভেদ এবং করুণার স্থলে হিংসার প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রবণতা বিশেষ হ্রাস পায় নি, সেহেতু মহানবীর অমৃত জীবন ও শ্বাশ্বত বাণীকে আজ বারবার স্মরণ করা প্রয়োজন। বর্তমান মুহূর্তে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি এই কারণে যে, হিংসা বিদ্বেষ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস পৃথিবীকে আজ যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছে, তাকে বারুদের স্তুপ বা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আখ্যা দেয়া যায়।

আজকের পৃথিবী হিংসা-দ্বন্দ্বে কলুষিত, কামনা-বাসনায় জর্জরিত। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নেই, জাতির প্রতি জাতির শ্রদ্ধা নেই। অধিকাংশ মানুষই উন্মত্ত পতঙ্গের মত বিষয়রূপ আগুনের দিকে ছুটছে। অনিত্যকে নিত্য ভেবে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছে অশান্তি ও হতাশায়। আজ ত্যাগের বদলে ভোগ, প্রেমপ্রীতির পরিবর্তে হতাশা-স্বার্থপরতা এবং সত্য-সাধনার স্থলে মিথ্যাচার সমগ্র জাতির অস্তিত্বকে জীর্ণ দীর্ণ করতে উদ্যত।

মহানবী (স.) সকল মানুষকে আপনার বিরাট হৃদয়ে ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি জাতি মানেন নি, বর্ণ মানেন নি, যাগযজ্ঞ মানেন নি। দয়া এবং কল্যাণ তিনি আল্লাহ্ থেকে প্রার্থনা করলেও মানুষেরই অন্তরে তিনি এদের

---

* ছাত্র, ৭ম সেমিস্টার

উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। তিনি যে দুঃখ-নিবৃত্তির পথ দেখিয়ে গেছেন, সে পথের বড় আকর্ষণ হল এই যে, দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখ স্বীকারের দ্বারা মানুষ নিজেকে বড় করে জানে, স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। তিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঞর্থক নয়, সদর্থক। যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে। যে মুক্তি শুধু মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের, রাষ্ট্রের, দেশের বিশ্বব্যাপী সর্বব্যাপী বিরাজমান, বিদ্যমান।

বাল্যকাল থেকেই তিনি সিদ্ধার্থ ধীরশান্ত স্বভাব ও চিন্তাশীল। ভোগ-বিলাস তাঁকে আকর্ষণ করে না, রাজৈশ্বর্য তাঁকে মুগ্ধ করেনা, চরম আড়ম্বর, ঐশ্বর্য ও বৈভবের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি উদাসীন, নির্লিপ্ত ও অচঞ্চল। তিনি জগতের স্বারস্বত সত্যকে অত্যন্ত সরল করে "সমগ্র জীবনের সামগ্রী" করে দেখেছেন। তিনি বারবার বলেছেন, যা অন্তরের সামগ্রী তাকে বাইরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের অন্তরের মধ্যে "চিরকালের আলোক নিক্ষেপ" করে তিনি আমাদের সমগ্র জাতিকে জাগিয়েছেন। আমাদের নিজ নিজ সত্যমূর্তিকে আমাদের দিয়েই প্রত্যক্ষ করাতে চেয়েছেন। এই সংসারের "সর্বব্যাপী মায়াজালকে" ছেদন করতে গিয়ে তিনি স্রষ্টার স্বর্গরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি প্রতাপ, সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মাঝে স্রষ্টাকে দেখলেন না। বিষয় বুদ্ধি মানুষের কাছে তিনি প্রচার করলেন, যে নম্র, পৃথিবীর অধিকার তারই। যে দীন, সে ধন্য। তিনি দিখিয়েছেন, মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যে বা শক্তিমত্তায় নেই। মানুষের মধ্যে স্রষ্টার প্রকাশ আছে, এই সত্যই সে সত্য। জগত সমক্ষে দাঁড়িয়ে এই মহামানব ধনকে নিন্দা করেছেন। বলেছেন, "ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা"। আচার ও শাস্ত্রকে তিনি কখনো মানুষের চেয়ে বড় হতে দেন নি। অস্পৃশ্যকে তিনি স্পর্শ করেছেন, অনাচারীর সঙ্গে একত্রে আহার করেছেন এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করে তাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করেছেন। শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেছেন। স্রষ্টাকে পেতে বিশেষ কোন সাজ-সরঞ্জাম বা উপচার-উপকরণ না হলেও চলে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে কামনা-বাসনার লেশমাত্র থাকলেই তিনি দূরে সরে যান। কেননা "ইবাদতের মৌলিক শর্তই নিয়্যাত-চিন্তার পরিশুদ্ধি।"

আমরা সবাই এক-অভিন্ন, এই অনুভবকে আজ বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। এছাড়া এ যুগে সারাক্ষণ আমরা অস্থির অশান্ত। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ভোগ-বাসনা ও বিলাসভ্রমের দ্বারা আজ আমরা বিপুল ভাবে প্রভাবিত। তাই এ মূহুর্তে বিশেষ প্রয়োজন, চঞ্চল জীবন যাত্রাকে শান্ত করে মহানবীর মুক্তি মন্ত্রকে নতুন করে জীবনে আহ্বান করা। বিষয়াসক্ত মনকে স্রষ্টাসিক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও আজ বিশেষ জরুরী। তাই মহানবীর উদার মানব প্রেমের পতাকাতলে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে আজ যদি পৃথিবীর সবাইকে আহ্বান জানাই- তবে যেমন মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে, পৃথিবীও তেমনি খুঁজে পাবে উত্তরণের অভয়মন্ত্র। আর তাই সকলের আগে দরকার চিত্তের শুদ্ধি, মনের পবিত্রতা।

আজকের পৃথিবীতে মানুষের বৈষয়িক উন্নতি অনেক হচ্ছে, কিন্তু আত্মিক উন্নতির পথ ক্রমশঃ যেন সংকুচিত হয়ে আসছে। তাই মানুষের সম্পদ আছে শান্তি নেই। শক্তি আছে, সুখ নেই। বিদ্যা আছে, জ্ঞান নেই।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নক্ষত্রযুদ্ধের ভয়ে কম্পমান, পারস্পরিক রেষারেষিতে সদাব্যস্ত এবং স্বার্থচিন্তা ও ভোগ-লালসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত আজকের পৃথিবী মহানবীর শিক্ষা-বাণী-আদর্শকে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে? সমস্ত ইবাদত যেন অন্তসার শূন্য। নিয়্যাত তথা আত্মার-চিন্তার পরিশুদ্ধি ছাড়া ইবাদত হচ্ছে মরা বৃক্ষে পানি দিয়ে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের সঞ্জীবনী শক্তি জাগানোর ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। আর আমরা সবাই ঠিক যেন তাই করছি।

পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত তার এ বিখ্যাত গ্রন্থ এখনও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সিলেবাস হিসেবে ইউরোপ-আমেরিকায় পড়ানো হয়। প্রফেসর ফিলিপ কে হিট্রির মতে "দ্বাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বে তাঁর গ্রন্থ পথ প্রদর্শক ছিলো"।

- **আলী ইবনে ঈসা ও আম্মার:** বিখ্যাত এই চিকিৎসকদ্বয়ের "আল কিরা আল কাহহালীন" ও "আল মুসতাখাব ফি ইলাজ আল-আইন" গ্রন্থ দু'টি ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে চক্ষু চিকিৎসা বিদ্যায় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। আম্মারের গ্রন্থে ১৩০ প্রকারের চক্ষু রোগের চিকিৎসার উল্লেখ রয়েছে।
- **আবুল কাসেম আয যাহরানী:** তিনি স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসক ছিলেন। এই চিকিৎসা বিজ্ঞানীর "আত তা'সীফ" গ্রন্থে রোগ নির্ণয়, অপারেশন পদ্ধতি ও অপারেশনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বিভিন্ন ছবির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।
- **আল বেরুনী:** বিখ্যাত ভাষাবিদ পন্ডিত আল বিরুনীর পূর্ণ নাম হচ্ছে আবু রায়হান মুহাম্মদ বিন আহম্মদ আল-বেরুনী। এই মুসলিম পন্ডিত মুসলিম জগতে শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল হিন্দ"এ ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তৈরি করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ "কিতাবুত তাফহীম" এ উক্ত মানচিত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।
- **আল রাজী:** আল রাজী তেহরানের রাই নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক ৬০টির বেশি বই রচনা করে অমর হয়ে আছেন। তিনি বাগদাদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। অস্ত্রোপাচারে তিনি 'স্যাটন' আবিষ্কার করেন। তিনি সর্বপ্রথম হাম ও বসন্তের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেন ও তাদের লক্ষণ ও উপসর্গের যথার্থ ব্যাখ্যা পেশ করেন।
- **আত তাবারী:** প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আত তাবারী কর্তৃক রচিত চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ 'ফেরদাউস আল হিকমা' ছিল আরবী ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ ।
- **হুনাইন বিন ইসহাক:** চিকিৎসা বিজ্ঞানী হুনাইন বিন ইসহাক চক্ষু বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি চক্ষুর গঠন, চক্ষুর সঙ্গে মস্তিস্কের সংযোগ রক্ষাকারী স্নায়ুকোষ, চক্ষুর বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন।
- **আলী ইবনে আব্বাস আল মাজুসী :** যুগশ্রেষ্ঠ এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী বিরচিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ কিতাব আল মালেকীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থটি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় অনুদিত হয়েছে।
- **মুকাদ্দিমী:** এই মুসলিম ভূগোলবিদ ফিলিস্তিনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ভুগোলবিদ ও পর্যটক । তিনি দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে সর্ব বৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক ভূগোল গ্রন্থ 'আহকাম আত-তাকাছীম ফি মারিফাত আল আকালীম' রচনা করেন।
- **আল ফারাবী:** বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আবু নাছের মোহাম্মদ আল ফারাবী ৮৭০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে গণিতবিদ, রসায়নবিদ, জোর্তিবিদ, দার্শনিক। তিনি প্রায় সত্তরটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন।
- **জাবের ইবনে হাইয়ান:** জগৎ বিখ্যাত এই রসায়নবিদ ৭৭৬ সালে কুফা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁকে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলা হয়। রসায়ন শাস্ত্রের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০০ এর বেশী।
- **আল-কিনদী:** ইনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। গণিত, ভূগোল ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ভাষাবিদ হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৬৯ টি।
- **ইয়াকতুত আল হাসাঈ:** এই মুসলিম পন্ডিতকে ভূগোল শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি ১৩ দশ শতকের প্রথম দিকে প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগৌলিক বিশ্বকোষ 'মু'জাম আল বুলদান' রচনা করেন।
- **ড.আব্দুল সালাম:** প্রখ্যাত মুসলিম পদার্থবিদ। ড.আব্দুস সালাম পাকিস্তানে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানের অবদান

মো: ফয়জুল ইসলাম*

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ঃ

উন্নতির মূলে রয়েছে আমাদের পূর্বসূরী মুসলিম বিজ্ঞানী ও পন্ডিতগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিশ্ব সভ্যতায় যেসব মুসলিম বিজ্ঞানী ও পন্ডিতগণ তাদের স্ব-স্ব যোগ্যতায় চিরঅম্লান হয়ে আছেন তাদের সম্পর্কে পাঠকের সামনে কিছু পরিচিতি তুলে ধরাই হল এই লেখনীর মূল উদ্দেশ্য।

- **আল-খাওয়ারেযমী:** মূল নাম মুহাম্মদ বিন মূসা আল-খাওয়ারেযমী। তিনি গণিত শাস্ত্রের অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ৭৮০ খ্রীস্টাব্দে পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-জাবর" থেকেই বর্তমান Algebra (আলজেবরা)'র উৎপত্তি হয়েছে।
- **আলবাত্তানী:** আলবাত্তানীই সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতির অনুপাত প্রকাশ করেন এবং ক্ষেত্রফলের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন।
- **ওমর খৈয়াম :** তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে ওমর বিন ইবরাহিম আল-খৈয়াম। তিনি পাটিগণিত ও বীজগণিতের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ওমর খৈয়াম ছিলেন একাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ।
- **জাবির ইবনে আফলাহ:** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল হায়াত" এ গোলাকার সাধারণ ত্রিকোণমিতির উপর পরিচ্ছেদ প্রকাশ করে মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রাখেন।
- **মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল মাহানী:** তিনি সাধারণত আল-মাহানী নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রবক্তা। এই মুসলিম বিজ্ঞানী ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও ঘন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেন।
- **আবুল ওয়াফা:** তিনি সর্বপ্রথম সাইন উপপাদ্যের সাথে গোলাকার ত্রিভুজের সাধারণত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতির তালিকাও তৈরি করেন।
- **ইবনে খলদুন:** ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের জনক, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহাসিক। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল ইবার"। এই গ্রন্থ তিনি তিন খন্ডে সমাপ্ত করেন এবং আরব জাতির ইতিহাস এবং আফ্রিকার মুসলিম শাসন ও বারবর জাতির ইতিহাস জানা যায়।
- **আল-বালাজুরী:** তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-বালাজুরী। তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী এবং একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "ফুতহুল বুলদান" এ তৎকালীন মুসলমানদের বিভিন্ন রাজ্য জয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।
- **ইবনে জারীর আত-তাবারী:** তাঁর পূর্ণ নাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আত-তাবারী। ইয়েমেনের অধিবাসী এই পন্ডিত পৃথিবীর ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল " তারীখুল রুসুল ওয়াল মুলুক" যা নবী-রাসূল ও রাজা-বাদশাহদের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে ভরপুর।
- **আল-মাসউদী:** ঐতিহাসিক আল-মাসউদীকে আরবের হিরোডোটাস বলা হয়। ইতিহাস রচনায় তিনি বর্ষ ও অধ্যায় ভিত্তিক পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তাঁর লিখিত "মুরুজ আয-যাহাব" নামক বিশ্বকোষে তিনি ইসলামের ইতিহাস ছাড়াও ভারতবর্ষ, পারস্য, রোমান ও ইহুদীদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন।
- **ইবনে সীনা:** তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে আবু আলী আল-হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ ইবনে সীনা। এই বিশ্ব বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী মাত্র ১৭ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও দর্শন, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন যুগে তিনি অদ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ "আল-কানুন ফিতত্বিব" এ তিনি ৭৬০টি ঔষধের নাম উল্লেখ করেছেন।

---

* ছাত্র, ৭ম সেমিষ্টার

সৃষ্টির বৈচিত্র ঃ মহান প্রভুর রঙ

মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান*

মহান শিল্পীর সৃষ্টি কত সুন্দর! কোথাও কোন খুঁত নেই। তার চেয়েও সুন্দর মহান স্রষ্টা যা চোখের ও মনের উভয় দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (مَا تَرَى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ) অর্থ- দয়াময় স্রষ্টার সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবেনা। তোমার দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেখো কোন ত্রুটি দেখো কি? আল্লাহ তায়ালা আবার বলেনঃ (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَر خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيْرٌ)অর্থ- তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।

স্রষ্টার এত সুন্দর নিখুঁত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাই পৃথিবীর সবকিছুর উপর মানুষকেই কর্তৃত্ব করতে দিয়েছেন তিনি। কত সৌভাগ্য মানুষের। মানুষ এ সত্যকে আনন্দ ও ভোগের মোহে তুড়ি মেরে উঁড়িয়ে দিতে পারে না। মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ অন্যতম। অন্তঃকরণকে ভেতরে বাইরে সঠিক পথ দেখায় চোখের দৃষ্টি। চোখের দৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক গুরুত্ব যাই থাক না কেন, এর আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অপরিসীম। সাদা কালো টিভির পর্দায় সবকিছু সাদা কালো দেখায়। রঙ্গিন টিভির পর্দায় সাদাকে সাদা, কালোকে কালো, লালকে লাল, সবুজকে সবুজ দেখায়। তার চেয়ে মুল্যবান সম্পদ মানুষের দু'টি মুল্যবান চোখের দৃষ্টি। চোখের রঙিন দৃষ্টিতে দুনিয়ার সবকিছুর প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে। এমন মুল্যবান চোখ রাব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠ উপহার। এ চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমরা কত কী দেখি। সুন্দর-কুৎসিত, ভালো-মন্দ, উত্থান-পতন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নয়ন জুড়ানো, চিত্তহরি দৃশ্যাবলী। আবার এ চোখের দৃষ্টি দিয়েই কুরআন ও কিতাব পড়ি। এ চোখের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে রাজা-প্রজা এক কাতারে সেজদা করছে,একসাথে কাবা তাওয়াফ করছে, ধর্ম-কর্ম পালন করছে। মানব সৃষ্টির রহস্যই মানুষকে এক করে দেয়। কোটি কোটি মানুষ অথচ ভিন্ন ভিন্ন দেহের গঠন, কণ্ঠস্বর, চেহারা, অন্তঃকরণ, মানুষের চোখ, জিহবা, নাক, কান, ত্বক, লিভার, কিডনি সর্বোপরি মস্তিষ্ক ও হার্টের নৈপুণ্য ও কার্যকারিতা সত্যিই কি চিন্তার বিষয় নয়? আল্লাহ বলেনঃ (إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا)অর্থ-'আমি তো মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছি। মিলিত শুক্র বিন্দু হতে এবং তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি'। যখন দেখি সব কিছু বেষ্টন করেও সূর্য রশ্মি ভিন্ন, আলাদা সূর্যের অস্তিত্ব তখন কি চিন্তা না করে পারা যায়? আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও আলাদা রয়েছে

---

* ছাত্র, ৬ষ্ঠ সেমিষ্টার

তাঁর অস্তিত্ব। একটি ফুলের বাইরের সৌন্দর্য চোখ জুড়ায় বটে কিন্তু ভেতরের কাঠমো অবশ্যই জ্ঞানীদের চিন্তায় অস্থির করে তোলে, মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চোখের দৃষ্টি বিবেক বোধকে নাড়া দেয়, যখন দেখি পানি বাষ্প হয়ে মেঘে পরিণত হয়, মেঘ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে ধরায় নামে এবং নদী হয়ে সাগরে মিলায়। মাটি কত চমৎকারভাবে স্তরে স্তরে পানি ধরে রাখছে। দুর্বা ও গাছপালা গজাচ্ছে। বাতাস অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আকাশে সুশোভিত গ্রহ-নক্ষত্র বিরাজ করছে, সূর্য ও চন্দ্র কত সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করছে, পৃথিবী নামক দোলনায় পাহাড় ও পর্বতগুলো পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করছে। খুঁটি ছাড়াই নক্ষত্র-গ্রহ ঝুলছে। ফ্রান্সিস বেকন যথার্থই বলেন: যারা মাটি থেকে দুর্বা গজানো কিংবা আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরার মত স্রষ্টার অলৌকিকত্ব অনুধাবন করতে পারে না, স্রষ্টা তাঁদের সৎ পথে আনার জন্য অন্য কোন অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেন না।

মানুষের প্রাণের কি কোন রূপ আছে? বাতাসের কি কোন নির্দিষ্ট আকার আছে? মানুষের এত সুন্দর দেহ শিল্পে মরণ হানা দেয় কেন? আগুন নিভে কোথায় যায়? পাখিরা বহুদূর পথ অতিক্রম করেও আবার আবাসস্থলে ফিরে আসে কার দিক নির্দেশনায়? দিবস মিলাচ্ছে রাতে, রাত্রি মিলাচ্ছে দিবসের মধ্যে কার ইঙ্গিতে? এসব বিষয় অবশ্যই চিন্তাশীলদের ভাবিয়ে তোলে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ الشَّمسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرات بِاَمْرِه إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيات لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ) অর্থ- 'তোমাদের জন্য আল্লাহ অধীনস্থ করেছেন রাত্রি ও দিবসকে, সূর্য ও চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজি তার হুকুমের অধীন, নিশ্চয় তোমাদের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা জ্ঞানী'।

এই পৃথিবীর গাছপালা, জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বত সব কিছু স্রষ্টাকে সেজদা করছে, মহান আল্লাহর তসবি পড়ছে। কোকিল মধুর স্বরে আল্লাহু আল্লাহু ডাকছে, মৌমাছি গুনগুন করে আল্লাহ পাকের তসবি পড়ছে। কেউ বসে নেই, সবাই ইবাদতে মশগুল, আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত। শুধু আমরা মানুষ অযথা সময় নষ্ট করছি। আল্লাহকে চিনতে ভুল করছি, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِيْ السَّموات وَمَنْ فِيْ الأَرْضِ والشَّمْسُ وَالْقَمَرُ والنُّجُوْمُ والْجِبَالُ والشَّجَرُ والدَّوابُ) অর্থঃ তুমি কি দেখনা আল্লাহকে সিজদা করে, যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু।

আসমান-জমিনের এতসব সৌন্দর্য, অলৌকিকত্ব, মানুষের অন্তঃকরণের রঙিন চোখের পর্দায় অবশ্যই ধরা পড়ার কথা। যদি সে অন্ধ না হয়, মানুষ তার বোধশক্তি মেধাকে কাজে না লাগালে এ নিয়ে চিন্তা বা গবেষণা না করলে, মহান শিল্পীর সৃষ্টিকে বাইরের চোখ ও মনের চোখ কোনো চোখেই বড় করে দেখবে না। স্রষ্টার অস্তিত্বের কোটি কোটি প্রমাণই তার কাছে শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

চোখের দৃষ্টিকে সঠিকভাবে পরিচালিত না করলে মানুষের কলব ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে অবস্থান করে। অসভ্য, বর্বর, নীতিহীন, দূর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থপর ও বিবেকহীন হয়ে বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত হয়। দৃষ্টিশক্তি আল্লাহর পরম নিয়ামত। আসুন দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্রষ্টার অফুরন্ত জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করি। স্রষ্টার সৃষ্টিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করি। বাইরের চোখের দৃষ্টিতে আর মনের চোখের দৃষ্টিতে একাকার হয়ে ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি করি এবং আমলে সালেহ'র হাত প্রসারিত করি। তবেই আল্লাহর খাঁটি প্রেমিকের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি সৎ কাজ হবে ইবাদত। চোখের দৃষ্টি দিয়ে তার সৃষ্টিকে দেখি মনের দৃষ্টি দিয়ে সর্বত্র বিরাজমান স্রষ্টাকে দেখি, তাঁর কৃতজ্ঞতা সর্বদা প্রকাশ করি। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ)

অর্থঃ তিনি তোমাদিগকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তঃকরণ যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

দি হান্ড্রেড বনাম স্যাটানিক ভার্সেস: প্রাসঙ্গিক কথা

মুবিনুর রহমান*

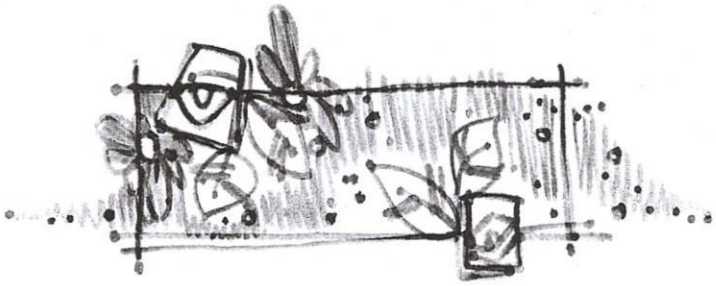

১৯৭৮ সালের শেষের দিকে আমেরিকা'র একজন খ্যাতিমান লেখকের লেখা একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই এর নাম "দি হান্ড্রেড"। লেখক মাইকেল এইচ হার্ট। জাতে একজন খ্রীস্টান। এইচ হার্ট একদল লেখক আর গবেষক দিয়ে পৃথিবীর একশত শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে এ বইটি লিখেন। তিনি মুহাম্মদ (স:) কে শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠ হিসেবে এক নম্বরে স্থান দেন। একশত মনীষীদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ (স:)কে বাছাই করে পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের সামনে স্বীকৃতি দেন । তার ভাষায়- He is the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels'' **পৃথিবীর ইতিহাসে জাগতিক ও ধর্মীয়-উভয় জীবনে মুহাম্মদ-ই একমাত্র সফল ব্যক্তিত্ব**"। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় "দি হান্ড্রেড"। প্রকাশের সাথে সাথে সপ্তাহ'র মধ্যে হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মদ (স:) এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিই অল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, এইচ হার্টের "দি হান্ড্রেড" তাদেরকে শক্ত আঘাতে জর্জরিত করেছিল। ঈর্ষা কাতর ইহুদি-খ্রীস্টান মহল মাইকেল এইচ হার্টের ধাক্কা হজম করতে পারে নি। "দি হান্ড্রেড" তাদের সামনে দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল। তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, এইচ হার্ট এবং তার লেখক-গবেষক সবাই ইহুদি - খ্রীস্টান হয়ে ও মুহাম্মদকে এক নম্বরে জায়গা দিল, আর ঈসা'র জায়গা মিলল তিনে , মুসা'র জায়গা ষোলতে। ইহুদি - খ্রীস্টানদের অশুভ চক্র ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে পারল না- যেমন পারে নি অতীতে ও। তারা মাইকেল এইচ হার্টের "দি হান্ড্রেড" এর জবাব দেয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হল। ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে "দি হান্ড্রেড" এর জবাব স্বরূপ বিশ্বনবী মুহাম্মদ(স:) এবং মুসলমানদেরকে গালি দিয়ে বই লেখার পরিকল্পনা হাতে নেয় তারা। এক্ষেত্রে "কইয়ের তেলে কই ভাজা" নীতি অবলম্বন করে। তারা মুসলমানদেরকে গালি দেয়ার জন্য মুসলমান নামধারী নিকৃষ্ট এক মুরতাদকে অর্থের বিনিময়ে যোগাড় করে নেয়। নিকৃষ্ট, ধিকৃত এই মুরতাদ-ই সালমান রুশদি। তার জন্ম ভারতের মুম্বাইয়ে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বৃটেনের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে সে। তখন থেকেই তাকে শিকার করা হয়। ইহুদি-খ্রীস্টান চক্র তার পেছনে নষ্টা ক্লারিসসা লুয়াডা নামক এক নারী শিকারীকে লেলিয়ে দেয়। নির্দিষ্ট লক্ষ হাসিল-উত্তর রুশদি'র ঔরশজাত সন্তান রেখেই কেটে পড়ে সে। যাবার সময় আরেক শিকারির "ইন" হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে যায়। মার্কিন লেখিকা মারিয়ান উইগিনস এর আগমন ঘটে তখন। মারিয়ান ছিল একজন ভাল লেখিকা, তার লিখিত "জন ডলার" বিশ্বের পনেরটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সর্ব প্রথম সালমান রুশদি'র সাথে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে তার কথা হয়। তারপর দেখা-সাক্ষাত, লিভ টুগেদার। বিয়ের এক বছর পূর্ব থেকে তারা একত্রে থাকা শুরু করে। মারিয়ানের অনুপ্রেরণায় সালমান রুশদি স্যাটানিক ভার্সেস লিখতে থাকে। তার "জন ডলার" লেখা ও শুরু হয় এক সাথে। অল্প সময়ের মধ্যেই মারিয়ানের "সালমান-রুশদি অপারেশন" সফল হয়। ইহুদি -খ্রীস্টান দুষ্ট চক্রের ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও বাস্তবায়িত হয়। তাদের দশ বছরের পরিকল্পনার ফসল "স্যাটানিক ভার্সেস"

---

* ছাত্র ৬ষ্ঠ সেমিস্টার

লেখা সমাপ্ত হয়। "স্যাটানিক ভার্সেস" ১৯৮৮ সালে যুক্তরাজ্য থেকে , আর ১৯৮৯ সালে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়। ব্রিটেন সরকার তার এ জঘন্য কাজের স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কলম ধরার বদলা হিসেবে ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার (বুকার) দেয়া হয় রুশদিকে!। সাথে "নাইট" উপাধিও!। মাইকেল এইচ হার্টের "দি হান্ড্রেড" এর জবাব হিসেবে ইসলামের চিরদুশমনরা সালমান রুশদি'র মাধ্যমে "স্যাটানিক ভার্সেস" লিখিয়ে নেয়। মাইকেল এইচ হার্ট তার গ্রন্থে মুহাম্মদ (সঃ) কে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর সালমান রুশদি মুহাম্মদ (সঃ) কে কোন স্থানই না দিয়ে অপমান করেছেন। সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে ইসলাম, রাসুল (সঃ), জিব্রাঈল (আঃ) সম্পর্কে বিষোদগার করেছে সে। বিনিময়ে সে পেয়েছে দু'জন নারী আর বিরাট অংকের অর্থ। এসব কিছুর পরেও তার শান্তি নাই। ১৯৮৯ সালে ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন, "যে সালমান রুশদিকে হত্যা করতে পারবে তাকে বিপুল অর্থে পুরস্কৃত করা হবে"। খোমেনির দেয়া হত্যার ঘোষণায় রুশদি এখনও ভয়ে দিন কাটায়। ব্রিটেন সরকার তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করে যাচ্ছে। সম্প্রতি দেয়া বক্তব্যে সালমান রুশদির সেই ভীতি ধরা পড়ে, তার ভাষায়: "খোমেনীর দেয়া সেই হত্যার ফতোয়া এখনও আমার গলার ফাঁস হয়ে আছে"। এভাবেই মানবতার দুশমনরা শান্তির ধর্মের সাথে সংঘাত চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আল্লাহর শ্বাশত দীনকে আজ সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত করছে। তারা বিশ্বের মানুষের কাছে এটা প্রমাণ করতে চায় যে, ইসলাম শান্তি চায় না-সন্ত্রাস চায়। আল্লাহর দুশমনেরা আজ তার দ্বীনের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা সত্যকে মুছে দিতে চায় চিরতরে। তাদের হয়তো জানা নেই যে, যেদিন সত্য পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে সেদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব ও বিলীন হয়ে যাবে। মিথ্যাকে সত্যের লেবাস পরিয়ে যাচ্ছে তারা। আজকের ইহুদি-খ্রীস্টান চক্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মুসলমানদের সাথে ক্রুসেডের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। "শান্তির জন্যে যুদ্ধ" নামে ইতিমধ্যে আফগানিস্তান আর ইরাককে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। লাখ লাখ মুসলমানকে জীবন দিতে হয়েছে আফগানিস্তানে, ইরাকে, ফিলিস্তিনে। পৃথিবীব্যাপী নব্য ক্রুসেডদের হত্যার নৃত্য এখনো চলছে। বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদি-খ্রীস্টানরা পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহায়তায় সন্ত্রাসী ইসরাইল নির্বিচারে নিরীহ ফিলিস্তিনিদেরকে দুনিয়াবাসীর চোখের সামনে হত্যা করে যাচ্ছে দিনে দুপুরে। তারা আজ মুসলমানদের রক্তের নেশায় মত্ত। তারা ইসলাম এবং মুসলমানকে আক্রমন এবং ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য বস্তু বানিয়েছে। তাদের এক নম্বর শত্রু ইসলাম। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ প্রফেসর শ্যামুয়েল হান্টিংটনের ভাষায়: The Underlying problem for the west is not islamic fundamentalism, it is islam...." **ইসলামী মৌলবাদ নয়, পাশ্চাত্যের প্রধান সমস্যা ইসলাম নিজেই"**। তারা জঙ্গিবাদ আর মৌলবাদ উৎখাতের নামে ইসলাম উৎখাতে নেমে পড়েছে। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে দিনে-রাতে ষড়যন্ত্র আর মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া নামক দৈত্যের মাধ্যমে। ইসলামকে ধ্বংস করতে তারা মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তা কি সম্ভব ? আল্লাহ নিজেই ঘোষাণা দিয়েছেন: (يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفُؤُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ واللهُ مُتِمُّ نُوْرِه وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ) "তারা মুখের ফুতকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণ করবেনই যদিও অস্বীকারকারীরা এটি অপছন্দ করে"। তাইতো ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হচ্ছে পৃথিবীজুড়ে। খোদ পশ্চিমা জগতেই ইসলামের বিজয়ের আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে। ইসলাম আজ অধিকার হারাদের শান্তির ঠিকানা। পাশ্চাত্যের নারীরাই পুরুষের তুলনায় অধিক হারে ইসলাম গ্রহণ করছে। ইসলামের মাঝেই তারা অধিকার আর নিরাপত্তা খুঁজে পায়। ইসলামের বিরুদ্ধে হাজারো ষড়যন্ত্র করেও ব্যর্থ হচ্ছে ফেরাউনের সঙ্গীরা। ষড়যন্ত্র আর অপপ্রচারের বেড়াজাল ছিন্ন করে পৃথিবীর দিকে দিকে ইসলামের শান্তির পয়গাম পৌঁছে যাচ্ছে। শয়তান তার শত চক্রান্ত করেও ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ঠেকাতে পারছে না। এক সাইয়েদ কুতুবের পরে আরেক সাইয়েদ কুতবের আবির্ভাব হচ্ছে। দিদাদের পরে আরেক দিদাদ এসে হাজির হচ্ছে। সালমান রুশদি'র মত হাজারো কুলাঙ্গার ভাড়া করেও ইসলামের ক্ষতি করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছে। জাহেলিয়াতের দুর্ভেধ্য প্রাচীর ভেদ করে জাকির নায়েকের মত মানুষ সত্যের পয়গাম পৌছে দিচ্ছে বনি আদমের কর্ণকূহরে। সালমান রুশদি আর শ্যামূয়েল হান্টিংটন কুলাঙ্গারদের ব্যর্থ ফুৎকারে সত্যের আলো নিভে যাওয়ার তো প্রশ্নই উঠেনা। ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যদের (?) জেনে রাখা উচিত যে. তামাম দুনিয়ার লাখো কোটি শয়তানের চেলা লেলিয়ে দিয়ে ও যদি আল্লাহর দ্বীনকে মুছে ফেলতে চাও- পারবে না। তোমাদের ফন্দি-ষড়যন্ত্রের চুড়ান্ত পরিণতির মাধ্যমেই প্রমাণিত হবে- ইসলামকে যারা ধ্বংস করতে চায় তারাই ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যায়।

ধিক! শ্যমুয়েল হান্টিংটন, সালমান রুশদি ও বিশ্ব শয়তান ভ্রষ্ট খ্রীস্টান-ইহুদি।

পলাশীর ট্রাজেডী ঃ আমাদের জন্য একটি শিক্ষা

মোঃ ফখরুল্লাহ*

প্রতি বছরের মতো এ বছর আমাদের দেশে পালন করা হল পলাশী দিবসটি। গত ২৩ জুন ছিল এ ঐতিহাসিক পলাশী দিবস। ১৭৫৭ সনের এই দিনে নদীয়া জেলার পলাশীতে বিশ্বাসঘাতক সিপাহ্সালার মীর জাফর, সেনাপতি রায় দুর্লভ এবং এয়ার লুৎফে খাঁ এর ষড়যন্ত্রে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের মাত্র ৩২০০ সৈন্যের সাথে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার সুদক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি যুদ্ধ খেলায় পরাজয় বরণের মধ্য দিয়ে পতন হয় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার। সেই দিন বাংলার স্বাধীন সূর্য পলাশীর আম্র-কাননে অস্তমিত হয়, এবং উপমহাদেশে দুইশত বছরের জন্য ইংরেজ শাসন কায়েম হয়। পলাশীর এই ইতিহাস উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য এক মহাসতর্ক বাণী। প্রতি বছর পলাশী দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রুর ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতার লোভে কীভাবে একটি সমৃদ্ধশালী স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা দুইশত বছরের জন্য গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে শিক্ষিত, সবচেয়ে বিত্তশালী বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী কীভাবে ভিখারীর জাতিতে পরিণত হয়েছিল, এবং কীভাবে ভারত বর্ষ থেকে পাঁচশত পঞ্চাশ বছরের মুসলিম শাসন উৎখাত করা হয়েছিল ! পলাশী দিবসের ঘটনা বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সেই দিন পলাশীতে সিরাজের পতন না হলে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব সম্ভব হতো না, এবং বৃটিশ সম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীব্যাপী তাদের হিংস্র থাবা এক সঙ্গে করতে সক্ষম হতো না। তুর্কি সাম্রাজ্যেরও এমন শোচনীয় পতন হতো না। আরব উপদ্বীপে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদারী কায়েম হতো না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, পলাশীতে সিরাজের পতন না হলে ভারত বর্ষে দু'শত বছরের ইংরেজ শাসনের সূচনা হতো না, এবং ভারত বর্ষকে পরাধীনতার গ্লানি সইতে হতো না। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য তো বটেই, বিশ্ব মুসলমানদের জন্যও একটি শিক্ষনীয় বিষয়ের সূচনা করে গেছে। প্রতিবছর পলাশী দিবস আমাদের আত্নসচেতন হওয়ার আহ্বান করে। আমাদের বিবেককে জাগ্রত করে এবং সাবধানের বাণী হয়ে আগামী দিনের সঠিক পথ চলার নির্দেশনা দেয়। পলাশী আমাদের জানিয়ে দেয় দেশের ভিতরের শত্রু, বাহিরের শত্রু হতে দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক বেশি হুমকি স্বরূপ। সকল ষড়যন্ত্রকারী স্বাধীনতার ঘাতক। তাই আমাদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকারী থেকে সজাগ থাকতে হবে। পলাশীর ঘটনা একদিকে আমাদের দেশপ্রেম শিক্ষা দেয়, আবার অন্যদিকে তেমনি বিশ্বাস ঘাতকদের প্রকৃত রূপ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। সেই দিন যেভাবে সিরাজউদ্দৌলার সাথে বিশ্বাস ঘাতক মীর জাফর, রায় দুর্লভেরা ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সিরাজের পতন ত্বরান্বিত করেছিল, আজও সেই সম্ভাবনা দূর হয়ে নি। আজ কিন্তু তারা নেই। আছে তাদের নাতী-নাতনীরা, যারা এই দেশের পরিচয় দিতে পর্যন্ত ঘৃণা বোধ করে। তারা এখন বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে কলঙ্কিত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এবং অত্যন্ত কৌশলগত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশীয় রাজনীতিতে বিদেশী শক্তির আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দেশের সার্বভৌমত্বকে অন্যের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছে এবং যারা এই জাতিকে শ্রম, মেধা, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে চালাচ্ছে একের পর এক অপপ্রচার। আর যারা এই দেশের মানুষের দুর্দিনে মানুষকে ঘৃণা করে চলে গেছে অন্য দেশে, তাদের ভাস্কর্য স্থাপন করে এই দেশের ইসলাম প্রিয় মানুষের ঈমানের উপর আঘাত হানার চেষ্টা করছে। তাদের এই ষড়যন্ত্র কোন দিন সফল হবে না। কেন না, এই দেশের তাওহীদী জনগণ তাদের সকল শক্তি দিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ও সকল প্রকার বিদেশী ষড়যন্ত্রের ঘাতক থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করবে। আর এই জন্য আমাদেরকে সত্যানুসন্ধান করে পলাশীর সঠিক ইতিহাস জানতে হবে। পলাশীর ইতিহাস থেকে আমরা যদি সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে সামনে আর কোন সিরাজের শহীদ হতে হবে না, এবং আমাদেরকে আর কোন দিন পরাধীনতার শিকল পরতে হবে না। স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান সম্পদ আর কিছু হতে পারে না। যা আমরা পেয়েছি দীর্ঘ সংগ্রামের বিনিময়ে। আজ থেকে আমাদের শপথ করতে হবে, যে কোন মূল্যে আমরা আমাদের এই স্বাধীনতা রক্ষা করব। এবং সকলপ্রকার ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করব। পলাশীর দিবসে আমাদের দেশপ্রেম আরো উজ্জীবিত হোক, মহান করুণাময়ের নিকট এ প্রার্থনাই করি।

---

* ছাত্র, ৫ম সেমিষ্টার

তাহাজ্জুদ ঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের সোপান

মোঃ আবদুর রহিম*

তাহাজ্জুদ শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে হৃদয়ের গভীরে জেগে উঠে পবিত্রতার আমেজ, আত্মসমর্পিত চৈতন্যের ভাব-ধারা এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পিপাসায় উন্মুখ একটা চিত্র। যখন অজস্র মিথ্যার নশ্বর-মুখীতায় বিক্ষুব্ধ হৃদয়টি অলৌকিক আনন্দ ও চির-সজীব সত্যের পরশ পেতে হৃদয়টা কাতর হয়ে উঠে, যখন সকল ক্ষুদ্রতা, মলিনতা সকল বিরুদ্ধ সয়লাব মোকাবেলায় নবতর উদ্যম জীবন শক্তির সরবত পান করতে অস্তির হয়ে উঠে, তখনই একজন মু'মীন রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে জেগে উঠেন। দাঁড়িয়ে যান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে দুনিয়াবী সকল বিভ্রান্তি থেকে নিজেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাহাজ্জুদ নামাযেই খুঁজে পান প্রশান্তির অগাধ ছায়া।

কেউ যদি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করতে চান, যিনি আল্লাহর পথে টিকে থাকতে চান অটল পাহাড়ের মত, দ্বীনের পথে ছুটে চলতে চান নদীর মত গতিশীলতায়, তার অপরিহার্য একটা করণীয় দিক হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামাজ। যারাই আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে বেচে নিয়েছে, আল্লাহর সান্নিধ্যকে মনে করেন জীবনের পরম পাওয়া, তাদের তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় আবশ্যক করে নিতে হবে। মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা বলেনঃ (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مكاما محمودا **অর্থাৎঃ** 'রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ পড়ুন। এটা আপনার জন্য নফল, শীঘ্রই আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌছে দিবেন।' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াতঃ ৭৯) আল্লাহতায়ালা আরো বলেন : [والذين يبيتون لربهم سجّدا وقياما ،والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم]

অর্থাৎঃ যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ও সিজদাবনত হয়ে রাত্রি জাগরণ করে এবং তারা বলে হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর।

তাহাজ্জুদের অর্থ ও তাৎপর্যঃ

তাহাজ্জুদ শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও নিদ্রা ত্যাগ এই পরস্পর বিরোধী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরিয়তের পরিভাষায় রাত্রি জেগে নামাযকে সালাতে তাহাজ্জুদ বলা হয়। সুরায়ে মুয্যাম্মিলে সালাতে তাহাজ্জুদের ভাবার্থ প্রকাশ করার জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে, রাতে নিদ্রা ত্যাগ করে নামাজের জন্য দন্ডায়মান হওয়া। সালাতে তাহাজ্জুদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তখন, যখন ইসলামের একেবারে প্রাথমিক সময়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও তখন ফরজ হয় নি। ইসলামের নবোদিত সূর্যালোকে বিমুগ্ধ হয়ে যে সমস্ত সন্ধানী মানুষ সত্যে মিশে গেলেন, আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন রাত্রিতে দাঁড়িয়ে (নামাজ) যাও। নির্দেশ দিলেন করুণা ও অনুগ্রহের সাথে। কর্মক্লান্ত আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে সারা মক্কা চষে বেড়িয়েছেন। উত্তপ্ত বাতাস চিরে চিরে, এরই মধ্যে কারো উপর দিয়ে হয়তো বয়ে গেছে কাফেরদের প্রচন্ড গালাগালি ও নির্যাতনের তুফান। রাতের অন্ধকারের সাথে নেমে এসেছে গা ছমছম করা আতংক। হন্য হয়ে উঠেছে ইসলামের শত্রুরা। খুঁজছে দুইজন মুসলমান কোথায় জড়ো হয়, কোথায় দাওয়াত দেয় কিংবা কোথায় নামাজে দাঁড়ায়। এতই কোলাহল, এতই কঠোরতা কিন্তু কি দুর্বিনীত সাহাবায়ে কেরামের মানসিকতা সবাই দাঁড়িয়ে গেছেন সালাতে তাহাজ্জুদে। বিনম্র হৃদয়ে সুললিত উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত করেছেন। বুঁদ হয়ে আছেন রহস্যের মাদকতায়, অজানা আনন্দে। কখনো প্রত্যাশায় দুলছেন আয়াতের অন্তর্নিহিত ইশারা পেয়ে। প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে, ফুলে গেছে রাসূলে করিম (সাঃ) এর পা এমন কি সাহাবায়ে কিরামদের পাও। কিন্তু তারা সালাত মগ্ন আছেনই। কখনো সেজদায়, কখনো রুকুতে।

---

* ছাত্র, ৫ম সেমিষ্টার

পবিত্র কুরআনে সালাতুত তাহাজ্জুদঃ

পবিত্র কুরআনে নিত্যকার ফরয ইবাদতের সাথে সাথে সালাতুত তাহাজ্জুদকে অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদের কাছ থেকে সালাতে তাহাজ্জুদের জন্য রাতের একাংশ সময় চেয়েছেন। আল্লাহর নৈকট্য-প্রার্থীরা স্বীয় প্রত্যাশার আলোকে এই সময়দানের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। তবে ঈমানী জিন্দেগীর পথে অসৎ নফস প্রদানে এটা প্রতিবন্ধক। হক্বের এক সৈনিকের পথে প্রথম বাধা এই নফস। মু'মীনকে প্রথমেই আঘাত করতে হয় এই নফসের উপর। নফসকে দমিত ও দলিত করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটা ব্যবস্থা হলো তাহাজ্জুদ নামায। আল্লাহর স্মরণে একনিষ্ঠভাবে নিবিষ্টতার জন্য সব চেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে নিস্তব্ধ রাত এবং এই সময় আল্লাহর স্মরনে একান্ত নিমগ্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। 'দিনের বেলা তোমার রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে যিকির কর এবং একনিষ্টভাবে তাতে মগ্ন হও।'

হযরত বেলাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'এমন কে আছে, যে এই ঘরসমুহের লোকজনকে জাগিয়ে দেবে? ওহে শোন, দুনিয়ার কত বস্ত্র পরিহিতা আখেরাতে হয়ে যাবে বিবস্ত্র।' প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন, "তোমরা রাত্রি জাগরণ কর কেন না এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক বান্দাদের অভ্যাস ছিল। এটা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্যে পৌঁছে দেবে। তোমাদের গুনাহ মাপের উপায়, পাপ থেকে দূরে রাখার মাধ্যম এবং শরীরের রোগ দূরকারী।" আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিরা দেয়। প্রতিটি গিরায় সে এই বলে চাপড়ায় তোমার সামনে আছে দীর্ঘতম রাত এবং অনেক সময়। অতএব তুমি ঘুমিয়ে থাক। অতঃপর সে জেগে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করলে একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর ওযু করলে আরেকটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর নামাজ পড়লে শেষ গিরাটিও খুলে যায়। যিনি নিজে তাহাজ্জুদ গোযার এবং স্বীয় সাথীকেও তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে তোলেন, তার জন্য রয়েছে প্রিয় নবীর (সাঃ) দোয়া-কল্যাণ কামনা। রাসুল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাত জেগে নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়, জাগ্রত হতে না চাইলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়, আল্লাহ যেন তাকে তার অনুগ্রহে ধন্য করেন। শারীরিক কোন অসুস্থতার কারণে প্রিয় নবী (সাঃ) কখনো এ নামায পড়তে না পারলেও পরবর্তী দিবসে বার রাকাত নামাজ পড়তেন। অনেক সময় দেখা যেত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পা দু'টি ফুলে উঠত। তখন তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বলতে লাগলেন, ইয়া রাসুল্লাহ (সাঃ), আপনি কি ঘুমাবেন না? তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রিয়তমা আয়েশা, ঘুমের দিন শেষ হয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম ও রাসুল (সাঃ) এর আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে দিনের বেলায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য ঘোড়ায় চড়ে এদিক সেদিক ছুটতেন। আর রাতের বেলায় এসে জায়নামাযে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেন। এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে সাহায্য আসত। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আরো বলেন, প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে মহান আল্লাহ নিকটতম আসমানে আসেন এবং ডেকে বলেন, কে আছে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কী বিস্ময়কর আহ্বান! ক্ষমা লাভের জন্য পাপীকে আহ্বান করা হয়। মনোস্কামনা পূরণ করে দেয়া হবে এ জন্য ডাকা হয় প্রত্যাশীদের। ডাকেন তিনি, যিনি ছাড়া ক্ষমাকারী নেই অন্য কেউ। যিনি ছাড়া স্বপ্নপূরণকারী অন্য আর কেউ নেই। প্রত্যহ একটু মাত্র নিদ্রা ত্যাগ, জাগরণ আর একটু মাত্র প্রার্থনা তাতেই সকল কিছু দান ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেন মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন। যে সকল মানুষ এতে পূর্ণ আস্থাশীল, তাদের অস্থিরতা নেই, নানা আস্থার ছুটাছুটি নেই। রাতের গভীরে আল্লাহর কাছে তারা সঁপে দেন সকল হাজাত। তারপর চোখে মুখে নেমে আসে স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

শেষ কথাঃ

পরিশেষে বলা যায় যে, তাহাজ্জুদ নামায বড়ই ফজিলতের নামায। তাই যে ব্যক্তি এই নামায রীতিমত পড়ে তার মত ভাগ্যবান বান্দা-বান্দী পৃথিবীতে আর কারা হতে পারে? তাইতো হাদীস শরীফে আছে, তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারী মৃত ব্যক্তির কবর অন্যান্য কবর হতে সতের গজ প্রশস্ত এবং আশাতীতভাবে আলোকিত থাকবে। সুতরাং; সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা! আসুন, আমরা সকলে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাহাজ্জুদ নামাজকে একটি বড় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিই। মহান রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের সকলকে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার তৌফীক দেন, আমিন! ছুম্মা আমিন।

CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, CTG
Acc. No: D-708
Date:

তারুণ্যের সংকটময় পথ

আবুল কালাম আজাদ*

বস্তুগত কারণ ঃ

জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম একবার মুসলিম তরুণদের সভায় আমন্ত্রিত হয়ে তারুণ্যের জয়গাণ নিয়ে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন ঃ "তরুণরা বিশ্বজনীন শক্তি। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানরা এই তরুণ শক্তি ও যৌবন সম্পদে দরিদ্র। যদিও তাদের ধর্ম ইসলাম, কিন্তু তাদের প্রাণ- শক্তির যথার্থ পরিচয় হবে তারুণ্যের। এই তারুণ্যের দ্বারা দুঃখের তিমিরকুন্তলা নিশীথিনীর অবসান ঘটবে। স্নেহ, মায়া, প্রীতি, ভালবাসা এবং হৃদয়ে সুকুমার বৃত্তি ছড়িয়ে পড়বে। দূর হবে অপসংস্কৃতি, অন্যায় আর অবিচার।"

বস্তুবাদী-চিন্তাভাবনা, জড়বাদী ধ্যান-ধারণা আর চারদিকে বিষাক্ত নগ্ন-পরিবেশ, রুচি বিবর্জিত সমাজ, কুরুচির্পূণ চলচ্চিত্র, নাটক, অবৈধ-অশ্লীল ও অনৈসলামিক গান বর্তমান তরুণ সমাজকে বিপথগামী করছে সবচেয়ে বেশী। তথ্য প্রযুক্তির ইন্টারনেটে অবাধ যৌনাচার, মোবাইলের অপব্যবহার, টেলিভিশন, ডিশ এর নগ্ন-অর্ধনগ্ন-যৌনাবেগ সম্বলিত বিভিন্ন ছবি, অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকায় ম্যাগাজিনে অশ্লীল বিতর্কিত ছবি, মেয়েদের পোশাক কাট-ছাট ও উলঙ্গপনা ইত্যাদি যুব-তরুণ সমাজকে বিপথগামী করতে অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ফলে সে চরিত্র আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নেমে পড়ে ভিন্ন একটি পথে। এই অন্ধকার জগতটিই তারুণ্যের সংকটময় পথ। আর এ জন্য তরুণ যুব সমাজই কিন্তু আজ জাতির অভিশাপ, অন্ধকার পথের যাত্রী, নিথর কংকাল মূর্তি।

বংশগত ও পরিবেশগত কারণ ঃ

দর্শন শাস্ত্রের তথ্য অনুযায়ী এই তরুণ যুব সমাজের বিপথগামিতার কারণ দু'টি। প্রথমটি বংশগত, দ্বিতীয়টি পরিবেশগত। বংশগত ধারায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কতিপয় জাতি বিপথগামী হয়। বিষয়টি দুঃখজনক হলেও বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। রক্তের মধ্যে আদিমতা থাকলে তাকে কোন পরিবেশেই স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করা যাবে না। মানব প্রজন্মের এই ধারাবাহিকতা নিয়ে আজ তরুণ-যুব সমাজ স্বাভাবিক নিয়মেই বিপথগামী হয়েছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। একটি শিশু তার পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠে এবং এ পরিবেশটিই তার জীবনে ছাপ রাখে গভীরভাবে। মাতা-পিতার আচার ব্যবহার ছেলে-মেয়ের জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করে। পরিবারের আদলে তার মেজাজ গড়ে উঠে। বড় হবার সাথে সাথে সে সমাজ জীবনের অনেক কিছু দেখে, শিখে। সমাজ জীবনের অসুস্থ পরিবেশ, দেশের অসুস্থ রাজনীতি, বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, অপসংস্কৃতির অশুভ প্রভাব, সমাজের বাজে বন্ধুদের সাথে আড্ডা, চলফেরা ইত্যাদি পরিবেশের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে তরুণ-যুব সমাজ মনের অজান্তেই বিপথগামী হয়।

ধর্মীয় ও আদর্শগত কারণ ঃ

ইসলাম একটি সার্বজনীন বিশ্বময় কল্যাণ ও শান্তির ধর্ম। সর্বশ্রেণীর মানব জাতির মুক্তির মহান সোপান। আদর্শজাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। যার কাছে বা যে ঘরে ইসলামের শিক্ষা তথা কুরআনী শিক্ষা নেই, সেই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের তরুণ-যুব সমাজ বিপথগামী হতে বাধ্য। শুধু তরুণ-যুব সমাজ নয়, বরং সমস্ত জাতির মনে যদি ইসলামী আদর্শের বীজ বপন করা না যায়, সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, হৃদয় মনে ঈমান সুদৃঢ় করা না যায়, তাহলে নিশ্চয় মানব জাতি বিপথে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

শিক্ষার প্রাদুর্ভাব ঃ

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বইতে ধর্মীয় ও ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতিতে প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী, ছাত্রী-শিক্ষকদের অবাধ চলাফেরা ও মেলমেশার কারণে তরুণ যুব সমাজ বিপথগামী হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সুস্থ, সুন্দর আদর্শিক ও ইসলামী জ্ঞান না থাকার ফলে তাদের মন পাপ ও পরকালের ভয় বলতে গেলে একবারেই শূন্য। এই শূন্য থেকেই বর্তমান প্রজন্ম সর্বপ্রথম ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। গোপনে সংগোপনে অপরাধ সংঘটিত করতে দ্বিধা করে না।

---

* ৫ম সেমিস্টার

নৈতিক অবক্ষয় (Moral Degradation) ঃ

একটি নির্দিষ্ট বোধ বিশ্বাসের আলোকে নৈতিকতা গড়ে উঠে। আমাদের যুব সমাজ এই বোধ বিশ্বাসের সংকটে পতিত হচ্ছে। এদেশে আজ একটি প্রজন্ম গড়ে উঠছে যারা স্রষ্টা সম্বন্ধে বেখবর। আল্লাহকে মানা না মানার বিষয়টি তাদের কাছে খুবই গৌণ।

জীবনে ইহকালীন ও পরকালীন বিষয়টি তারা কখনোই বিবেচনায় আনে না, বরং তাদের কাছে ইহলোকই শুরু এবং ইহলোকই শেষ। পরলোক অবিবেচ্য বিষয়। ওদের দর্শন একটাই। "নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতা শূন্য থাক, দূরের বাদ্য শুনে কি লাভ মাঝখানে তার বেজায় ফাঁক।" "নিজে বাঁচলে বাপের নাম" এটা যাদের বোধ তাদের কাছ থেকে নীতি-নৈতিকতা কতটুকু আশা করা যায়? স্বার্থপরতা বা ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার ফলে তাদের কাছ থেকে সামাজিকতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা, দেশপ্রেম ও মানবিকতা ক্রমশঃ মন – মগজ থেকে শূন্য হয়ে তরুণ যুবক শ্রেণী হয়ে পড়েছে পশুতুল্য। "অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে ক্ষিপ্র গতিতে।"

মূল্যবোধের অবক্ষয় (Loss of values)

ইসলাম, খ্রীস্ট, ইহুদী বা হিন্দু ইত্যাদি ধর্ম মূলতঃ নৈতিকতার নিয়ামক। নৈতিকতার সাথে ধর্মবোধের নিগুঢ় সংযোগ রয়েছে। কিন্তু মূল্যবোধ ধর্মহীনও হতে পারে। মূল্যবোধ একটি সমাজ সভ্যতার অবদান। ধর্মহীনতা সমাজ সভ্যতা থেকে মূল্যবোধকে ঝেটিয়ে বিদায় করে। সে বিবেচনায় ধর্ম ও মূল্যবোধ পরস্পর নির্ভরশীল।

এই অবক্ষয় রাতারাতি আসেনি। এই বিপথগামিতার মেশিন একদিনের নয়। মুসলিম বিশ্বের যুবক-তরুণ শ্রেণীকে বিপথগামী করার পেছনে একটি দীর্ঘ মেয়াদী ষড়যন্ত্র চলে আসছে। এই লক্ষ্যে ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের সুপারিশ করেন, যেখানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুসলিম তরুণ-যুবকদের মন মগজ ধোলাই করার বীজ বপন প্রক্রিয়া শুরু করার ইঙ্গিত দেন। তিনি তার সুপারিশ মালার ভূমিকাতে লিখেন,

"We must at present do our best to form abass who may be interpreters between us and the millious who we governia class of persons Indians in blood and colour but English in taste in opinions, in morals and in intelleet."

অর্থাৎ, আমরা এমন একটি শ্রেণী তৈরী করবো যারা রক্তে ও রঙে হবে ভারতীয় কিন্তু মেজাজ, চিন্তা-চেতনা, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় হবে ইংরেজ।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, ধ্বংস তার জন্য, যার আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে উত্তম হল না। আজ তরুণ-যুবকদের এগিয়ে যাবার সময় এসেছে। সমগ্র বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর এই করুণ সংকটাপন্ন অবস্থায় হাল ধরতে হবে সত্যের উপর অটল অবিচল তরুণদের। যুবক-তরুণদের বুঝতে হবে কুরআন। আমল করতে হবে আন্তরিকতার সাথে। ছড়িয়ে দিতে হবে তার আলো। যারা সংকট ও অন্ধকার দূর করার জন্য আলোর বার্তা নিয়ে এসেছিল তাদের পথ অনুসরণ করতে পারলেই তারুণ্যের সংকটটি কেটে উঠা সম্ভব হবে।

আমার এই বার্তা কি তরুণ-যুবকদের কানে যাবে? হৃদয়তন্ত্রীতে পৌছবে ? যাদের জন্য সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র অপেক্ষা করছে। যাদের পদতলে বিজয়ের নিশান চুম্বন এঁকে দিবে। নুয়ে পড়বে সব শয়তানী ও বাতিল শক্তি?

নারীর অধ:পতন ও করণীয়

রহমত উল্লাহ্*

মহানবীর (সঃ) মুখ নিসৃত বাণী, الجنة تحت أقدام الأمهات অর্থাৎ, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত। ইসলাম মানুষকে নারীর মর্যাদা দানের প্রতি ব্যাপক নির্দেশ দিয়েছে। কবির ভাষায়- "কোন এক কালে একা হয়নি কো জয়ী / পুরুষের তরবারী / প্রেরণা দিয়াছে উৎসাহ দিয়াছে / বিজয়ে লক্ষ্মিনী নারী।"

বর্তমান সময়ে নারী সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রতিদিন নারীরা কোন না কোন কারণে খুন হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের দিকে তাকালে প্রতিদিন যে হারে নারী নির্যাতিত হচ্ছে তাতে মুসলিম সমাজে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছু নয়। নিম্নে নারী নির্যাতনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।

- ঝিনাইদহে গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যা, স্বামী গ্রেপ্তার - ৩০ জুলাই ২০০৯।
- সাতক্ষীরায় যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা - ২৯ জুলাই ২০০৯।
- যশোরে বখাটেদের উৎপাতে স্কুলে যেতে পারছেনা অনেক ছাত্রী - ২৯ জুলাই ২০০৯।
- পাবনায় স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন - ২৫ জুলাই ২০০৯।
- সৈয়দপুরে মা ও মেয়ে এসিড দগ্ধ - ২৫ জুলাই ২০০৯।
- স্ত্রীকে হত্যার পর যাত্রাবাড়ী থানায় স্বামীর আত্মসমর্পন - ২৩ জুলাই ২০০৯।
- সবুজ বাগে হাসপাতালে ঢুকে মহিলা ডাক্তারকে হত্যা, ঘাতক গ্রেপ্তার - ২৫ জুলাই ২০০৯। *(নয়া দিগন্ত)*

*মাত্র নয় দিনের কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এভাবে প্রতি দিন অসংখ্য নারী অকারণে নির্যাতিত হচ্ছে, যা আইয়্যামে জাহেলিয়ার যুগকেও হার মানায়। যৌতুকের জন্য প্রতিদিন প্রাণ হারায় অসংখ্য নীরিহ নারী। সামান্য কলহের জের ধরে হত্যা করা হয় অনেক নারীকে। ইসলাম নারী সমাজকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। তাদেরকে বাবার সম্পদ ও স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছে। স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কাছে মর্যাদার আসনে স্থাপন করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে নারীরা যেভাবে অপমানিত, লাঞ্চিত, খুন-হত্যার মতো জঘন্য অত্যাচার তাদের উপর চালানো হয়, তাতে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। তবে এর পেছনে তাদেরও কিছু দোষ রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো ঃ ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে, আবার তার সাথে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু তারা তা পালন না করার কারণে আজ অপমানিত ও লাঞ্চিত হচ্ছে। তারা যদি সমাজে অবাধে চলা-ফেরা না করে সব সময় পর্দা পরে চলা-ফেরা করে, পাশ্চাত্যের পোশাক পরিহার করে ইসলামী অবকাঠামো অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাহলে তারা আর অপমানিত, নির্যাতিত ও লাঞ্চিত হবে না। শিক্ষাঙ্গনে সহশিক্ষা বাদ দিয়ে আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে নারীরা আর লাঞ্চিত হবে না। হাদীসে আছেঃ (طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة) প্রত্যেক নর-নারীর উপর শিক্ষা গ্রহণ করা ফরজ। নারীকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রেখে কোন জাতির উন্নতির কল্পনা করা অসম্ভব। তাই তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। কবির ভাষায়, "সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে।"

নারী যদি গুণী হয়, তাহলে সেই সংসারে সুখ বিরাজ করে। আর যদি নারীর স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়, আচার-আচরণ, চাল-চলন ব্যবহার শালিনতাপূর্ণ না হয়, তাহলে ঐ সংসারে সবসময় কলহ জের লেগে থাকবে।

তাই নারী সমাজের উচিত সবসময় স্বামীর খেদমত করা, তাঁর কথা মতো চলা, শশুর-শাশুড়ীর কথা মানা, তাহলে সংসারে সুখ বিরাজ করবে। আর স্বামীদের উচিত যৌতুক নামক হারাম খাওয়া থেকে দূরে থাকা। যার দরুণ প্রতি বছর হাজার হাজার নারী নির্যাতিত হচ্ছে, মা হারা হচ্ছে অনেক সন্তান; ভবিষ্যত অন্ধকার হচ্ছে তাদের। তাই প্রত্যেকের উচিত, নারীর প্রতি মর্যাদাশীল হওয়া, নারীকে সম্মানের চোখে দেখা। যৌতুক বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি করা। তাহলে আমরা জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো।

---

* ছাত্র, ৫ম সেমিস্টার

আল কুরআনে বৈজ্ঞানিক দিক নির্দেশনা

মোঃ এরশাদুর রহমান*

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর বংশধরদের জন্য এই মর্মে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে,

(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم) [البقرة: ١٢٩]

"হে প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করবেন। তাদেরকে কিতাব এবং কৌশল শিক্ষা দেবেন, এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" যখন নির্যাতিত-নিপিড়ীত মানুষের আহাজারিতে পৃথিবী ভারাক্রান্ত, অজ্ঞতার অমানিশায় এই বিশ্বালোক আচ্ছন্ন, অর্থ পিশাচ পুরোহিতদের মুখরোচক বাণীতে ঐশী জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায়, তখন আল্লাহ্ তাআলা ইব্রাহীমের (আঃ) উল্লেখিত প্রার্থনা কবুল করে মানব জাতির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার মহাগ্রন্থ আল কুরআন সমেত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। নবী (সঃ) এই আল কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত করেন। নবীর (সঃ) উপর অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল কুরআন উর্ধ্বসত্তা ও উর্ধ্বশক্তির পক্ষ থেকে প্রেরিত শ্বাশত বিজ্ঞানময় ও চিরদীপ্তিময় আলোকবর্তিকা। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরআনকে বিজ্ঞানময় আখ্যা দিতে গিয়ে বলেনঃ

(يس والقرآن الحكيم) অর্থাৎ, "শপথ কুরআনের যা বিজ্ঞানময়।" বিজ্ঞান যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় তৎপরতা এবং মানব জাতির অগ্রগতি সাধনে আবশ্যকীয় বিষয়, তাই স্বাভাবিক ভাবে এটা প্রত্যাশা করা হয় যে, কোরআনের পথনির্দেশনা বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোতেও পরিব্যপ্ত হবে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, পবিত্র কুরআন অত্যন্ত চমৎকার ভাবেই তা করেছে। আর নিম্নোক্ত তথ্যটি উল্লেখিত বক্তব্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন ঃ "Almost one-eight of the total number of verses in this book is devoted to science and technology." অর্থাৎ, "কোরআনের এক অষ্টমাংশ আয়াত বৈজ্ঞানিক দিকনির্দেশনা সম্বলিত।" তবে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ ডাঃ জাকির নায়েকের মতে কুরআনের ছয় হাজার (৬,০০০) আয়াতের মধ্যে এক হাজার (১,০০০) আয়াত বৈজ্ঞানিক দিকনির্দেশনা সম্বলিত।" ফলে আল-কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত গূঢ়-গভীর। এই সম্পর্কের সমর্থনে ও সত্যায়নে ডঃ মরিস বুকাইলী বলেন ঃ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে ইসলাম সর্বদাই যমজ বলে বিবেচনা করেছে। এবং আজকালকার দিনে যখন বিজ্ঞান অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে, তখনও এই যমজ ধারণা বলবৎ আছে। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, কুরআন ও বিজ্ঞানের মাঝে কোন বিরোধ নেই। আর এ সত্য উপস্থাপনে পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক দিকনির্দেশনা সম্বলিত আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ একান্ত আবশ্যক। বক্ষমান প্রবন্ধে এ সত্যের কতিপয় প্রকৃষ্ট উদাহরণ তুলে ধরা হলো ঃ

বিশ্বজগত সৃষ্টি ঃ মহা বিস্ফোরণ

আকাশমন্ডল ও পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই একত্রে যুক্ত ছিল এবং একটি মাত্র একক বিন্দুতে একটি অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন এবং অতি উত্তপ্ত বুদবুদের মধ্যে অস্তিত্বমান ছিল। সময়ের ঘড়ির কাঁটা তখনও যাত্রা শুরু করেনি। এমনি শূন্য সময়ে সৃষ্টির সূচনা হয় Big Bang তথা মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই বুদবুদের বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট হওয়ার মাধ্যমে। আধুনিক বিজ্ঞান এই তথ্য

বিগত শতাব্দীতে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। অথচ আল কুরআন মহা বিস্ফোরণ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে চৌদ্দশত (১৪০০) বছর পূর্বেই নিম্নোক্ত আয়াতটির মাধ্যমেঃ (أولم يرالذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما) [الأنبياء: ٣٠]

অর্থাৎ, "যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোত ভাবে। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম।

মহা বিশ্বের ক্রম বিস্তৃতি ঃ

বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, প্রত্যেকটি ছায়াপথ (Galaxy) পরস্পর থেকে খুবই দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে আমাদের থেকেও। আর দূরবর্তী ছায়াপথ সমূহ নিকটবর্তীগুলোর তুলনায় আমাদের থেকে আরো অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ, এই বিশ্বজগত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। মূলতঃ আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবেল ১৯২৫ সালে সর্বপ্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ভাবে এই তথ্য উপস্থাপন করেন। ডঃ মরিস বুকাইলী এই তথ্যকে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে অভিহিত করেছেন। অথচ কুরআন চৌদ্দশত (১৪০০) বছর পূর্বেই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতার কথা ঘোষণা করেছে ঃ (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون)

[الذاريات:٤٧] "আর আকাশমন্ডল আমরা নিজস্ব শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি, এবং আমিই তাতে ক্রমাগত ভাবেই প্রশস্ত ও বিস্তৃতি সৃষ্টি করার কাজে রত আছি।"

সমুদ্রের গভীরতম অংশে অন্ধকারাচ্ছন্নতাঃ

সমুদ্রের গভীরতম অংশের অন্ধকারাচ্ছন্নতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল কুরআন বলছে ঃ (أوكظلمات في بحر لجي يغشاه موج من

فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور) [النور: ٤٠]

"অথবা, তাদের কর্ম গভীর সমুদ্রের অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে আছে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই।"

আলোচ্য আয়াতে স্বাভাবিক এবং ব্যাহত আবহাওয়া পরিস্থিতিতে বিশাল সাগর তলের অন্ধকারের গভীরতা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ সাগর শান্ত থাকলেও সমুদ্রের তলদেশে এই অন্ধকারাচ্ছন্নতা বিদ্যমান থাকে। আল কুরআন অবতীর্ণের চৌদ্দশত (১৪০০) বছর পরে বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে আমাদেরকে এই তথ্য প্রদান করছে

ত্বকের মধ্যে বেদনা গ্রাহী অনুভূতি বিদ্যমান ঃ

পূর্বে বিজ্ঞান এই চিন্তা করত যে, মস্তিষ্কই ব্যাথা অনুভবের জন্য দায়ী। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের মতে ত্বকের মধ্যে বেদনা গ্রাহী ইন্দ্রীয় বিদ্যমান, যা ব্যাথা অনুভবের জন্য দায়ী। অথচ বিজ্ঞানময় আল কুরআন বহু শতাব্দী পূর্বেই এই বৈজ্ঞানিক সত্য তুলে ধরেছে এভাবেঃ

(إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب)

"যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে আমরা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবো, এবং যখনই চামড়া পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সাথে সাথে আমি নতুন চামড়া গজিয়ে দেব। যাতে তারা যন্ত্রণা আস্বাদন করতে পারে।" এখানে কুরআন মূলতঃ একথাই বলছে, চামড়ায় এমন জিনিস আছে যা ব্যাথা অনুভব করতে পারে।

পরিশেষে এ কথা বলা চলে, ধর্ম মানুষকে আহ্বান জানায় সৃষ্টিজগত নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে। আর বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বুঝার মতো ভাষা দান করে। বিজ্ঞানময় আল কুরআন তারই অতি সুন্দর উপমা। যার কারণে মহা গ্রন্থ আল কোরআন বৈজ্ঞানিক সত্যকে চক্ষু উন্মীলক ভাবে উপস্থাপনে এক অনন্য ঐশী গ্রন্ত হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে সমগ্র বিশ্বজগতে। আর তাইতো ডঃ মরিস বুকাইলী তার ভুবনখ্যাত বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান গ্রন্থে এই দাবি করেছেন যে, "পবিত্র কুরআনে এমন একটি আয়াতও নেই যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ যোগ্য।

যৌবনের গান: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

তোফায়েল আহমাদ*

"বুড়ো মানুষ বেহেশ্‌তে যাবে না" রহস্যাবৃত এমন বাণী এখন বুড়োদের মনে তেমন কোন অসন্তোষ বা ক্ষোভের জন্ম দেয় না । কারণ এর একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তাদের কাছে উপস্থিত- তাদেরকে যুবক করে বেহেশতে নেয়া হবে । কিন্তু "বুড়ো মানুষ গাড়িতে লয় না ।" প্রচলিত এ কথাটির কোন ব্যাখ্যাই যে বুড়োদের অন্তর্জ্বালা মিটাতে সক্ষম হবে না তা নিশ্চিত করে বলা যায় । আর কবি নজরুল তো রীতিমত বুড়োদের আঁতে ঘা ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন-
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ/ ওরা দিক্ গালি, মোরা হেসে খালি বলিব ইন্না...রাজেউন!

অবশ্য এ সকল মন্তব্যে বুড়োরাও তেমন কোন প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর করেন না । কারণ অনভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে যুবকদের যতই সমালোচনা করেন না কেন, নিবৃত একাকীত্বে দীর্ঘশ্বাসে শুধু একই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন- হায়! যদি যৌবন ফিরে আসতো! আসলে যৌবন এমন-ই । এটি চির কাঙ্ক্ষিত । শ্বাশ্বত ; চিরঅম্লান, চিরভাস্বর ; চিরসুন্দর । শুধু মানবীয় যুক্তির বিচারেই যৌবনের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেয়া নয়; খোদ সৃষ্টিকর্তাই মানবসত্ত্বার পূর্ণতা দিয়েছেন তাকে যৌবনে পদার্পণ করানোর মাধ্যমে । তাঁর ভাষায়- "অতপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; অতপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর । তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয় ।"

প্রণিধানযোগ্য যে, দায়িত্বের সাথে জবাবদিহিতার একটি আবশ্যকীয় সম্পর্ক বিদ্যমান । সুতরাং যুবকদের দায়িত্বপূর্ণ এ বয়সের সাথে জবাবদিহিতার সংশ্লিষ্টতা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক । রাসুল (স:) এ প্রসঙ্গে বলেন- "কেয়ামতের দিন কোন বনিআদম চারটি বিষয়ের হিসাব দানের আগে এক কদমও নড়তে পারবে না । (তা হচ্ছে) জীবনের মূল্যবান সময়কে কোন কাজে ব্যয় করেছে, যৌবনকে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে, অর্থ সম্পদ কোথা থেকে আয় করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে এবং অর্জিত জ্ঞানকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছে ।" অবশ্য এ জবাবদিহিতা গ্রহণের আগেই ইসলাম মূল্যবান এ যৌবনের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রতি তাগিদ দিয়েছে । এ প্রসঙ্গে রাসূল (স:) বলেন- "পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের আগে মূল্যবান মনে করবে । বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, অভাবের পূর্বে স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে ।" সুতরাং বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার মাধ্যমে যুবক বয়সের ইবাদত আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মূল্যবান হওয়ার কারণ সহজেই প্রকাশিত হয় । আর এ কারণেই রাসূল (স:) বলেছেন - "তোমার প্রতিপালক সে যুবকের প্রতি বিস্মিত হন, যে সত্য থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয় না ।"

যুবকদের চিরন্তন কর্তব্য:

সার্বিকভাবে সকল ক্ষেত্রে একজন সংস্কারকের ভূমিকা পালন করা যুবকদের মৌলিক দায়িত্ব । বিষন্ন পর্যায়ে যথাযথ সংস্কার ব্যতীত ইসলামের সুফল ও কল্যাণের ফল্গুধারা লাভকরা সম্ভব নয় । আর এ জন্য যুবকদের বিকল্প নেই । ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুবকদের এ সংস্কার কার্যক্রমকে আমরা চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি ।

১. ব্যক্তির সংশোধন । ২. পরিবারের সংশোধন । ৩. সমাজ সংশোধন । ৪. রাষ্ট্রের সংশোধন ।

নিম্নে বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো -

০১. ব্যক্তির সংশোধন :

যুবকদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধতা অর্জন করা । কথাটিকে অন্যভাবে আত্মসংশোধন বা আত্মশুদ্ধি বলা যায় । কুরআনের পরিভাষায় একে "তাজকিয়ায়ে নফস্" বলে । মূলত আত্মশুদ্ধি হচ্ছে সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি । যার আত্মশুদ্ধি হয় নি তার সকল ইবাদত ও সৎকাজ ব্যর্থ । এ কথাই আল্লাহ্ তায়ালা

---

* ৫ম সেমিষ্টার

কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে - "যে আত্মশুদ্ধি করতে পেরেছে সে সফল হয়েছে। এবং যে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।" আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অন্যত্র বলেছেন -"সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন কাজে আসবে না। তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা, যে সুস্থ মন নিয়ে আল্লাহর নিকট হাজির হবে।" আত্মা থেকেই আত্মশুদ্ধির ধারণা এসেছে। এই আত্মা বা হৃদয় হচ্ছে শরীরের কেন্দ্র। তাই এ কেন্দ্রের সংশোধনের উপর ইসলাম যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। রাসূল (সঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন- "সাবধান! শরীরের মধ্যে এমন এক টুকরা গোশত আছে যা ঠিক হলে গোটা শরীর ঠিক এবং তা খারাপ হলে গোটা শরীর খারাপ হয়ে যায়। সাবধান! সেটি হচ্ছে অন্তর।"

০২. পরিবার সংশোধনঃ

পরিবার সংশোধন বলতে সাধারণত তিনটি কাজ বুঝায়। স্ত্রীর সংশোধন, স্বামীর সংশোধন ও সন্তানের সংশোধন। প্রথমতঃ বিবাহিত যুবককে তার স্ত্রীর সংশোধনের দায়িত্ব নিতে হবে। এটা তার নৈতিক কর্তব্যও বটে কেন না শরীয়ত পরিবারের কর্তৃত্বশীলতার দায়িত্ব তার উপরই অর্পণ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ বিবাহিতা মুসলিম যুবতীদেরকে তাদের স্বামীর সংশোধনের দায়িত্ব নিতে হবে। স্বামী যদি দ্বীনদার না হয় তাহলে তাকে দ্বীনের পথে আনার জন্য স্ত্রীর পক্ষ হতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। স্বামীকে দ্বীনি কাজে সাহায্যকারী এরূপ স্ত্রীর প্রশংসায় রাসূল (সঃ) বলেন - (সর্বাধিক উত্তম সম্পদ হলো) যিকিররত জিহ্বা, শোকর গুজার অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী যে দ্বীনি কাজে স্বামীকে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত এবং সর্বোপরি মুসলিম যুব-দম্পতির কর্তব্য হচ্ছে তাদের সন্তানের সংশোধনের দায়িত্ব নেয়া। কারণ পিতা-মাতার আদর্শের ভিত্তিতেই সন্তানরা বেড়ে উঠে। সুতরাং সন্তানদেরকে দ্বীন শিখানোর ক্ষেত্রে পিতামাতা যদি যথাযথ পদক্ষেপ ও সতর্কতা অবলম্বন না করেন তাহলে তাদেরকে এ জন্য জবাবদিহিতার সম্মুখিন হতে হবে। রাসূল (সঃ) বলেন- "প্রত্যেক শিশু স্বভাবগত প্রকৃতির (ইসলামের) উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান কিংবা অগ্নিপূজারী বানায়। যেমন পশু নিখুঁত শাবক জন্ম দেয়; তোমরা কি তাতে কোন ত্রুটি দেখতে পাও?

০৩. সমাজ সংশোধনঃ

সমাজ বলতে পরিবার ভিত্তিক জাতি ও দলকে বুঝায়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জাতি, গোত্র ও সমাজের ভিন্নতা সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তাদের মাঝে পারস্পরিক পরিচিতির ভিত্তিতে সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপন হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন -"আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও।" সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপন ও সমাজ সংশোধনে যুবকদের বিকল্প নেই। সমাজের যে কোন কর্মকান্ডের সাথ যুব সমাজের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হোক তা শুভ কিংবা অশুভ। তাই মুসলিম যুবকদেরকে একটি কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সামাজিক এ কর্মকান্ড ও দায়-দায়িত্ব থেকে দূরে থাকার কোন অবকাশ নেই। রাসূল (সঃ) এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে বলেছেন-"যে ব্যক্তি মুসলমানদের সামষ্টিক বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

০৪. রাষ্ট্রের সংশোধনঃ

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম যুব সমাজের চূড়ান্ত কর্মসূচী হচ্ছে রাষ্ট্র সংশোধন। বস্তুত সাধারণভাবে মানব জীবনে এবং বিশেষভাবে মুসলিম সমাজে একটি রাষ্ট্র তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। রাসূলে করীম (সঃ) এর জীবনেতিহাস বিশ্লেষণ করলেই জানতে পারা যায় যে, তিনি নবুয়্যত লাভ করার পরই একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সরকার গঠনের জন্য চেষ্টানুবর্তী হয়েছিলেন। কার্যত তিনি তা করেছিলেন। রাষ্ট্র ক্ষমতার যে কতটুকু গুরুত্ব তা রাসূল (সঃ) এর নিম্নোক্ত হাদীসের যথাযথ অনুধাবনের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন- "ইসলাম ও শাসক পরস্পর যমজ দু'ভাই। তাদের একজন অপরজন ব্যতীত শুদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং, ইসলাম হচ্ছে মূলভিত্তি, আর শাসক হলো এর পাহারাদার। আর যার ভিত্তি নেই তার ধ্বংস আবশ্যক এবং যার পাহারাদার নেই তা অবশ্যই ধ্বংসশীল।"

পরিশেষে বলা যায় যে, মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয়ের যেমন বিকল্প নেই, তেমনি ইসলামের বিজয়ের জন্য সত্যনিষ্ঠ মুসলিম যুব সমাজের বিকল্প নেই। যুগ পরিক্রমায় এ সত্য বারবারই প্রমাণিত হয়েছে।

দারিদ্র, অর্থনীতি এবং মুহাম্মদ (সঃ)

মু. ইমরান হোসাইন*

বিশ্বে এখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো দারিদ্র সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি সমাজ-সভ্যতা ও সমস্যা মোকাবিলা করে আসছে। হাজারো থিওরি, সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, পিএইচডি করা হচ্ছে দারিদ্র নিরসন কৌশলের উপর। বাস্তবতা হচ্ছে, উদ্ভাবিত বিভন্ন কৌশল কিছুদিন পরই তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে। এর কারণ হতে পারে দু'টি ১. কৌশলটি পরিপূর্ণ নয়। ২. সমাজে কিছু মৌলিক সমস্যার কারণে কৌশলটি কার্যকর হচ্ছে না। সত্যিকার অর্থেই সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও নির্যাতনের কিছু ব্যবস্থা রয়েছে যে গুলো দারিদ্র্যকে ত্বরান্বিত করেছে যেমন-১. সুদভিত্তিক অর্থনীতি ২. শরীয়তের নিষিদ্ধ কর্মপন্থার মাধ্যমে অর্থোপার্জন। ৩. ব্যবসায়িক অসাধুতা। ইত্যাদি। হযরত মুহাম্মদ সঃ এই সমস্যাগুলো মোকাবিলা করেছিলেন সফলভাবে।

'রিবা' এর পরিচয়ঃ রিবা শব্দটি আরবী। সাধারণ অর্থ সুদ, বৃদ্ধি,বা বাড়তি। পরিভাষা-ঋনদাতা ঋনগ্রহীতার নিকট হতে মূলধনের সাথে নির্দিষ্টহারে যে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে তাই সুদ বা রিবা। রিবা সম্পর্কে কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে-(أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰى) অর্থ- আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সূদকে হারাম করেছেন। (আল-বাকারা:২৭৫)

এই আয়াত থেকে জানা যায়, সুদ এবং ব্যবসা এক সমান হতে পারে না। কেন না ব্যবসা মানব সমাজ গঠনের জন্য একটি বিশেষ শক্তি হিসেবে দাঁড়ায়, আর সুদ এর বিপরীতে গোটা মানবজাতিকে মারাত্মক ভাবে ধ্বংস করে। সুদ লোকদের মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নির্মমতা, দয়াহীনতা, অর্থপূজারীর ভাবধারা সৃষ্টি করে। এই কারণে সুদ অর্থনীতি ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই মানব সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। তাই কুরআন মাজিদে বলেনঃ (يَمْحَقُ الله الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقٰت) আল্লাহ সুদকে নির্মূল করেন, এবং দান-সদকাকে ক্রম বৃদ্ধি দান করেন। (আল-বাকারাঃ ২৭৬) অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে প্রচলিত সুদভিত্তিক ঋণ দুই ধরনের হয়ে থাকে,

১। যা নিরুপায় ও অভাবগ্রস্ত লোকেরা গ্রহণ করে, ২। যা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি-শিল্প সংক্রান্ত কাজে নিয়োগের জন্য গ্রহণ করে। প্রথম প্রকার ঋণে সুদ গ্রহণ বিশ্ববাসীর অজানা নয়, মহাজনগণ এরূপ সুদভিত্তিক ঋণরায় গরীব, মজুর, শ্রমিক কৃষক ও নিতান্ত অভাবগ্রস্ত জনগণের রক্ত শোষণ করে। এতে ধনী আরো ধনী হয়, দরিদ্র আরো নিতান্ত দরিদ্র হয়। আজকের পৃথিবীতে ও অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় সুদ চরম ক্ষতিকর তা প্রমাণ হয়েছে। বর্তমানে জাপানসহ বেশ কিছু উন্নত দেশে সুদের হার শুন্য, কোন সময় নেগেটিভ।

দ্বিতীয়ঃ সুদ অকল্যাণকর, এ জন্য এটা হারাম। হারাম উপার্জনের জন্য রাসূল (সাঃ) নিষিদ্ধ করেছেন, রাসূল (সাঃ) তিনটি উপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ১। লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ। ২। হালাল পন্থায় ভোগ। এ সম্পর্কে কোরআন মাজিদে এই মূলনীতিটি বর্ণিত হয়েছেঃ

(يَا أَيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأكُلُوْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطل إلاَ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً أَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ)النساء: ٣٠

হে ঈমানদারগণ তোমরা পরস্পরে অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধন সম্পদ ভক্ষণ করোনা। তোমাদের সব রকমের লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক সন্তোষ ও মর্জি অনুসারে। (আন-নিসাঃ ৩০)। আল্লাহর পথে ব্যয়ঃ পুঁজিবাদিরা মনে

---

* ছাত্র, ৪র্থ সেমিষ্টার

করে ধন সম্পদ ব্যয় করলে দারিদ্র অনিবার্য, উহা সঞ্চয় করিলেই অর্থশালী হওয়া সম্ভব। বিপরীতে ইসলাম মনে করে। আল্লাহর পথে ব্যয় করলেই বরকত হবে, স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে; সম্পদ ক্ষয় ও হ্রাস প্রাপ্ত হবে না উহা উত্তরোত্তর বাড়বে । আল কুরআনে বলেন- (وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ) নেক কাজে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পুরোপুরিই ফিরিয়ে দেওয়া হইবে, এবং তোমাদের উপর জুলুম করা হবে না। (আল-বাকারাঃ২৭২) এ সম্পর্কে আরো বলেন- (.وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ)

যারা আমার দেওয়া রিযিক ধন সম্পদ হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, যে এমন ব্যবসায়ের আশা পোষণ করে, যাতে কোন লোকসান হতে পারে না। আল্লাহ উহার বিনিময়ে তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় ফল দান করবেন। (আল-ফাতিরঃ ২৯-৩০) এসব নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের জন্য ক্ষতিকর সবকিছু বর্জন করে সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে প্রতারণার হাত থেকে মুক্ত করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ অন্যতম একটি পদক্ষেপ ছিল যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন: অর্থনৈতিক পরিভাষায় যাকাতকে বলা হয় " সম্পত্তি স্থানান্তর। যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ–متفق عليه

রাসূল (সাঃ) বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ সাদকা ফরজ করেছেন যা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হবে। (বুখারী-মুসলিম) সদকা শব্দটি যাকাত অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। যা আদায় করা আইনতঃবাধ্যতামূলক। এখানে এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থনৈতিক থিওরি প্রমাণ করে যে, যদি ধনীদের কাছ থেকে দরিদ্রদের সম্পত্তি স্থানান্তর করা না যায়, তাহলে দরিদ্রদের ভাগ্যের পরিবর্তন কখনো হবে না। অর্থাৎ তারা দরিদ্রই থেকে যাবে। বর্তমান বিশ্বে দারিদ্রবিমোচনের প্রচলিত কৌশলগুলোতে দরিদ্রদের ঋণ দেয়ার পর চড়া সুদসহ আদায় করা হয়। মূলত সম্পত্তি স্থানান্তরের মতো কোন ব্যবস্থা এসব কৈশলগুলোতে অনুপস্থিত।

চতুর্থতঃ রাসূল (সাঃ) সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসেবে সমাজে বসবাসরত মানুষকে পরিবর্তন করেছেন। পরিবর্তন বলতে তাদের নৈতিক পরিবর্তন, মূল্যবোধের পরিবর্তন। ফলে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাকে নিয়ে চিন্তা করত না, সে সকলের কল্যাণের চিন্তা করত। তাই সকলের স্বতঃস্ফুর্ত অবদান এবং অংশগ্রহণে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। রাসূল (সাঃ) এর সময় খুব পরিচিত একটি অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উর্ধগতি। রাসূল (সাঃ) এ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য আল হিজর নামে একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ দফতরের কাজ ছিল, অসাধু ও অবৈধ ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রন করা। এ সব সমস্যা বর্তমানে আমাদের অর্থনীতিতে বিরাজমান। কিন্তু আজ পর্যন্ত এসব সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি। রাসূল (সাঃ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক চালু করেছিলেন তখন ব্যাংকটি বায়তুলমাল নামে পরিচিত ছিল। বায়তুলমালের নির্দিষ্ট আয়ের ও ব্যয়ের খাত ছিল। ফলে অতি সহজে সফলতার মাধ্যমে দরিদ্রতা দূর করতে পেরেছিলেন। বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের দেশে ও অন্যতম অর্থনৈতিক সমস্যা হল শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক না থাকা। অথচ রাসূল (সাঃ) ১৪০০ বছর পূর্বে শ্রমিকদের যথাযথ অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا الأَجِيْرَ أُجْرَةً قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرَقُهُ

ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার পাওনা চুকিয়ে দাও। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোন দেশ দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণহীন, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। অথচ রাসূল (সাঃ) ১৪০০ বছর পূর্বে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পলিসি গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়ন করে দারিদ্র্যমুক্ত শোষণহীন, ন্যায়ভিত্তিক সমৃদ্ধ সমাজ কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। এ রকম একটি সভ্য সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বপ্রথম ইসলামের মূলনীতিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী।

কুরআন-হাদিস চর্চায় প্রযুক্তি

মোহাম্মদ আতিক হোসেন*

কম্পিউটার শিক্ষা শুধু বিজ্ঞান গবেষক বা বিজ্ঞান নিয়ে পড়া-লেখা করেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। অন্যদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার ছাত্র বা গবেষকদের এর প্রয়োজনীয়তা কম বা তা থাকলেও শুধু কম্পোজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এ ধরণের একটা ধারণা উভয় প্রকার লোকদের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু আসলে কি তাই? না, বরং কুরআন-হাদিস তথা ইসলাম চর্চায় প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। প্রযুক্তির বদৌলতে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি প্রাপ্তি যেমন সহজ ও স্থায়ী হয়েছে তেমনি যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান হয়েছে সহজ। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত বের করা, একটি নির্দিষ্ট শব্দ পবিত্র কোরআনে কতবার এসেছে ও কোন কোন সূরায় বর্ণিত হয়েছে এবং শত শত গ্রন্থের মধ্য থেকে একটি হাদিস অনুসন্ধান করা এখন কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। তাই বর্তমানে কুরআন, হাদিস বা ইসলাম নিয়ে গবেষণার জন্য কম্পিউটার জানা অতীব প্রয়োজন।

তবে সব কম্পিউটারেই যে এ প্রোগ্রামগুলো ডিফল্ড হিসেবে থাকে তা কিন্তু নয়, বরং কম্পিউটারে এসব প্রোগ্রামগুলো ইনস্টল করে নিতে হবে। তাই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যদি কম্পিউটার শিক্ষায় আরো একটু এগিয়ে আসেন তবে ইসলাম নিয়ে গবেষণা আরো সহজ হবে এবং মানুষের কাছে ইসলাম আরো সুন্দর ও যুগোপযোগী হিসেবে উপস্থাপিত হবে। এ জন্য কম্পিউটার শিক্ষাকে শুধু কম্পোজ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ইনস্টল করা, উইন্ডোজের ছোট ছোট সমস্যাগুলো সমাধান করা, ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধান করতে পারা, ইন্টারনেট থেকে ফাইল ডাউনলোড করা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা রাখতে হবে।

উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা

প্রযুক্তির বদৌলতে আজ বিভিন্ন গ্রন্থাদি সংরক্ষণ অনেক সহজ হয়েছে এবং স্থায়িত্ব পেয়েছে। সিডি, ডিভিডি, হার্ডডিস্ক, সার্ভার ইত্যাদির মাধ্যমে ছোট একটি ব্রিফকেসে বড় একটি লাইব্রেরি যেমন রাখা সম্ভব, তেমনি সম্ভব দ্রুত তা থেকে একটি বই খোঁজা। কম্প্যাক্ট সংক্ষিপ্ত রূপ হলো সিডি এবং এ নামেই এটি অধিক পরিচিত। বর্তমানে যেসব নরমাল সিডি পাওয়া যায় সেগুলোর ধারণ ক্ষমতা ৭০০-৮০০ মেগাবাইট, যার মূল্য ১৫-২৫ টাকা। এ ধরনের একটি ডিস্কে কমপক্ষে আড়াই লাখ পৃষ্ঠার সমপরিমান বই সংরক্ষণ করা যায়। আর ভাল মানের একটি ডিস্কের মূল্য ১০০০-১৫০০ টাকা। যার কিনা ১০০ বছরের গ্যারান্টি দেয়া থাকে। আর ডিভিডির ধারণক্ষমতা ১ গিগাবাইট (গিগাবাইট= ১০২৪ মেগাবাইট)। তাই সিডি/ডিভিডিতে সংরক্ষণের কারণে যেমন অনেক জায়গার প্রয়োজন হয় না তেমনি বইগুলোর পৃষ্ঠা কয়েক বছর পরে লাল হয়েও যায় না। অতএব বুখারি মুসলিমসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি সিডিতে সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবি। কেন না কয়েকশত পৃষ্ঠার একটি বইয়ের ভেতরের যেকোনো পৃষ্ঠায় বা অনুচ্ছেদে যেতে কোনো পৃষ্ঠাও উল্টাতে হবে না আবার অনেক দিন ধরে না পড়ার কারণে বইটির ধুলাও ঝাড়তে হবে না।

গবেষণা সহায়ক প্রোগ্রাম

লেখা-লেখির জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে জনপ্রিয় সফটওয়ার হলো এমএস ওয়ার্ড। কম্পিউটারে ব্যবহৃত সব সফটওয়্যারই হলো এক-একটি প্রোগ্রাম। অনুরূপভাবে কুরআনের শব্দ বা আয়াত অনুসন্ধান, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসির ইত্যাদি নিয়ে যেসব সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে তার মধ্যে হলো আ-মুসহাফ আর-রাকহি। এর মাধ্যমে মুহূর্তেই বের করা যাবে আয়াতটি কোন সূরার বা এ শব্দটি কুরআনে কতবার এসেছে। এ ছাড়াও যেকোন আয়াতের ওপর ক্লিক করলেই পাওয়া যাবে সেই আয়াতের একাধিক গ্রন্থের তাফসির। সুতারাং কোনো আয়াত বের করে সেই আয়াতটি আবার তাফসির গ্রন্থের কোন খন্ডে আছে তা বের করতে অনেক সময় ব্যয় হলেও মাত্র কয়েক মিনিটেই আমরা কাঙ্খিত আয়াতটি বের করে তার তাফসির পড়তে পারি এক জায়গায় বসে আঙুলের একটি মাত্র চাপে।

আবার অনেক প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াতকে প্রাধান্য দিয়ে, যাতে মাখরাজসহ প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ রাখা হয়েছে। শ্রোতারা এ প্রোগ্রামের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ কুরআনের তেলাওয়াত শোনাসহ শুদ্ধ করে তেলাওয়াত শিখতে পারবে। এ রকম আরো একটি প্রোগ্রামের নাম আলিম সফট। এতে পুরো কুরআনের তেলাওয়াত শোনা ও

---

* ছাত্র, ৩য় সেমিষ্টার

পাঠ করাসহ ইংরেজি অনুবাদ পড়া যাবে এবং বিষয়ভিত্তিক আয়াতও খুঁজে বের করা যাবে। এমন অনেক প্রোগ্রাম আছে যেগুলোর সাহায্যে কুরআন বুঝা অনেক সহজ হয়েছে সব ভাষাভাষী লোকদের জন্য।

হাদিস নিয়েও এ রকম অনেক প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছে। এগুলো শুধু হাদিস গ্রন্থই নয়, বরং এর ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোও স্থান পেয়েছে। তাই সঠিক হাদিসটি চিহ্নিত করা ও মেনে চলা এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে হাদিসে নববীর দলিল পেশ করা আজ অত্যন্ত সহজ। একটিমাত্র শব্দ দিয়ে হাজার-হাজার হাদিসের গ্রন্থ থেকে মিনিটেই একটি হাদিস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এ ধরনের একটি প্রোগ্রামের নাম হলো 'মাকতাবাতু আলফিয়াতুস সুন্নাহ আন নাবুবিয়্যাহ'। এতে হাজারের অধিক বই সংরক্ষিত আছে। ধরা যাক, আপনি একটি হাদিস খুঁজছেন। কিন্তু এর আংশিক স্মরণ হচ্ছে অথবা হাদিসটি কোন গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে তা জানা দরকার, এমতাবস্থায় আপনার পক্ষে সব হাদিসের গ্রন্থ পড়ে হাদিসটি খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আপনাকে কোনো হাদিস বিশারদের শরনাপন্ন হতে হবে। তবে তার কাছ থেকেও তাৎক্ষণিক উত্তর পাওয়া সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। অথচ আপনি শুধু সেই হাদিসের একটিমাত্র শব্দ লিখে সার্চ দিলেই মূহুর্তেই জানতে পারবেন হাদিসটি কোন গ্রন্থে আছে বা আদৌ হাদিসটি আছে কি না। আর আপনি জোরালোভাবেই হাদিসটির বিশুদ্ধতা বা জাল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। কেন না মানুষের অনুমানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কম্পিউটার কখোনো ভুল করে না, যদি তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয়। সুতরাং কুরআন-হাদিসের চর্চায় এমন সফটওয়্যার যেমন তথ্য অনুসন্ধানে সময় বাঁচাবে তেমনি গবেষকের আগ্রহ বাড়াবে এবং গবেষণাকে সমৃদ্ধ করবে।

ইন্টারনেট

তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির অন্যতম সুফল হলো ইন্টারনেট। কোথায় কোন গবেষণা হচ্ছে, কতদূর এগিয়েছে তার সর্বশেষ খবর, মুহুর্তেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি ইন্টারনেটের মাধ্যমে। সুতারাং ইসলাম নিয়ে যেপ্রান্তেই কাজ হোক আর যতটুকুই হোক না কেন তা সাথে সাথেই জানতে পারছে সব প্রান্তের লোকেরা। ইন্টারনেটের সার্চ ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত হলো GOOGLE, YAHOO, ASK, BING, ইত্যাদি। আরবি বই/বিষয় অনুসন্ধান করতে আরবিতে সার্চ করাই বেশি ফলপ্রসূ। এ ক্ষেত্রে উইন্ডোজটি অ্যারাবিক এনাবল করে নিতে হবে।

এ ছাড়াও আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তাফসির ও হাদিসের মূল আরবি গ্রন্থগুলো এবং হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলো সর্বত্র পাওয়া যায় না। তাই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সিলেবাসে অর্ন্তভুক্ত অনেক গ্রন্থের মূল টেক্সট না পাওয়ায় ফটোকপি করে তা পড়ানো হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকবার ফটোস্ট্যাট করার কারণে লেখাও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এতে পাঠকও বইটি পড়তে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অথচ এ ধরনের অনেক বই বিনা মূল্যে ইন্টারনেট থেকে ফ্রি পড়া যায় এবং ডাউনলোড করা যায়। এমনই একটি সমৃদ্ধ চমৎকার সাইট হলো আল মেশকাত, এতে পাওয়া যাবে কুরআন, উলুমুল কুরআন, হাদিস, হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলো, ইসলামি সাহিত্য, আরবি সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থাবলী। এ ছাড়াও এখানে বিভিন্ন পত্রিকা ও যুগোপযোগী প্রবন্ধগুলো পড়া এবং বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জানা যাবে। এ রকম আরো কয়েকটি সাইট হলো ইসলামওয়েব, ইসলাম ওয়ানলাইন, সাঈদনেট, আল-মাকতাবা, ইসলামিক বুক স্টোর, খাইমা, ইসলামওয়ে ইত্যাদি। ইদানীং বাংলা ভাষায় রচিত বা অনুবাদকৃত বই নিয়েও কিছু কিছু সাইট বের হয়েছে। যেমন ইসলাম হাউস, বাংলা কিতাব। এ সাইটগুলো থেকে বাংলা ইসলামি বইগুলো ফ্রি ডাউনলোড করা যাবে। ইসলাম হাউস সাইটটিতে আরবি, ইংরেজি, উর্দূ, ফার্সি, কুর্দি, হিন্দি, বাংলা, ফরাসি, জার্মানিসহ ২৫টি ভাষার বই পাওয়া যাবে।

সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা আলেমদের ফতুয়া, বক্তৃতা, বিভিন্ন সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের ওয়েবসাইটের সংখ্যাও অনেক। যেমন সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ, শাইখ ওযাইমিন প্রভৃতি ব্যক্তির বক্তৃতা, ফতোয়া, মাসায়েল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাইট রয়েছে। যেগুলো থেকে গবেষকরা যেকোনো মুহুর্তে তাদের কাঙ্খিত বিষয়টি সংগ্রহ করতে পারবেন। আর এ বিষয়গুলো একাধিক ভাষায় পড়ার ব্যাবস্থা আছে। ইদানীং বাংলা ভাষায়ও কিছু কিছু সাইট আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই একবিংশ শতাব্দী তথ্য-প্রযুক্তির শতাব্দী। যাকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ। তাই মানুষ পৃথিবীর যেখানে থাকুক না কেন পৃথিবী তার হাতের মুঠোয়। আর তাই প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে ইসলামকে আরো সুন্দর করে সবার কাছে উপস্থাপন করতে হবে, আবারো প্রমাণ করতে হবে ইসলাম-ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, যার প্রকৃত অনুশাসন মেনে চলার মাধ্যমেই বিশ্বে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ভিন্ দেশী ভিন্ন ভাষী ঃ ভ্রাতৃত্ব অনুপম

মুহাম্মাদ আমিমুল এহছান*

আবদুল ওলী। সোমালিয়ার ছেলে। স্কলারশীপ নিয়ে পড়তে এসেছে IIUCতে। হাতে পায়ে বেশ লম্বা। কালো গায়ের রং, কালো মাথার কোঁকড়া চুল। লম্বাটে মুখ; হাসলে টোল পড়ে দু'গালে। সেদিন কি একটা কথায় আবদুল ওলী হেসে উঠল। আমি খেয়াল করে দেখলাম, কালো মুখে ওর হাসিটা খুব সুন্দর। মজা করে আমি বললাম-" ওলী! এতো সুন্দর করে কীভাবে হাস তুমি? আমার কথা শুনে আবদুল ওলী আবার হেসে উঠল। তখনি আমার চোখে পড়ল, দু'টি মিষ্টি টোল তৈরী হয়েছে ওর দু'গালে। বুঝতে অসুবিধা হলোনা, টোল দু'টির কারণেই ওর হাসি এতো সুন্দর। কিন্তু আফসোস! মাঝে মাঝেই ওর এই হাসিটা হারিয়ে যায় দূর অজানার দেশে। হয়ত তার নিজের দেশ সুদূর সোমালিয়ায়। কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায়, হয়ত কেউ তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছে, বা 'কালো' বলে কটু মন্তব্য করেছে, যার কারণে তার মুখে হাসি নেই, বুক জুড়ে দানা বেঁধেছে একরাশ কষ্ট। কিন্তু মুখ ফুটে ও কিছু বলেনা, নীরবেই সয়ে যায় সব ব্যথা-বেদনা। এই বিদেশে মা-বাবা, আত্মীয় পরিজনহীন যে ছেলে, তার নীরবতা পালন করা ছাড়া উপায় কি? পক্ষান্তরে তার গায়ের রং কালো, হয়ত সে আমাদের মত সুন্দর(?) নয় তাই বলে তাকে আমরা ব্যঙ্গ করবো? কেন আমরা ভুলে যাই মহান আল্লাহর বাণী :(لايسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرًا منهم)

"হে ঈমানদারগণ! কোন সম্প্রদায় অপর কোন সম্প্রদায়কে ঠাট্টা করোনা। সম্ভবত সে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।" (হুজরাত-১১)এ ছাড়া রাসূল (সা:) ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা অপছন্দ করতেন। তিনি এরশাদ করেন- ما أحب اني حكيت أحدًا وأن لي كذاوكذا আমি কাউকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা পছন্দ করিনা। তার বিনিময়ে আমাকে অমুক অমুক জিনিস দেওয়া হোক না কেন (যে কোন পার্থিব নেয়ামত)। (তিরমিযী : হযরত আয়েশা (রা:)

আবদুল ওলীর মত আরো অনেক ছাত্র বিভিন্ন দেশ থেকে এসে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। ওদের গাত্রবর্ণ আলাদা, মাতৃভাষা আলাদা। চাল-চলন, আচার ব্যবহার ও সংস্কৃতি আলাদা। স্বভাবতই ওদের বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি, অনুভূতির প্রকাশভঙ্গি-যা ওদের কাছে শ্রদ্ধেয়, গুরুত্বপূর্ণ-আমাদের দৃষ্টিতে রীতিমত হাস্যকর এবং অর্থহীন।

তাই বলে এসব নিয়ে হাসি-তামাসা করা যাবেনা। একজন আবদুল ওলী না হয় নীরবে আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, হাসি-তামাসা মেনে নিচ্ছে বা মেনে নিবে, কিন্তু সবার ব্যাপারে এই গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। আমার মনে হয়, আমি যদি একজন চাইনিজ স্টুডেন্টকে অকারনে ব্যঙ্গ করি, সে আমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না। বরং তার 'ইকড়ি বিকড়ি' ভাষায় অতি উত্তম রুপে ধোলাই করে তবে আমাকে ছাড়বে। ফলে অনিবার্যভাবেই দু'জনের মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে। এবং এই দ্বন্দ্বটাই এক সময় সংঘাতের রূপ গ্রহণ করতে পারে। আমি কি চাই, আমার প্রিয় এই ক্যাম্পাস কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অশান্ত হয়ে উঠুক? নিশ্চয়ই চাইনা। তাহলে কেন আমি বেহুদা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ পরিহার করছিনা? প্রশ্নটা আপনার জন্যও।

---

* ছাত্র, ৪র্থ সেমিষ্টার

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর এই পবিত্র অঙ্গনে আমরা কেউ বাংলাদেশী, কেউ নেপালী, কেউ মিশরী, কেউ মালদ্বীপিয়ান, কেউবা চাইনিজ, কেউবা শ্রীলংকান, কেউবা সোমালিয়ান এবং কেউ বা ইন্ডিয়ান। কিন্তু আমাদের সবার মূল পরিচয় একটাই, আমরা মুসলমান। দেশ, জাতি,ভাষা, বর্ণ ও সংস্কৃতিক বিভিন্নতার উর্ধ্বে উঠে এখানে, আমরা বিভিন্ন দেশের মুসলিম ঈমানের দাবীতে যুক্ত হয়েছি ভ্রাতৃত্বের এক সুদৃঢ় বন্ধনে।

এই যে দেখুন, লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশী এক ছাত্র আবদুল ওলীর সঙ্গে ঠাট্টা করছে, কিন্তু সে ভুলেনি আব্দুল ওলী তারই মুসলিম ভাই। তাইতো পরক্ষণেই সে ক্ষমা চেয়ে বলছে- (عفوًا يا أخي أنا أمزح معك)

ওদিকে দেখুন, এই মাত্র শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টি থেকে বেরিয়েছে কয়েকজন চাইনিজ ও শ্রীলংকান তরুণ। বাহ্যত ওদের অনেক কিছুই আলাদা কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কটা একই ভ্রাতৃত্বের সূত্রে বাঁধা। এখন ওরা পরস্পরের হাত ধরে, হেঁটে চলেছে আল্লাহর ঘরে। দেখে মনে হচ্ছে, মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া এ কোন সাধারণ মুসল্লি-দল নয়, এ হচ্ছে আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁরই পাক দরবারের উদ্দেশ্যে ইবলিসি বাধার বিন্ধাচল পাড়ি দিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা দুর্ভেদ্য মুসলিম ভ্রাতৃ-কনভয়, পবিত্র কুরআনের ভাষায়: (كأنهم بنيان مرصوص)

এবার 'ওমর (রা:) হল' থেকেই একটু ঘুরে আসুন না। এটাই একমাত্র ফরেন হোস্টেল। এখানে দেখতে পাবেন, বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহাবস্থান। পাঁচতলা হোস্টেল ভবনের মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় বাংলাদেশীসহ প্রায় সকল বিদেশীর বসবাস। প্রতি তলায় সাধারণভাবে সবার জন্য চারটি করে বাথরুম। হয়ত দেখা গেল, একটি মাত্র বাথরুম খোলা আছে কিন্তু গোসল করতে এসেছে দু'জন। একজন বাংলাদেশী, অন্যজন ইন্ডিয়ান। কে আগে যাবে? দু'জনেরই তো আগে যাওয়া দরকার। কিন্তু দেখুন পরস্পরের প্রতি কি উদার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ব্যবহার! নিজে আগে না গিয়ে বাংলাদেশী ইন্ডিয়ানকে অনুরোধ করছে- After you. আবার ইন্ডিয়ানও বাংলাদেশীকে বলছে After you. এবার বাংলাদেশী যুক্তির পথে চলছে- You are my gust, I should respect you. And I think, I can do that by your taking bath at first. ইন্ডিয়ানের যুক্তি ভিন্ন। সে বলছে, You are my brother in Islam. So...

পাঠক, এ মধুর যুক্তিতর্কের শেষটা আমাদের না জানলেও চলবে। মূলত যা জানার তা হলো দু'জন মুসলিমের ভ্রতৃত্বপূর্ণ আচরণের কথা। এখন চলুন টিভিরুমে যাই, কেন? ওমা, আপনি জানেন না, আজ পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের খেলা?! টি টোয়ান্টি ম্যাচ!!

টিভিরুম: দর্শকে পরিপূর্ণ। বাংলাদেশী দর্শক, নেপালী দর্শক, মালদ্বীপিয়ান ও শ্রীলংকান দর্শক। এত দর্শক, অথচ কারো মুখে কোন শব্দ নেই একমাত্র টিভির ধারা-ভাষ্যের শব্দ ছাড়া। সবাই টান টান উত্তেজনায় নিষ্পলক তাকিয়ে আছে টিভির পর্দায়। আর একটি মাত্র বল বাকী আছে। পাকিস্তানকে জিততে হলে এই এক বলে দুই রান নিতে হবে। ব্যাটসম্যান আফ্রিদি প্রস্তুত। বল হাতে দৌড় শুরু করল বল্ড। বল করল। সপাটে ব্যাট চালাল আফ্রিদি এবং..... এবং বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে 'পাকিস্তান জিত্ গিয়া' বলে চিৎকার করে উঠল উপস্থিত সকল দর্শক। মূহুর্তে পুরো টিভি রুম জুড়ে আনন্দের আতিশয্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে এবং বলছে...

প্রিয় পাঠক, আরেকবার আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কলমের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। এখানে, এই মুহূর্তে আমি নিজে ও আমার ভাইদের সঙ্গে জয়ের আনন্দ উদ্‌যাপনের বাকী দৃশ্যটুকু অবলোকন করেছি এবং চিন্তা করেছি, কেন আমরা পাকিস্তানের বিজয়ে এত আনন্দিত। ওরা আমাদের মুসলিম ভাই, এ জন্য নয় কি? অবশ্যই। এমনিভাবে সারা পৃথিবীর যে কোন দেশের মুসলমানদের, যে কোন ধরণের বিজয়ে আমরা পুলকিত হই, পরাজয়ে গভীর বেদনা অনুভব করি। সকল মুসলিম যে আমাদের ভাই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ছাড়া ইসলামের বিজয় সম্ভব নয়। তাই এসো দু'জন দুদিকে যাওয়ার আগে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি-

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দাও, আজকের জন্য এবং আগামীর জন্য। তোমরা যা খুশি তাই দাও, যতটুকু দাও, তবে ভ্রাতৃত্ব দাও, সত্যিকারের ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

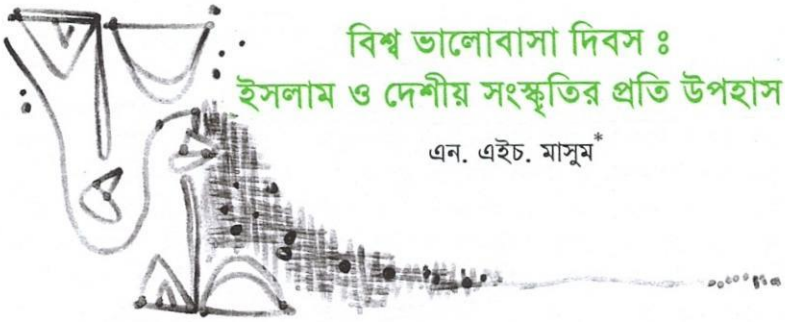

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ঃ ইসলাম ও দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি উপহাস

এন. এইচ. মাসুম*

ইসলাম থেকে যাবতীয় উপজীব্য গ্রহণ করেও পাশ্চাত্য নিজেকে ইসলামীকরন করেনি বরং ইসলামী ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্যায়ন করতে ব্যস্ত। বর্তমানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি চর্চা করা এক ধরনের ফ্যাশনে পরিনত হয়েছে। প্রতি বছর ১৪ ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে পালিত হয় ওয়ার্ল্ড ভ্যালান্টাইন'স ডে বা বিশ্ব ভালবাসা দিবস। এ দিবসকে কেন্দ্র করে যে সব কর্মকান্ড পরিচালিত হয় তা কেবল লজ্জাজনক নয় বরং আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি উপহাসের নামান্তর। দিন দিন উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীরা ভালবাসা দিবসের নামে বিজাতীয় সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে যেভাবে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে তাতে রীতিমত শিউরে উঠার মতো অবস্থা। উত্তরাধিকার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ আমাদের সংস্কৃতির মর্যাদাকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধে যুব সমাজের সচেতন অংশকে এগিয়ে আসতে হবে। যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ভাবনায় উন্নয়ন ও সভ্যতার ধারাবাহিকতায় বর্তমান পৃথিবী বিশ্বগ্রাম (Global village) -এ পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ অপর প্রান্তের মানুষের সাথে আদান-প্রদান করছে নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আচার আচরণ। বিজ্ঞানের অভূতপুর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ায় মানুষ ঘরে বসেই পৃথিবীকে দেখা ও জানার সুযোগ পাচ্ছে। সভ্যতার চরম উৎকর্ষ ঘটেছে আজকের পৃথিবীতে। কিন্তু এতসব সত্তেও অযাচিত এমন কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে যা কখনই সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ হতে পারেনা। আজ জগতময় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে- তা আইয়ামে জাহিলিয়াকে হার মানায়। এ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বিশ্ব শান্তি ও ইসলামের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করা সময়ের অপরিহার্য দাবি হয়ে উঠেছে। কারণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের কথা বার বার উচ্চারিত হচ্ছে। বিশ্বের কোথাও কোন সন্ত্রাসী অপকর্ম সংঘটিত হলে তাৎক্ষনিকভাবে মুসলমানদের দোষারোপ করা হচ্ছে নির্বিচারে। এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে, মহান স্রষ্টা আলাহ তা'আলা প্রদত্ত সুষ্ঠু ও সুনির্ধারিত বিধি- বিধানের নামই ইসলাম। ইসলাম তাওহীদ একত্ববাদ বা পরম সত্যতত্ত্বভিত্তিক জীবনদর্শন, জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের সার্বিক সামষ্টিক কর্মপদ্ধতি। ইসলাম শাশ্বত, সর্বাত্বক, বিশ্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশনা।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম শাসিত দেশ হওয়ার পরও বাংলাদেশের পাশ্চত্যকে কালচার সম্পূর্ণ অনুসরণ করছে। ভ্যালেন্টাইন ডে। ভ্যালেন্টাইন ডে এর ইতিহাস থেকে যতটুকু উপলব্ধি করা যায় তা কি কোন মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে? যদি না পড়ে তাহলে কেন মুসলিম যুবক-যুবতিরা বিদেশী সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে হৈ-হুল্লোড় করছে। তা কি একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন নেই? ১৪ ই ফেব্রুয়ারী তথাকথিত ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপন করা হয়। গত কয়েক বছর ধরে এ বিজাতীয় নোংরা, অশ্লীল অপসংস্কৃতি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে রূপ দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। আর এ অপচেষ্টার গোলকধাঁধাঁর আবর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র। আর এ মুসলিম দেশের মানুষ এর ঈমান- আক্বীদা তাহযীব-তমদ্দুন ধ্বংস করে দেয়ার জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। আমরা সবাই জানি একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য সর্বপ্রথম ধ্বংস

---

* বি.এ (অনার্স) ইন দাওয়াহ

করা হয় সে দেশের সংস্কৃতি। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ভালবাসা দিবসের নামে স্বার্থান্বেষী কিছু মহল এ দেশে আমদানি করে কথিত ভালবাসা দিবস। আর সে ষড়যন্ত্রের শিকার মুসলিম তরুণ-তরুণীরা। তরুণ সমাজ হলো দেশের প্রাণ। আর এই প্রাণকে যদি অকালেই শেষ করা যায় তাহলে সেই সভ্যতা কলুষিত করার জন্য ভালবাসার মতো একটি পবিত্র জিনিসকে তাদের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আজ তাদের কাছে মনে হচ্ছে ভালবাসা মানে দু'জন তরুণ-তরুণীর নিজেদের একান্তে পাওয়া, যা মনো-দৈহিক অবৈধ মিলনকে অবাধ প্রশার ও প্ররোচনা যোগায় মাত্র। অথচ ভালবাসার সংজ্ঞা এমন নয়। ভালবাসার নাম আনুষ্ঠানিকতা নয়, নয় বেহায়াপনা কিংবা যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা। ভালবাসা খুবই পবিত্র জিনিস এক অতি নির্মল আবেগ। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুতেই ভালবাসার উপাদান রয়েছে এবং এ ভালবাসার টানেই পৃথিবী এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। আমার মনে হয় যেন মানুষের জীবনের লক্ষ্য শুধু এটাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমানে সর্বত্র ভালবাসার নামে লজ্জাহীনতার পাগলা ঘোড়া ছুটছে। অসৎ সাহিত্য সিনেমা, নাটকে, ক্লাবে ও হোটেলে, রেস্তোরায় বয়ে চলছে ভালবাসা নামের লজ্জাহীনতার বাধভাঙ্গা জোয়ার। আর এই দিবসে যৌন উন্মাদনায় মেতে উঠে তরুণ সমাজ। এক কথায় বলা যেতে পারে অশ্লীলতা আর বেহায়াপনায় ভরপুর এই ভ্যালেন্টাইন ডে ১৪ ই ফেব্রুয়ারী মুসলিম ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় সৃষ্টি করে চলেছে। মুসলিম যুব সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে এ দেশে সর্বপ্রথম একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ভ্যালেন্টাইন ডে এর সূচনা করে। যদিও এর পূর্বে পাশ্চত্যে ও অন্যান্য দেশগুলোতে এর চর্চা। শুরু বাংলাদেশে ৭/৮ বছর ধরে এই ভালবাসা দিবস উদযাপিত হতে শুরু করে। সময়ের আবর্তনে বদলে গেছে কথিত ভালবাসার সংজ্ঞা। তাইতো এখন ভালবাসা মানে মনে হয় শুধু দৈহিক সম্পর্ক। বিশ্বনবী মোহাম্মদ(সাঃ) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। লজ্জা ও ঈমান একই সূতোয় গাথা। এর একটি উন্নত হলে অপরটিও উন্নত হবে। আর যখন একটি তিরোহিত হয় অন্যটিও তিরোহিত হয়ে যায়, (মিশকাত)। মানব জীবনে যতগুলো গুনের সমাবেশ ঘটা সম্ভব তার মাঝে লজ্জাশীলতা থাকলে সে সৎ কর্মশীল হয় এবং লজ্জার দ্বারাই সফলতা অর্জিত হয়। চলমান দুনিয়ায় যে সকল সমাজে সমকামিতা বৈধ, যেখানে কুমারি মায়েদের জন্য হাসপাতাল খোলা আছে, যেখানে কুমারিত্ব হরণকে পরম পূন্য বলে মনে করা হয় তারাইতো ঢাকঢোল পিটিয়ে ইথার সমুদ্রে প্রভোন্জনক তুলে বিশ্ব ভালবাসা দিবসের গোড়াপত্তন করেছে। সুতরাং মুসলিম মিল্লাতের উচিৎ ঈমান ও আমলকে হেফাযতে রাখা এবং ধর্মনাশী সংস্কৃতির খপ্পর হতে নিজেকে, পরিবার, সমাজ জাতিকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা। এ জন্য তথা মুমিন মুসলমানদের উচিৎ ভালবাসার নামে লজ্জাহীনতা, উলঙ্গপনা ও অপসংস্কৃতির পাগলা ঘোড়ার পথ রুখে দাঁড়ানো। তা না হলে নির্জ্জলতার আবর্তে ঈমানের জ্যোতি হারিয়ে যাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাকে সত্যিকার ঈমানী জিন্দেগী বলা যাবেনা। এখনই যদি ইউরোপ-আমেরিকার আবিষ্কৃত তথাকথিত ভ্যালেন্টাইন ডে-র গ্রাস থেকে যুব সমাজকে বাঁচানো না যায় তাহলে এসিড নিক্ষেপের মতো ঘটনা এমনিতো বৃদ্ধি পেয়েছে তা আরো দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পাবে।

সংস্কৃতি হলো জাতির নিজস্ব পরিচয়। যার মাধ্যমে একটি জাতিকে অন্য সব জাতি থেকে আলাদা করা যায়। কিন্তু আমরা বারবারই অমুসলিমদের সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি ভুলতে বসেছি। যার কারণে ভ্যালেন্টাইন ডে, থার্টি ফাস্ট নাইট, মিউজিক কনসার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে অপসংস্কৃতি চর্চা করে যাচ্ছি। মোট কথা হলো, সংস্কৃতির নাম দিয়ে আমরা যা চর্চা করে চলছি তা সম্পূর্ণ বিজাতীয় অপসংস্কৃতি মাত্র। এহেন নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ থেকে সরে দাঁড়াতে না পারলে সমাজকাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। যা ঠেকানো আমাদের দ্বারা কখনো সম্ভব হবেনা। এসব অপকর্ম রুখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারলে খুব শীঘ্রই সমকামিতা ও ফ্রি সেক্সের শ্লোগান উঠবে। এই ভয়াবহতাকে রুখে দিতে হবে। অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে ঈমান আমলকে হেফাযত করা যাবেনা। আর ঈমান ও আমলকে হেফাযত করতে না পারলে নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়াটা বৃথা হবে। তাই সচেতন ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবক মহলকে ভ্যালেন্টাইন ডে এর কুফল সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে একযোগে কাজ করতে হবে এবং পাশাপাশি ধর্মীয় বিধান পর্দার প্রতি সবাই যেন উদ্বুদ্ধ হয়, সে লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় আইন পাস করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। তবেই হয়তো অবাধ যৌনতা ছাড়িয়ে দেয়ার পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র বাংলাদেশসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে রুখে দেয়া সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ।

সামান্য কম বেশী

মারুফ উল আলম*

ভরা বর্ষা। নদী কানায় কানায় পূর্ণ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দীন। হিসেবী মানুষ। সংসারকে পয়সার নিক্তিতে বিচার করেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, যা অবস্থা বন্যা এবার হবেই। আর তা দিয়ে হয় তো তার আয়ও বাড়বে। চড়া সুদে চাষীদের টাকা ধার দিয়ে বেশটাকা কামিয়ে নেবে সে। এই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে সেতো এজন্যই নদীর তীরে এসেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল নাসিরুদ্দীন। হঠাৎ দেখে একটু দূরেই কয়েকজন লোক। জটলা করছে। এগিয়ে গিয়ে নাসিরুদ্দীন দেখল, ওরা অন্ধ। সংখ্যায় দশজন। নদী পার হবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে।

নাসিরুদ্দীন বলল, "যদি একটি করে পয়সা দাও তো তোমাদের পার করে দিই।"

অন্ধদের একজন বলল, "আমরা গরীব। পয়সা কোথায় পাবো"।

নাসিরুদ্দীন বলল, "বেশি তো নয়। জন প্রতি এক টাকা মাত্র। অন্ধরা শেষে রাজি হল। নাসিরুদ্দীন কাজ শুরু করল অচিরেই। এক একজন অন্ধকে ধরে, নদীতে নামে, অপর তীরে পৌছে দেয়। বারবার এপার ওপার করা। তার উপর বর্ষণ মুখর দিন। পরিবেশ রীতিমত দুর্যোগপূর্ণ। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে নাসিরুদ্দীন। অনেক কষ্টে নয়জনকে সে নদী পার করে দেয়।

শেষ লোকটি দলেল অন্যদের থেকে প্রবীণ। দুর্বলও বটে, নদীতে নামবার মূহুর্তে নাসিরুদ্দীনকে বলল, ভাল করে ধরে রাখিস বাপ! আমার আবার হাত পা কাঁপে। জোর পাই না গায়ে।" নাসিরুদ্দীন অভয় দিল। "ঘাবড়াচ্ছ কেন? নেমে এসো ধরছি।" কাঁপতে কাঁপতে, টলতে টলতে ঐ অন্ধটি নদীতে নামল। কিন্তু নাসিরুদ্দীন তখন ক্লান্ত। তাই অন্ধকে ধরে রাখলেও তার মুঠি থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছিল। একটু এগুতেই বুক সমান জল। স্রোতও প্রচন্ড। হঠাৎ সে অন্ধটি নাসিরুদ্দীনের হাত ছেড়ে স্রোতে ভেসে চলল।

একবার চিৎকার করে উঠল সে, "বাচাঁও, বাঁচাও।"

নাসিরুদ্দীন ও চিৎকার করে জানাল, "বাঁচবে, ভয় নেই।"

অন্ধটি বলল, "তুমি কোথায়?"

নাসিরুদ্দীন বলর, "এই তো! এখানে"

ব্যাস! এরপর আর কিছু শোনা গেল না, বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ আর নদীস্রোতের হাহাকার ছাড়া। নাসিরুদ্দীন একাই নদীর ওপারে ফিরল।

অন্ধরা তাকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

নাসিরুদ্দীন বলল, "কিছুই না। তোমাদের কেবল এক টাকা কম দিতে হবে।"

---

* ছাত্র, ৮ম সেমিস্টার

Al-Qur'an and Orientalism

Mohammad Forkan Uddin*

Al-Quran is the main source of Islam. It encourages all Muslims to conduct their life in the a way of Islam. It gives real satisfaction for well practicing Muslims and It is the only way to success in this life and hereafter, because, the holy Qur'an it such a book in which there is no doubt.Islam is the complete code of life for the betterment of all mankind to direct them in the right path and the light of Tawhid. Prophet Mohammed (sm) and his companions completed their duties and responsibilities with the direction of Qur'an successfully. They established Islam as the complete code of life which was written in the golden history of Muslims. Muhammad (sm) and His companions were tortured and oppressed by mushriks of Makkah. All Muslims of Madina were also attacked by the group of kafir and mushrik which can be compared with military aggression.

"Lewis" said, "We can't get success against Muslims in the field of military war, because, their belief is so much strong which encourages them to sacrifice their life in the way of Islam without any question. Now, we should find out another method to change their belief from Islam, it is called intellectual war."

Now, Islam has faced a great challenge in the modern world. Orientalism is the important and dangerous method of that intellectual war. All anti-Islamic groups are engaged to do so by using researchers. They may be from America Britain, Russia, Italy, Germany, France etc. They have completed a lot of works have which made a conflict among Muslims. Even, they said that Quran is not the book of Allah, it is the result of some saying of Prophet (sm): "That is why they call Islam as Mohammedism". They also said: Prophet (sm) was affected by epilepsy which was done by Satan". According to an Orientalist named Gold Ziher, "Islam is nothing but the combination between the religion of Christian and Jew". It is the policy to impose something to Muslims by orientalists. That is called cold war.

The above discussion it can be said that, we should find out the orientalists and their objectives and try to defend ourselves intellectually. All Muslims should work in this field to meet the contemporary challenges before them by cutting the black hand of orientalists intellectually.

---

* 8th Semester

কালের সূচনাতে

মোঃ ফখরউদ্দিন*

স্বকীয় জীবনের গতিতে, ভাসমান মনোহর স্মৃতিতে,
দাগ দেয় গ্লানির ক্ষণ,
বেঁধে নেয় নির্মম রীতিতে।
বিদায়ী বর্ষের ইতিতে, গোধুলী আলো আঁধারীতে,
ঢেকে দাও বেদনার অধ্যায়
মুছে দাও নীরবে নিভৃতে।
শুভ নববর্ষের শুরুতে, পাখিদেও কলরব প্রভাতে
খুলে দাও মুখরিত অধ্যায়
ধরে নাও আপন এক গতিতে।
অক্ষয় সুখের এই জোয়ারে, ডুবন্ত মানুষের সারিতে,
দেখা দেয় সন্তোষ অনুক্ষণ
সঁপে দেয় প্রভুর মহিমাতে।

** ছাত্র, মাস্টার্স*

কলরব

মো: আহসান উল্লাহ*

কোকিল ডাকে- 'কহু কহু'
কাক ডাকে- 'কা-কা'।
পায়রা ডাকে-'বাকবাকুম'
ময়ূর ডাকে- 'কে-কা'।
শিয়াল মামা 'হুক্কা হুয়া'
কুত্তা করে 'ঘেউ'
মোরগ ডাকে-'কক্ কক্' কক্
বিড়াল ছানা 'ম্যাও'।
গরু ডাকে- 'হাম্বা' রবে
ভেড়া ডাকে- 'ভ্যাঁ'
ঘোড়া ডাকে- 'হিস্‌হিস্'
ছাগল ডাকে- 'ম্যাঁ'।
চড়ুই পাখি 'কিচির মিচির'
ব্যাঙ বলে 'ঘ্যাঙ'
মানব শিশু 'উঁ-আঁ' কাঁদে
নাচিয়ে দু'টি 'ঠ্যাঙ'।

** ছাত্র, ২য় সেমিষ্টার*

আমি হবো

আহসান হাবীব

কুরআনের শিক্ষায় আলোকের রাহী।
হবো আমি কুরআনের পতাকা বাহী।
জীবনের পরতে মহান বাণী।
জীবন সংগ্রামে দেবে বিজয় আনি।
গরিব দুঃখির হবো আমি সহায়।
সংগ্রামে হবো আমি সৈনিক নির্ভয়।
বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে চলবো আমি।
বাতিলের পথে হবো আমি নির্দয়।
কোরআনের আলো নিয়ে চলবো জীবন
কবুল কর গো প্রভু আমার এই পণ।

ডাক

হোছাইন মোঃ রিয়াদ*

প্রাণের নবীন নওজোয়ান
সম্মুখে হও আগুয়ান,
সামনে তোমার আসলে আসুক বজ্র নিনাদ ঝড় তুফান
কিংবা তোমায় রুখতে চাহুক সর্বগ্রাসী দুষ্টুবান।

সূর্য সেনা তরুণ প্রাণ
মুক্তির আজ গাওরে গান
কৃষ্ণ নিশির তিমির ভেদি, আঁধারে আলোর অরুণ আন
পরাধীনতার মরণ চূড়ায় স্বাধীনতার জোর শ্লোগান।
সত্য ন্যায়ের কর্ম বীর
লক্ষ্য তোমার কর স্থির
দূর্গম, মরু পাহাড় ছাড়ি পৌছতে হবে শান্তি-নীড়
শত্রু তোমার বক্ষ ভেদী মারুক যতই বিষের তীর।

দিগ্বীজয়ী সান্ত্রীদল
পা কেন আজ টালমাটাল,
দেখ্ মানব খুনে রঞ্জিত এই ধরণীর অস্তাচল
দেখ্ নিষ্পাপ শিশুর চোখে, শোকাশ্রু বইছে ঢল।
তীক্ষ্ণ চোখের ঈগল ছানা
আজ আকাশে মেল্ ডানা,
দৃষ্টি মেলে দেখ, আজিকে কোথায় দুখের আস্তানা
দুঃখটারে উর্ধ্বে তুলে আছড়ে আজকে কর ফানা।

** ছাত্র, ১ম সেমিস্টার*

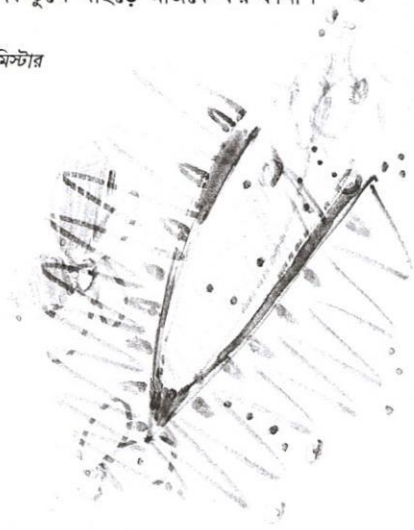

মা জননী

নাসীম বিন ইয়াছিন

জানো কী তুমি মাগো
কত ভালোবাসি তোমাকে ?
দুঃখ ব্যাথা যায় হারিয়ে
গেলে মা তব সকাশে।

আদর করে ডাকে যখন
নাসীম তুমি কই ?
মনটা তখন ভরে উঠে
লুকিয়ে মা কেমনে রই ?
খেলতে গিয়ে ব্যাথা পেলে
মলিন তোমার মুখ,
ভালো কিছু করলে আমি
তৃপ্তিতে ভরে বুক।
রোগে শোকে কাতর হলে
বসে থাকো মোর পাশে
এমন আমার মা জননী
ভুলবো তোমায় কিসে ?

* ছাত্র,

অগ্রদূত

মো: ইমরান হোসেন*

কবে বের হবে তুমি
QSIS ম্যগাজিন,
প্রতীক্ষা ফুরায়না
রাত্রী কিবা দিন।
কবে বের হবে তুমি
বুকে কবিতা
তুমি হবে আমাদের
সরচ গাঁথা
তোমার পৃষ্ঠায় তুলে ধরে।
বের হয়ে এসা তুমি
আগামীর ডাকে
জাগাতে নতুন প্রাণে
অযুত আশা।

** ছাত্র, ২য় সেমিষ্টার*

জানার আছে অনেক কিছু

এফ আই আজাদ*

- "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতা রচনার কারণে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কারাদন্ড হয়।
- তাইওয়ানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আছে, কিন্তু কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।
- হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার নাম হল "লিটল বয়"।
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমা হল প্রায় ৩৭১৫ কিমি
- বি বি সি'র প্রধান কার্যালয়ের নাম "বুশ হাউজ"।
- ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" এর প্রধান শিল্পী ছিলেন জর্জ হ্যারিসন।
- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা বিচারপতি হলেন, বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা।
- "ফাদার অব মডার্ণ এ্যাসট্রোফিজিকস" হিসেবে পরিচিত ছিলেন বাঙালী বিজ্ঞানী সত্যেন বোস।
- মুক্তিযুদ্ধে কেবল মাত্র ১০ নং সেক্টর নৌকমান্ডো দ্বারা পরিচালিত হতো।
- বাংলা সনের প্রবর্তন করেন সম্রাট আকবর।
- ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে "বাবরি মসজিদ" ধ্বংস করা হয়।
- ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত।
- ব্লাক বক্স (Black Box) হলো বিমানে রক্ষিত ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার।
- ইথিওপিয়ার মুদ্রার নাম হলো "বির"।
- পৃথিবীর সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা হলো চীনের "মান্দারিন" ভাষা।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য ১২০ কিঃ মিঃ।
- "ক্লোরোফিল" নামক এক প্রকার রঞ্জক পদার্থের কারণে উদ্ভিদের পাতা সবুজ হয়।
- "সোর্ড অব অনার" প্রাপ্ত প্রথম মহিলা হলেন, মারজিয়া ইসলাম।
- টেস্ট ক্রিকেটে সর্বপ্রথম বাংলাদেশী বোলার অলক কাপালী হ্যাট্রিক করেন।
- "আমি বাংলার গান গাই" এর প্রথম গায়ক হচ্ছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়।
- "War and Peace" গ্রন্থটির লিখক লিও টলস্টয়।
- "Brick lane" গ্রন্থটির লেখক হলেন– মনিকা আলী। তিনি বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত।
- "ফোর্থ এস্টেট" বলতে সংবাদপত্রকে বুঝানো হয়।
- "বাংলাদেশ স্ট্রিট" হলো আইভরিকোস্টের একটি সড়কের নাম।
- "যমুনা" নদীতে পাশাপাশি দুই রংয়ের পানির স্রোত হয়।
- "গোমতী" নদীতে কোন জোয়ার-ভাটা হয় না।
- জাতীয় সংসদে সাংবাদিক আসন আশি (৮০) টি।
- "রাঙ্গামাটি" জেলায় একসাথে বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমার সীমান্ত ছুঁয়েছে।
- "শিকাগো" কে পৃথিবীর কসাইখানা বলা হয়।
- সূর্যোদয়ের দেশ হলো জাপান।
- "Long Walk to Freedom" এর লেখক নেলসন ম্যান্ডেলা।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জাহাজ হল–"ওয়েসিস অব দ্যা সিস"।
- বৃটিশ রাজকীয় সেনাবাহিনীতে সর্বপ্রথম বাংলাদেশী সৈনিক হলেন মাহমুদ শওকাত আজাদ।
- "সবুজ ছাতা" হল মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুবিধার প্রতীক।
- সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ "হিলিয়াম"।
- জিল্লুর রহমান বাংলাদেশের ১৯তম রাষ্ট্রপতি।
- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র "মোনাকো"।
- পৃথিবীর প্রথম ক্লোন মানব শিশুর নাম "ইভ"।
- হযরত ওমর (রাঃ) এর শাসন থেকে হিজরী সন শুরু হয়।
- "মাওরি" হল নিউজিল্যান্ডের আদি অধিবাসীর নাম।
- ১৯০১ সাল থেকে "নোবেল প্রাইজ" দেওয়া শুরু হয়।
- সৌরজগতের বর্তমান গ্রহ হলো ১২ টি (আগের নয়টির সাথে নতুন তিনটি সহ)
- "ট্যাক্স হলিডে" হলো সাময়িক ভাবে ট্যাক্স মওকুফ করা।
- "সার্ক সেক্রেটারিয়েট" নেপালে অবস্থিত।
- ভিয়েতনামের মুদ্রার নাম "ডং"।
- কাবা শরীফে সর্ব প্রথম গিলাফ পরান ইয়েমেনের রাজা তুব্বা।
- সর্ব প্রথম জুমার সালাত পড়ান হযরত আসওয়াদ ইবনে মুররাহ্ (মদীনায়)।
- ডাক বিভাগ প্রথা চালু করেন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)।
- মুক্তিযুদ্ধে বীর বিক্রম খেতার প্রাপ্ত একমাত্র উপজাতি মুক্তিযোদ্ধা হলো "ইউ কে চিং"।
- ISD = International Standard Dialing.
- VOIP = Voice Over Internet Protcol.
- SIM = Subscriber Identity Module.
- CNG = Compressed Natural Gas.
- DV = Diversity Visa.
- VGF = Vulnerable Group Feeding.
- NB = Nota Bene.
- GMT = Greenwith Mean Time.
- GDP = Gross Domestic Product.
- WWW = World Wide Web.
- VIRUS = Vital Information Resources Under Seize.

* ছাত্র, ৭ম সেমিস্টার

কৌতুক

একদা তিন দেশের তিন পুলিশ অফিসার বিমানে চড়ে জাপানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন রাশিয়ান, আরেকজন আমেরিকান ও অন্যজন বাংলাদেশী।

বিমানে চলতে চলতে তাদের মধ্যে অপরাধ সংক্রান্ত কথা হচ্ছিল।

রাশিয়ান পুলিশ: আমাদের পুলিশ খুবই সক্রিয়, কেউ খুন হওয়ার ৪ ঘন্টার মধ্যে অপরাধী সনাক্ত করে পেলে।

আমেরিকান পুলিশ: আমাদের পুলিশ আরো সক্রিয়, কেউ খুন হওয়ার ৮ ঘন্টার মধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারে।

বাংলাদেশী পুলিশ: আমাদের দেশের পুলিশ আরো সক্রিয়, কারণ খুন হওয়ার ২৪ঘন্টার আগেই জানতে পারে কে খুন হবে এবং কাকে আসামী করা হবে।

* ফজলুল করিম, ছাত্র, ২য় সেমিস্টার

চারিত্রিক সার্টিফিকেট

: কমিশনার সাহেব বাসায় আছেন?
: কেন?
: আমার একটা চারিত্রিক সার্টিফিকেট দরকার।
: তিন মাস পরে আসেন, উনি নারী ঘাটিত কেসে ছয় জেলে আছেন।

*মোহাম্মদ আতিক হোসেন, ছাত্র, ২য় সেমিস্টার

সাহস পরীক্ষা

মিলিটারিদের সাহস পরীক্ষা করছে তাদের প্রধান। এক মিলিটারিকে দুরে দাঁড় করিয়ে রেখে মাথায় লেবু রেখে বন্দুক দিয়ে সেই লেবুটিকে গুলি করল। মিলিটারিটি একদম নড়ল না। লেবুটি ফেঁটে গিয়ে তার শার্টটিকে নষ্ট করে দিল।

তাদের প্রধান তাকে ৫০ টাকা দিয়ে বলছে:
'সাবাস, এই টাকা দিয়ে সাবান কিনে শার্টটি ধুয়ে নিও'।

মিলিটারি বলল :
'তাহলে আরো ৫০ টাকা দিন, প্যান্টটিও ধুতে হবে।

ইংরেজী ও আরবী

ইন্টারভিউ বোর্ডে এক যুবককে প্রশ্ন করা হল, বল তো ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল" এর ইংরেজী কী হবে?

: এটার ইংরেজি পারি না স্যার। আরবীটা পারি। আরবীটা পার! ঠিক আছে বল।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন।

চাপা

১ম ব্যক্তি : ভাই তোমার নাম কি?
২য় ব্যক্তি : চাপা ঝন্টু?
১ম ব্যক্তি : বাবার নাম কি?
২য় ব্যক্তি : চাপা মন্টু?
১ম ব্যক্তি : বাড়ি কোথায়?
১ম ব্যক্তি : চাঁপাই নবাবগঞ্জ
১ম ব্যক্তি : তোমরা খাও কি?
২য় ব্যক্তি : চাঁপাকলা।
১ম ব্যক্তি : তুমি কর কি?
২য় ব্যক্তি : চাঁদাবাজি?
১ম ব্যক্তি : তোমার বাবা কি করেন ?
২য় ব্যক্তি : চাঁদাবাজি? আচ্ছা ভাই এতো কিছু জিগাইলেন, এবার বলেন আপনি কি করেন?
১ম ব্যক্তি : আমি র‍্যাবের ডি.জি।
২য় ব্যক্তি : ওরে বাবারে পালাই।

Dept. of Qur'anic Sciences and Islamic Studies (QSIS)

International Islamic University Chittagong

Hon'ble Teachers

S.I	Name of Teachers	Designation	Academic Qualifecation
1	Prof. Dr. Abu Bakr Rafique	Professor	M.M. B.A. (Hons.) M.A. (DU) M.A. (Khartoum), Ph.D. (UKM)
2	Prof. Dr. M. Gias Uddin Hafiz	Professor	M.M. B.A. (Hons.) (IUK), 1st Class 1st M.A. (IIUM), Ph.D. (IIUM)
3	Mr. Kazi Deen Mohammad	Associate Professor	M.M. B.A. (Hons.), (Makkah) M.A. (DIU)
4	Mr. Muhammad Shafi Uddin	Associate Prof. & Head	MM 1st Class, B.A. (Hons.) 1st Class (Madina) M.A. 1st Class (DIU)
5	Dr. Muhammad Siraj Uddin	Assistant Professor	M.M. B.A. (Hons.) K.S.A. IIUM P.h. D.(U.K.M) (Diploma in Arabic Riyadh)
6	Mr. Md. Rashid Zahid	Assistant Professor	B.A. (Hons.) (Libya) M.A., M.Phil (DU)
7	Mr. Md. Mustafa Kamil	Assistant Professor	B.A. (Hons.) 1st Class, (Madina), M.A. 1st Class (DIU) Post Graduate Digree 1st Class in Arabic (Riyadh)
8	Mr. Harunur Rashid	Assistant Professor	B.A. (Hons.), M.A. (DU) Diploma in Higher Islamic Learning (DIU)
9	Mr. Ali Hossain	Assistant Professor	MM 1st Class, BA (Hons) 1st Class 1st (Gold Medal) M.A. 1st Class 1st (Gold Medal) (IIUC)
10	Mr. Shafiqur Rahman	Assistant Professor	B.A. (Hons.) 1st Class 1st With Academic Distinction (Al- Azhar). M.A. 1st Class 1st (IIUM)
11	Mr. Md. Moin Uddin	Assistant Professor	B.A. (Hons.) M.A. (Al- Azhar)
12	Mr. Arif Billah	Lecturer	B.S.S.(Hons.) 1st Class 2nd , M.S.S in Economics 1st Class 2nd (IUK)
13	Dr. Ibrahim Bin Naser Al- Homoud	Professor (Visiting) K.S.A	
14	Sk. Ahmad Fawji Ibrahim	Lecturer (Visiting) Egyptian	B.A. (Hons.) (Al- Azhar) M.A. (IIUC)
15	Sk. Sayed Ahmad Zunaidi	Lecturer (Visiting) Egyptian	B.A. (Hons.) M.A (Al- Azhar)
16	Sk. Rajaee Tamim	Lecturer (Visiting) Egyptian	B.A. (Hons.) M.A (Al- Azhar)

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলমিক স্টাডিজ বিভাগ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম একদল কুর'আন বিশেষজ্ঞ তৈরী করা।
- প্রাচ্যবিদ ও সংশয়বাদীদের ইসলাম বিষয়ক অপপ্রচার অপনোদনের জন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
- প্রযুক্তির যুগে কুর'আনের অমিয়বাণী প্রচারের জন্য উদ্ভাবিত আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদান করা।
- বিজ্ঞানের দিক নির্দেশনা সম্বলিত আয়াতের আলোকে জ্ঞানের ইসলামী করণের জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করা।
- আল-কুর'আনের অলৌকিকতা প্রমাণের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান সমৃদ্ধ যোগ্য, দক্ষ ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা।

বৈশিষ্ট্য

- ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞানের সুন্দর সমন্বয়।
- ইংরেজী ও কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক।
- অনুষদের নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ।
- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সোসাইটির মাধ্যমে মেধা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ।
- উচ্চ শিক্ষিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষকবৃন্দের আন্তরিকতাপূর্ণ তত্ত্বাবধানে পড়াশুনার পরিবেশ।
- রাজনৈতিক কোলাহল মুক্ত ক্যাম্পাস।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষায় অধ্যয়নের সুযোগ।
- আরবীতে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আধুনিক পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের ব্যবস্থা।
- মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।

ডিগ্রী সমূহঃ

অত্র বিভাগে বর্তমানে ৪ বছরের বি.এ. (অনার্স) ডিগ্রীর পাশাপাশি মস্টার্স ডিগ্রী চালু রয়েছে। পর্যায়ক্রমে এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম খোলা হবে।

সিলেবাসঃ

বিভাগীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রয়াস একটি যুগোপযোগী সমৃদ্ধ সিলেবাস প্রণীত হয়। এতে বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সিলেবাসের নির্যাস প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নে সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলঃ

আল-কুর'আনের অলৌকিকতা।	বর্তমান মুসলিম বিশ্ব।	কুর'আনিক বিজ্ঞান।
আল-কুর'আন ও প্রাচ্য বিশারদগণ।	বিষয় ভিত্তিক তাফসীর।	ইসলামী অর্থনীতি।
কুর'আনিক আইন।	কম্পিউটার কোর্স।	তুলনামূলক তাফসীর।
আল-কুর'আনের আধুনিক তাফসীর।	আল-কুর'আন ও আধুনিক বিজ্ঞান।	ইংরেজী ভাষা।

ভর্তির যোগ্যতাঃ

বি.এ অনার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য কমপক্ষে ২য় শ্রেণীতে আলিম পাশ হতে হবে এবং মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৪ বছরের বি.এ অনার্স বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। উল্লেখ্য, শিক্ষা বিরতি এবং কামিল পরীক্ষার পরও অনার্সে ভর্তির সুযোগ আছে।

সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্রঃ

শরীয়াহ্ অনুষদের অধীনে যে কোন বিভাগের অনার্স (সম্মান) ডিগ্রীধারী বা মাস্টার্স ডিগ্রীধারী চাকুরীর জন্য বাংলাদেশের সরকারী/বেসরকারী যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (যেমন বি.সি.এস, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্‌রাসা ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগঃ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাথে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ রয়েছে। বর্তমানে অত্র বিভাগের বহু ছাত্র বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছে।

স্কলারশীপ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানঃ

- অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় শরীয়াহ্ অনুষদের কোর্স ফি, বেতন ও অন্যান্য খরচাদি অত্যন্ত কম।
- জিপিএ-৫ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্মান জনক মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা।
- গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা।
- অত্র বিভাগে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় ৪.০০ থেকে ৩.৫০ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পয়েন্ট অনুসারে বৃত্তি প্রদান। হাফেজে কুর'আন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাসিক বৃত্তি প্রদান।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমঃ

প্রতি সেমিস্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা তথা বাংলা-আরবী-ইংরেজি বিতর্ক, বক্তৃতা, কুইজ, কবিতা, আবৃত্তি, ক্বিরাত ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

- ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশ ও বিনোদনের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা।
- গবেষণাধর্মী বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
- আরবী ও বাংলা দেয়ালিকা বের করা হয়।

মহিলা শাখাঃ

ধর্মপ্রাণ ও পর্দানশীন আগ্রহী মহিলাদের জন্য আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের বিশেষ সুযোগ। নারীদের মাঝে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও শাশ্বত দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একদল বিশেষজ্ঞ মহিলা ও দায়ী ইলাল্লাহ। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এ কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলমিক স্টাডিজ বিভাগে মহিলা শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

Dept. of Qur'anic Sciences and Islamic Studies (QSIS)

Hon'ble Teachers

Mr. Md. Shafi Uddin
Associate Prof. & Head

Prof. Dr. Abu Bakr Rafique
Pro.VC

Prof. Dr. A.K.M Abdul Kader
Dean, Faculty of Shariah

Dr. Ibrahim Bin Naser Al- Homoud
Professor, K.S.A

Prof. Dr. M. Gias Uddin Hafiz
Professor

Mr. Kazi Deen Mohammad
Associate Professor

Dr. Muhammad Siraj Uddin
Assistant Professor

Mr. Md. Rashid Zahid
Assistant Professor

Mr. Md. Mustafa Kamil
Assistant Professor

Dept. of Qur'anic Sciences and Islamic Studies (QSIS)

Hon'ble Teachers

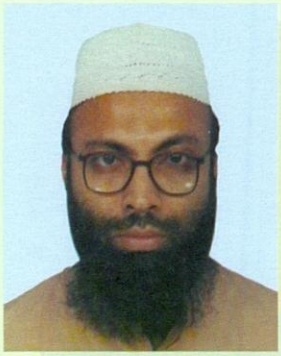

Mr. Harunur Rashid
Assistant Professor

Mr. Ali Hossain
Assistant Professor

Mr. Shafiqur Rahman
Assistant Professor

Mr. Md. Moin Uddin
Assistant Professor

Mr. Arif Billah
Lecturer

Sk. Ahmad Fawji Ibrahim
Lecturer, Egyptian

Sk. Sayed Ahmad Zunaidi
Lecturer, Egyptian

Sk. Rajaee Tamim
Lecturer, Egyptian

Qur'anic Science Cultural Club (QSCC) Committee

Md. Sohail Saleh
President

Md. Aflatun Kowser
Secretary

Khaled Morshed
Education & Training

Asim Billah
Cultural Secretary

Md. Ershadur Rahman
Finance Secretary

Tajul Islam
Sports Secretary

Sana Ullah
Office Secretary

আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত
'অগ্রদূত' এর সফলতা কামনা করছি

মোঃ ফখরউদ্দীন

ভাল পোশাক আপন
ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সহায়ক ....

Nilambori
Sanmar Ocean City
নীলাম্বরী

Shope No : 214/215; Mobile : **01819 632503**

Allama Abul Khair Foundation
(Charitable Humanitarian Foundation)

مؤسسة العلامة أبو الخير
للأعمال الخيرية والإنسانية

Permanent Address
Parwa para, Anwara, Chittagong
Corporate Office
107/Masjid Market Anderkilla, Chittagong.
Phone : +88-031-2850557; Mobile : +88-01711152226
E-mail : aakfoundation@gmail. com; Web : www.aakfoundation.webs.com

QSIS বিভাগের 'নকীবা' স্মারক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন **IIUC**-এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মাহবুব উল্লাহ। পাশে উপস্থিতির একাংশ।

QSIS বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের আনন্দঘন মুহূর্ত।

QSIS বিভাগের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান'১০ এ বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় প্রধান জনাব মুহাম্মদ শাফী উদ্দীন মাদানী।

QSIS বিভাগের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান'১০ এ প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দিন হাফিজ স্যার পুরস্কার বিতরণ করছেন।

QSIS বিভাগের সেন্টমার্টিন শিক্ষা সফরের একটি দৃশ্য।

دخول عام وخروج عام

عبد الولي علي، صومالي

الحمد لله الذى جعل في اختلاف الليل والنهار تبصرة لأولي الألباب وذكرا ، وجعل هذه الدار مجازا تفضي بمن عليها إلى الدار الأخرى، ويسر من شاء من عباده لليسرى، وجنبه العسرى، ويسر مساك الطاعات وسهلها، وجزى علي الحسنة الواحدة عشرا. أما بعد، فإنكم بين عام راحل، لاتدرون بما رحل عنكم ومضى، ولا تعرفون أحصلتم فيه على غضب من الله أم على رضى، وبين عام قابل لاتدرون ما أبرم فيه من القضاء، ولا تعلمون أ في الأجل فسحة ، أم قد بعد وانقضى؟ وإنكم على يقين من سيآت أعمال هي عليكم معدودة، وفي شك من صالحات أعمال أمقبولة هي أم مردودة؟

فعلام الغفلة عن تدارك الخلل؟ كأنكم اتخذتم من الموت عهدا وأمانا، أم لم تنظروا فعله بينكم عيانا. كلا والله لقد أوسع فيكم مجالا، وضرب لكم بأخذ أمتالكم أمثالا، ووعظكم لو اتعظتم فما ترك لقائل مقالا. هذا وكتاب الله يتلى عليكم مساء وصباحا وزواجر عبره تخاطبكم بالنصائح كفاحا، أ سدت الأسماع عن المواعظ؟ أم قست القلوب من كثرة الذنوب فاسودت؟ فاعملوا لما بين أيديكم فلمثل هذا فليعمل العاملون، فلنحرص على الخير الآجل، حرصنا على العاجل ولينقطع قلوبنا عن سنة الغفلة؛ فإنه لاخير في قلب غافل ولنعمل فإننا مجزيون بأعمالنا وإن الله لايضيع عمل عامل. جعلني الله وإياكم ممن فرغ للمواعظ قلبا وسمعا ولم يكن من الآخرين أعمالا الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

الرحلة التربوية

الإعداد : محمد عبيد الله

في أحد الصباح من صباح إبريل سنة ٢٠٠١ م كان الفصل فصل الربيع ، وكان الموسم موسم الخضرة و الجمال ففي أحد أيامه المريحة وموسمه المخضر قد وافقت منظمة "النادي الثقافي "بفتية على رحلة مع أعضائها إلى إحد الغابات أو الحدائق ، رحلة تربوية و إيمانية. وكان معنا مدير المنظمة الأستاذ "محمود الحسن" الأزهري و فضيلة الشيخ الأستاذ مير خليل الرحمن المدني ، يراقبال علينا .فكان ذلك اليوم يوما يلطف فيه الجو وتفتح فيه الأزهار وتورق فيه الأشجار وتغرد فيه الطيور وكان شعاع الشمس الصباية تمتد إلي الحقول و الزارع . فلم تزل السيارة إلى الأمام ز كنا نشاهد منظر القرى والحقول من نافذة الحافلة حتى وصلنا إلى حديقة الحيوان في "ميغلا" وهي حديقة صغيرة لم يعرض فيها إلا عدد قليل من الحيوانات . فشاهدت فيها دبا و ظباء وكثير من القردة ثم من الوحوش الضارية و الحيوانات الأليفة.

وبينما كنا جميعا نشاهد الحيوانات ، اقتربنا من قفص القردة فجأة اختطفت قردة قلنسوتى من فوق راسى و بدأت تلعب بها فيما بينهم فأحيانا يقضمها و يضعها على الرأس و أحيانا يرى إلى الأخرة أما أنا فقد بقيت عادي الرأس و خاجل الوجه . وأما زملائي ؛ فكانوا يحاولون ويبذلون جهودهم قدر المستطاع القلنسوة وإنقاذها من أيديهم .أخيرا وبعد محاولة إستمرت لنصف ساعة من الزمان .استطاع أحد الأصدقاء ان يعيدها . فبذلك وجدت ضالتى المنشودة . فحينئذ فرحت غاية السرور . فحمد الله ربا وشكرت بالصديق أخا .

ثم بعد ذلك أوينا إلى مدرسة "نبدر بأن" الأهلية . وقد مضى أكثر اليوم، وفي الساعة الحادية عشر نحن من النهار ، وكانت الشمس توشك أن تقترب إلى الهزيع الأوسط ، وعرضت صورتها منبقة في صفحة هذا الوجود.فنظرنا إلى المدرسة نظرة عابرة بعدما إسترحنا قليلا . فارتحلنا إلى ضاحية "بندربان "سينبك" ، فسلكنا عقيبة مزقة ملتوية سارية إلى علياء ، وليس بجانبها خباء ولا حقول . فلم نخبر ألا الغابات وسلسلة الأشجار المتنوع . فكلما نصعر إلى الأمام يزداد البعد بيننا و بين الأرضين ، وكان النظر لا يلقى إلا علي الفضاء الصافي والسحب و الطائرة . فيشتد خوفنا حتى أن عجلات السيارة لو انسلت اعن الطريقة تنقض بناء الأرضية وبفضل الله رجعنا إلى البيت سالمين .

---

*الفصل الثالث

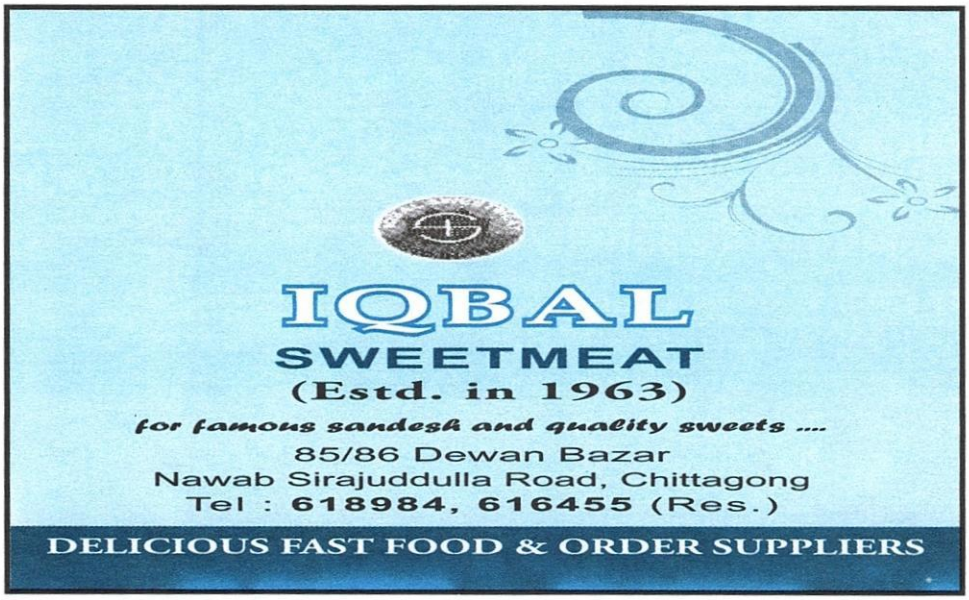

مسئولية الشباب في نشر الوعي الإسلامى

محمد رياض الحق عبد المنان*

من هم الشباب؟ الشباب من العمر ما بين البلوغ إلى الثلاثين وهو القوة الدافعة و راء تيار حياتهم و هو المعتمد لدى كل الاتجاهات ذات الإستراتجية التغييرية. حظ الإسلام من الاعتماد على الشباب ليشهد لنا التاريخ أن الإسلام قد استخدم سن الهمم الموثبة و الدماء الفائرة والآمال العريضة من شبابه في كل عصر و مصر. إن الإسلام قد استفاد من سن الشباب في تحقيق مهماته الصعبة وتذليل عقباته المنيعة. وفي الحقيقة إن صرح الإسلام العظيم قد قام بتضحياتهم في هذه الكرة الأرضية .

فسن الشباب ذات مسئولية وقيمة خاصة لما فيها من قوة البناء وقوة الخير. بسبب ذلك حث النبي – صلى الله عليه وسلم– على اغتنام الشباب بها بقوله: "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغنائك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك." إلام حاجة العالم الإسلامى؟ ما أحوج العالم الإسلامي اليوم إلى الشباب الذى يحمل في ذاته آمال الأمة المسلمة يزهد في حياته الذاتية! ماأحوج العالم الإسلامى اليوم إلى الشباب يستمرون بأدوارهم نحو الأمة المسلمة في إزالة الضعف والهون والتخلف والجمود والأخذ بناصيحتها إلى المجد و الشرف وإلى بر الأمان والسلام! ويعيد فيها الوعي و النهضة لرسالتها السامية ودعوتها البناء إلى دين الله الحنيف وعقيدته الخالصة وشريعته السمحاء.

مسئوليات الشباب الإسلامي

هناك مسؤوليات عديدة على الشباب

أن يكون على بصيرة من الصورة الواضحة للمفاهيم الإسلامية والتعمق في علوم القرآن و السنة لرد ما يبثه الروافض و المنصرون والمستشرقون ضد الإسلام والمسلمين. بذل الجهد المتواصل بشتى الطرق لتصحيح عقيدة الشباب المسلم الذى أصبح فريسة الاستشراق لتثقفه بالثقافة العلمانية اللادينية السائدة في مراكز التعليم والجامعات. القيام برعاية الجيل الناشئ من أخطار المذاهب الهدامة كالشيوعية والاشراكية والرأسمالية ومن فساد المبادئ الخطرة و الأفكار الإلحادية والإباحية. إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات لمناقشة أمورهم ودراسة أحوالهم فيها والقيام بمسؤلية الدعوة بين أقرانهم من المسلمين وغيرهم المثقفين بالثقافة الغربية. القيام بأعمال الدعوة و التعليم والتربية في داخل الجيش ووحداته بالانخراط مع القوات المسلحة لضمان أمن البلاد وسلامتها حسبما يقتضيه الاسلام.

حسن استخدام وسائل الإعلام بشتى أنواعها من المطبعة والإلكترونية في تبليغ رسالة الإسلام ودرء مخاطر التقاليد والعادات الغربية عن الشباب والشابات وتنبئهم إلى مساوئها وأخطارها. العمل الدؤوب للقيام بالجهاد وإعداد أي قوة انطلاقا من قوله تعالى: (وأعدوالهم مااستطعتم من قوة) فتشمل الآية جميع ما تمس الحاجة إليه من الآلات للتغليب علي الخصم والجهاد. القيام بعبادته من خلال عمارة الأرض انطلاقا من قوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)؛ لأن الشباب هم المكلفون بها. كما حث الإسلام أهله على ممارسة العلوم والتكنولوجيا فى وقت وقفت الأديان الأخرى ضده.

أيها الشباب الكريم لاشك في أن مهمتكم هي نقل قيادة الأمة من أيدي جاهلية القرن الحادى والعشرين إلى ظل الإسلام من جديد. وفى الحقيقة هى مهمة صعبة، ولمواجهة تحديات هذا القرن يتطلب منكم التغيير الجذري في جسم المجتمع، وإزالة الفتنة وإخلاص الدين كله لله تعالى، كما في قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله) فعليكم يا شباب المسلمين أن تدركو جسامة المسؤلية، وأن تحملوها بأمانة، وتنهضوا بأعباء الدعوة وتتحملوا المصاعب و المتاعب و تغامروا بنفوسكم وإمكانيا تكم في هذا السبيل إلى أن تعلوا كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلي.

---

*الفصل الخامس

إن العبودية لله أيها الأحباب تعني التجرد من هوى النفس، بل جعل هذا الهوى موافقاً وتبعاً للشرع: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ". إن العبودية ليست كلمة تتكلم بها الألسن فقط، إنما هي تطبيق واقعي وعملي، ما فائدة أن أقول إنيَ عبد الله وقلبي معلق بشهوات زائلة، ما الفائدة أن أدعي العبودية لله تعالى –وهي شرف للعبد– وحياتي مجردة من معاني الحب في الله ورجاء الله، وخشية الله والاستسلام لأمر الله لتحقيق الاستخلاف المقصود في الأرض في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)

يقول شيخ الإسلام: إن الملائكة أفضل من حيث البداية و صالحي البشر أفضل من حيث النهاية. فما المعنى بأن نعاهد الله تعالى على الطاعة والعبودية، وسرعان ما ننقض العهد ونفعل الضد؟ وقد أرشدنا الله تعالى في أكبر سورة محذراً وناهيا من الوقوع في ذلك فقال تعالى: (الذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) فقوله تعالى: (أولئك هم الخاسرون) جملة إسمية مؤكدة بضمير الفصل– هم – وضمير الفصل له ثلاث فوائد: الأولى التوكيد. الثانية: الحصر. الثالثة: إزالة اللبس بين الصفة والخبر. ولذا سمي ضمير فصل — لفصله بين الوصف والخبر، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب.

إن الشيطان قد يأتي الإنسان، فيوسوس له، فيصغر المعصية في عينه؛ ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها، منّاه أن يتوب منها، فيسهل عليه الإقدام؛ ولذلك احذر عدوك أن يغرك.

ما الفائدة وأنا أجزع عند أول مصيبة وأول حادث؟ ودعونا نقولها صريحة: إنه من تعلق قلبه بالدنيا كانت مصائب الدنيا أشد عليه من أن يصاب في دينه. لقد تعلق شباب الأمة اليوم بالتوافه من الأمور، تعلقوا بالمطرب الفلاني، والممثلة الفلانية، وبفريق الكرة الفلاني، وبعضهم قد تعلق بالمركز الفلاني، وبالمنصب الفلاني،وغيرها. ثم يأتي بعض هؤلاء مدعياً محبة الله تعالى وصدق من قال مخاطباً إياهم:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه ... هذا لعمري في القياس شنيع

إن كان حبك صادقاً لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع

إننا بحاجة اليوم إلى أن نجدد إيماننا، ليرضى ربنا عنا فيغير أحوالنا، فإذا أردنا فعلاً لمنهج الله أن يقوم، فلا بد أن نقيمه أولاً في أنفسنا، كما قال الشيخ الشهيد سيد قطب رحمه الله: "أقم دولة الإسلام في قلبك تقم على أرضك".

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

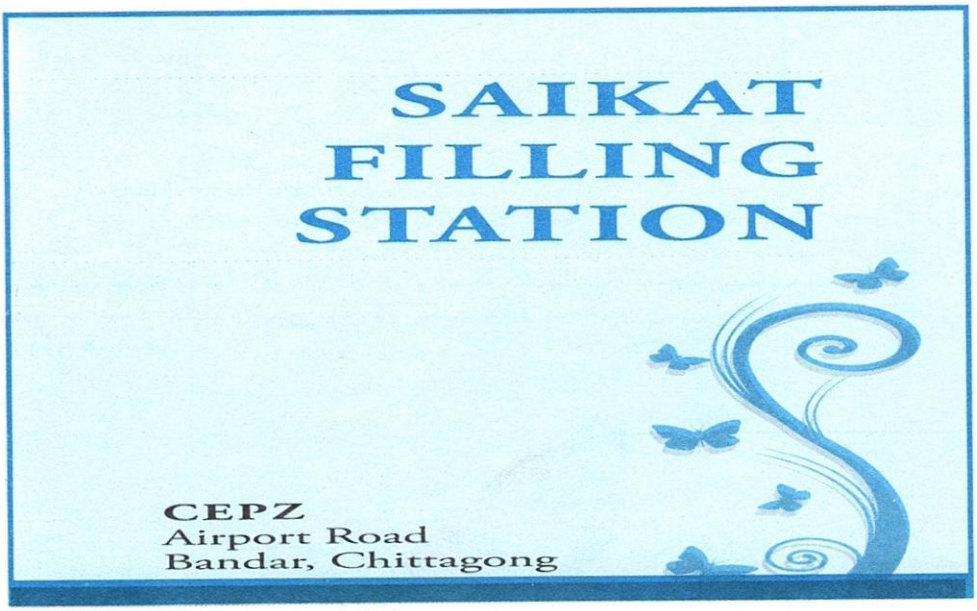

Dept. of Qur'anic Sciences and Islamic Studies (QSIS)

Hon'ble Teachers

Mr. Md. Shafi Uddin
Associate Prof. & Head

Prof. Dr. Abu Bakr Rafique
Pro.VC

Prof. Dr. A.K.M Abdul Kader
Dean, Faculty of Shariah

Dr. Ibrahim Bin Naser Al- Homoud
Professor, K.S.A

Prof. Dr. M. Gias Uddin Hafiz
Professor

Mr. Kazi Deen Mohammad
Associate Professor

Dr. Muhammad Siraj Uddin
Assistant Professor

Mr. Md. Rashid Zahid
Assistant Professor

Mr. Md. Mustafa Kamil
Assistant Professor

Dept. of Qur'anic Sciences and Islamic Studies (QSIS)

Hon'ble Teachers

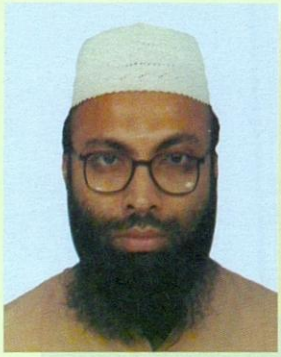

Mr. Harunur Rashid
Assistant Professor

Mr. Ali Hossain
Assistant Professor

Mr. Shafiqur Rahman
Assistant Professor

Mr. Md. Moin Uddin
Assistant Professor

Mr. Arif Billah
Lecturer

Sk. Ahmad Fawji Ibrahim
Lecturer, Egyptian

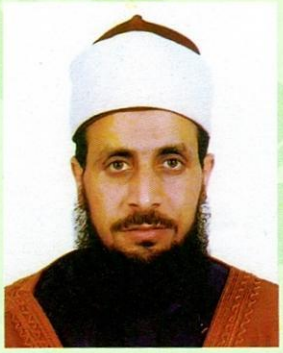

Sk. Sayed Ahmad Zunaidi
Lecturer, Egyptian

Sk. Rajaee Tamim
Lecturer, Egyptian

Qur'anic Science Cultural Club (QSCC) Committee

Md. Sohail Saleh
President

Md. Aflatun Kowser
Secretary

Khaled Morshed
Education & Training

Asim Billah
Cultural Secretary

Md. Ershadur Rahman
Finance Secretary

Tajul Islam
Sports Secretary

Sana Ullah
Office Secretary

আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত
'অগ্রদূত' এর সফলতা কামনা করছি

মোঃ ফখরউদ্দীন

ভাল পোশাক আপন
ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সহায়ক ....

Nilambori
Sanmar Ocean City
নীলাম্বরী

Shope No : 214/215; Mobile : **01819 632503**

Allama Abul Khair Foundation
(Charitable Humanitarian Foundation)

مؤسسة العلامة أبو الخير
(للأعمال الخيرية والإنسانية)

Permanent Address
Parwa para, Anwara, Chittagong
Corporate Office
107/Masjid Market Anderkilla, Chittagong.
Phone : +88-031-2850557; Mobile : +88-01711152226
E-mail : aakfoundation@gmail. com; Web : www.aakfoundation.webs.com

QSIS বিভাগের 'নকীবা' স্মারক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন **IIUC**-এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মাহবুব উল্লাহ। পাশে উপস্থিতির একাংশ।

QSIS বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের আনন্দঘন মুহূর্ত।

QSIS বিভাগের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান'১০ এ বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় প্রধান জনাব মুহাম্মদ শাফী উদ্দীন মাদানী।

QSIS বিভাগের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান'১০ এ প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দিন হাফিজ স্যার পুরস্কার বিতরণ করছেন।

QSIS বিভাগের সেন্টমার্টিন শিক্ষা সফরের একটি দৃশ্য।

دخول عام وخروج عام

عبد الولي علي، صومالي

الحمد لله الذى جعل في اختلاف الليل والنهار تبصرة لأولي الألباب وذكرا ، وجعل هذه الدار مجازا تفضي بمن عليها إلى الدار الأخرى، ويسر من شاء من عباده لليسرى، وجنبه العسرى، ويسر مساك الطاعات وسهلها، وجزى علي الحسنة الواحدة عشرا. أما بعد، فإنكم بين عام راحل، لاتدرون بما رحل عنكم ومضى، ولا تعرفون أحصلتم فيه على غضب من الله أم على رضى، وبين عام قابل لاتدرون ما أبرم فيه من القضاء، ولا تعلمون أ في الأجل فسحة ، أم قد بعد وانقضى؟ وإنكم على يقين من سيآت أعمال هي عليكم معدودة، وفي شك من صالحات أعمال أمقبولة هي أم مردودة؟

فعلام الغفلة عن تدارك الخلل؟ كأنكم اتخذتم من الموت عهدا وأمانا، أم لم تنظروا فعله بينكم عيانا. كلا والله لقد أوسع فيكم مجالا، وضرب لكم بأخذ أمتالكم أمثالا، ووعظكم لو اتعظتم فما ترك لقائل مقالا. هذا وكتاب الله يتلى عليكم مساء وصباحا وزواجر عبره تخاطبكم بالنصائح كفاحا، أ سدت الأسماع عن المواعظ؟ أم قست القلوب من كثرة الذنوب فاسودت؟ فاعملوا لما بين أيديكم فلمثل هذا فليعمل العاملون، فلنحرص على الخير الآجل، حرصنا على العاجل ولينقطع قلوبنا عن سنة الغفلة؛ فإنه لاخير في قلب غافل ولنعمل فإننا مجزيون بأعمالنا وإن الله لايضيع عمل عامل. جعلني الله وإياكم ممن فرغ للمواعظ قلبا وسمعا ولم يكن من الآخرين أعمالا الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

الرحلة التربوية

الإعداد : محمد عبيد الله

في أحد الصباح من صباح إبريل سنة ٢٠٠١ م كان الفصل فصل الربيع ، وكان الموسم موسم الخضرة و الجمال ففي أحد أيامه المريحة وموسمه المخضر قد وافقت منظمة "النادي الثقافي "بفتية على رحلة مع أعضائها إلى إحد الغابات أو الحدائق ، رحلة تربوية و إيمانية. وكان معنا مدير المنظمة الأستاذ "محمود الحسن" الأزهري و فضيلة الشيخ الأستاذ مير خليل الرحمن المدني ، يراقبال علينا .فكان ذلك اليوم يوما يلطف فيه الجو وتفتح فيه الأزهار وتورق فيه الأشجار وتغرد فيه الطيور وكان شعاع الشمس الصباية تمتد إلي الحقول و الزارع . فلم تزل السيارة إلى الأمام ز كنا نشاهد منظر القرى والحقول من نافذة الحافلة حتى وصلنا إلى حديقة الحيوان في "ميغلا" وهي حديقة صغيرة لم يعرض فيها إلا عدد قليل من الحيوانات . فشاهدت فيها دبا و ظباء وكثير من القردة ثم من الوحوش الضارية و الحيوانات الأليفة.

وبينما كنا جميعا نشاهد الحيوانات ، اقتربنا من قفص القردة فجأة اختطفت قردة قلنسوتى من فوق راسى و بدأت تلعب بها فيما بينهم فأحيانا يقضمها و يضعها على الرأس و أحيانا يرى إلى الأخرة أما أنا فقد بقيت عادي الرأس و خاجل الوجه . وأما زملائي ؛ فكانوا يحاولون ويبذلون جهودهم قدر المستطاع القلنسوة وإنقاذها من أيديهم .أخيرا وبعد محاولة إستمرت لنصف ساعة من الزمان .استطاع أحد الأصدقاء ان يعيدها . فبذلك وجدت ضالتى المنشودة . فحينئذ فرحت غاية السرور . فحمد الله ربا وشكرت بالصديق أخا .

ثم بعد ذلك أوينا إلى مدرسة "نبدر بأن" الأهلية . وقد مضى أكثر اليوم، وفي الساعة الحادية عشر نحن من النهار ، وكانت الشمس توشك أن تقترب إلى الهزيع الأوسط ، وعرضت صورتها منبقة في صفحة هذا الوجود.فنظرنا إلى المدرسة نظرة عابرة بعدما إسترحنا قليلا . فارتحلنا إلى ضاحية "بندربان "سينبك" ، فسلكنا عقيبة مزقة ملتوية سارية إلى علياء ، وليس بجانبها خباء ولا حقول . فلم نخبر ألا الغابات وسلسلة الأشجار المتنوع . فكلما نصعر إلى الأمام يزداد البعد بيننا و بين الأرضين ، وكان النظر لا يلقى إلا علي الفضاء الصافي والسحب و الطائرة . فيشتد خوفنا حتى أن عجلات السيارة لو انسلت اعن الطريقة تنقض بناء الأرضية وبفضل الله رجعنا إلى البيت سالمين .

---

*الفصل الثالث

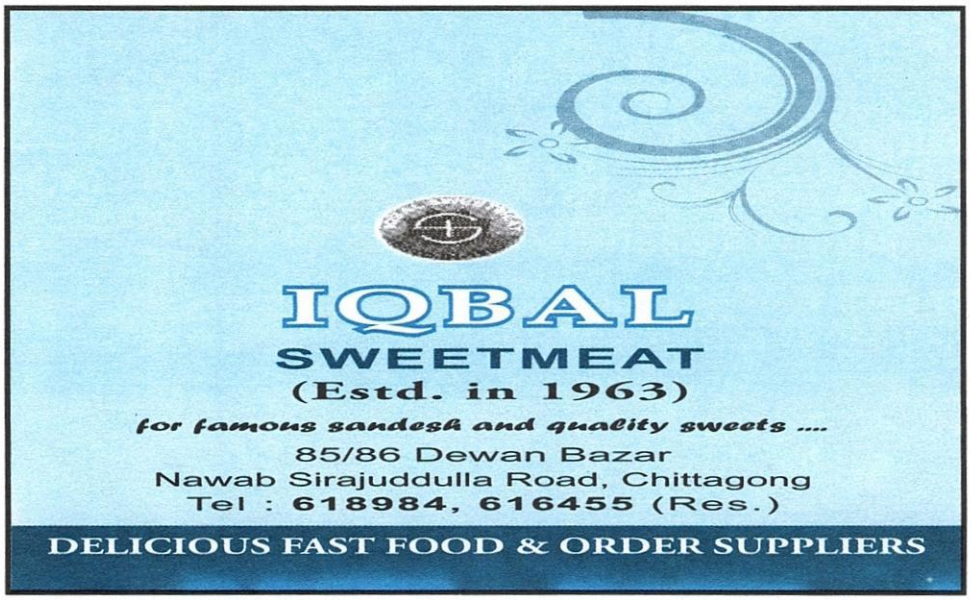

مسئولية الشباب في نشر الوعي الإسلامى

محمد رياض الحق عبد المنان*

من هم الشباب؟ الشباب من العمر ما بين البلوغ إلى الثلاثين وهو القوة الدافعة و راء تيار حياتهم و هو المعتمد لدى كل الاتجاهات ذات الإستراتجية التغييرية. حظ الإسلام من الاعتماد على الشباب ليشهد لنا التاريخ أن الإسلام قد استخدم سن الهمم الموثبة و الدماء الفائرة والآمال العريضة من شبابه في كل عصر و مصر. إن الإسلام قد استفاد من سن الشباب في تحقيق مهماته الصعبة وتذليل عقباته المنيعة. وفي الحقيقة إن صرح الإسلام العظيم قد قام بتضحياتهم في هذه الكرة الأرضية .

فسن الشباب ذات مسئولية وقيمة خاصة لما فيها من قوة البناء وقوة الخير. بسبب ذلك حث النبي – صلى الله عليه وسلم– على اغتنام الشباب بها بقوله: "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغنائك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك." إلام حاجة العالم الإسلامى؟ ما أحوج العالم الإسلامي اليوم إلى الشباب الذى يحمل في ذاته آمال الأمة المسلمة يزهد في حياته الذاتية! ماأحوج العالم الإسلامى اليوم إلى الشباب يستمرون بأدوارهم نحو الأمة المسلمة في إزالة الضعف والهون والتخلف والجمود والأخذ بناصيحتها إلى المجد و الشرف وإلى بر الأمان والسلام! ويعيد فيها الوعي و النهضة لرسالتها السامية ودعوتها البناء إلى دين الله الحنيف وعقيدته الخالصة وشريعته السمحاء.

مسئوليات الشباب الإسلامي

هناك مسؤوليات عديدة على الشباب

أن يكون على بصيرة من الصورة الواضحة للمفاهيم الإسلامية والتعمق في علوم القرآن و السنة لرد ما يبثه الروافض و المنصرون والمستشرقون ضد الإسلام والمسلمين. بذل الجهد المتواصل بشتى الطرق لتصحيح عقيدة الشباب المسلم الذى أصبح فريسة الاستشراق لتثقفه بالثقافة العلمانية اللادينية السائدة في مراكز التعليم والجامعات. القيام برعاية الجيل الناشئ من أخطار المذاهب الهدامة كالشيوعية والاشراكية والرأسمالية ومن فساد المبادئ الخطرة و الأفكار الإلحادية والإباحية. إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات لمناقشة أمورهم ودراسة أحوالهم فيها والقيام بمسؤلية الدعوة بين أقرانهم من المسلمين وغيرهم المثقفين بالثقافة الغربية. القيام بأعمال الدعوة و التعليم والتربية في داخل الجيش ووحداته بالانخراط مع القوات المسلحة لضمان أمن البلاد وسلامتها حسبما يقتضيه الاسلام.

حسن استخدام وسائل الإعلام بشتى أنواعها من المطبعة والإلكترونية في تبليغ رسالة الإسلام ودرء مخاطر التقاليد والعادات الغربية عن الشباب والشابات وتنبئهم إلى مساوئها وأخطارها. العمل الدؤوب للقيام بالجهاد وإعداد أي قوة انطلاقا من قوله تعالى: (وأعدوالهم مااستطعتم من قوة) فتشمل الآية جميع ما تمس الحاجة إليه من الآلات للتغليب علي الخصم والجهاد. القيام بعبادته من خلال عمارة الأرض انطلاقا من قوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)؛ لأن الشباب هم المكلفون بها. كما حث الإسلام أهله على ممارسة العلوم والتكنولوجيا فى وقت وقفت الأديان الأخرى ضده.

أيها الشباب الكريم لاشك في أن مهمتكم هي نقل قيادة الأمة من أيدي جاهلية القرن الحادى والعشرين إلى ظل الإسلام من جديد. وفى الحقيقة هى مهمة صعبة، ولمواجهة تحديات هذا القرن يتطلب منكم التغيير الجذري في جسم المجتمع، وإزالة الفتنة وإخلاص الدين كله لله تعالى، كما في قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله) فعليكم يا شباب المسلمين أن تدركو جسامة المسؤلية، وأن تحملوها بأمانة، وتنهضوا بأعباء الدعوة وتتحملوا المصاعب و المتاعب و تغامروا بنفوسكم وإمكانيا تكم في هذا السبيل إلى أن تعلوا كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلي.

---

*الفصل الخامس

إن العبودية لله أيها الأحباب تعني التجرد من هوى النفس، بل جعل هذا الهوى موافقاً وتبعاً للشرع: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ". إن العبودية ليست كلمة تتكلم بها الألسن فقط، إنما هي تطبيق واقعي وعملي، ما فائدة أن أقول إنيَ عبد الله وقلبي معلق بشهوات زائلة، ما الفائدة أن أدعي العبودية لله تعالى –وهي شرف للعبد– وحياتي مجردة من معاني الحب في الله ورجاء الله، وخشية الله والاستسلام لأمر الله لتحقيق الاستخلاف المقصود في الأرض في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)

يقول شيخ الإسلام: إن الملائكة أفضل من حيث البداية و صالحي البشر أفضل من حيث النهاية. فما المعنى بأن نعاهد الله تعالى على الطاعة والعبودية، وسرعان ما ننقض العهد ونفعل الضد؟ وقد أرشدنا الله تعالى في أكبر سورة محذراً وناهيا من الوقوع في ذلك فقال تعالى: (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) فقوله تعالى: (أولئك هم الخاسرون) جملة إسمية مؤكدة بضمير الفصل– هم – وضمير الفصل له ثلاث فوائد: الأولى التوكيد. الثانية: الحصر. الثالثة: إزالة اللبس بين الصفة والخبر. ولذا سمي ضمير فصل — لفصله بين الوصف والخبر، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب.

إن الشيطان قد يأتي الإنسان، فيوسوس له، فيصغر المعصية في عينه؛ ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها، منّاه أن يتوب منها، فيسهل عليه الإقدام؛ ولذلك احذر عدوك أن يغرك.

ما الفائدة وأنا أجزع عند أول مصيبة وأول حادث؟ ودعونا نقولها صريحة: إنه من تعلق قلبه بالدنيا كانت مصائب الدنيا أشد عليه من أن يصاب في دينه. لقد تعلق شباب الأمة اليوم بالتوافه من الأمور، تعلقوا بالمطرب الفلاني، والممثلة الفلانية، وبفريق الكرة الفلاني، وبعضهم قد تعلق بالمركز الفلاني، وبالمنصب الفلاني،وغيرها. ثم يأتي بعض هؤلاء مدعياً محبة الله تعالى وصدق من قال مخاطباً إياهم:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه ... هذا لعمري في القياس شنيع

إن كان حبك صادقاً لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع

إننا بحاجة اليوم إلى أن نجدد إيماننا، ليرضى ربنا عنا فيغير أحوالنا، فإذا أردنا فعلاً لمنهج الله أن يقوم، فلا بد أن نقيمه أولاً في أنفسنا، كما قال الشيخ الشهيد سيد قطب رحمه الله: "أقم دولة الإسلام في قلبك تقم على أرضك".

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

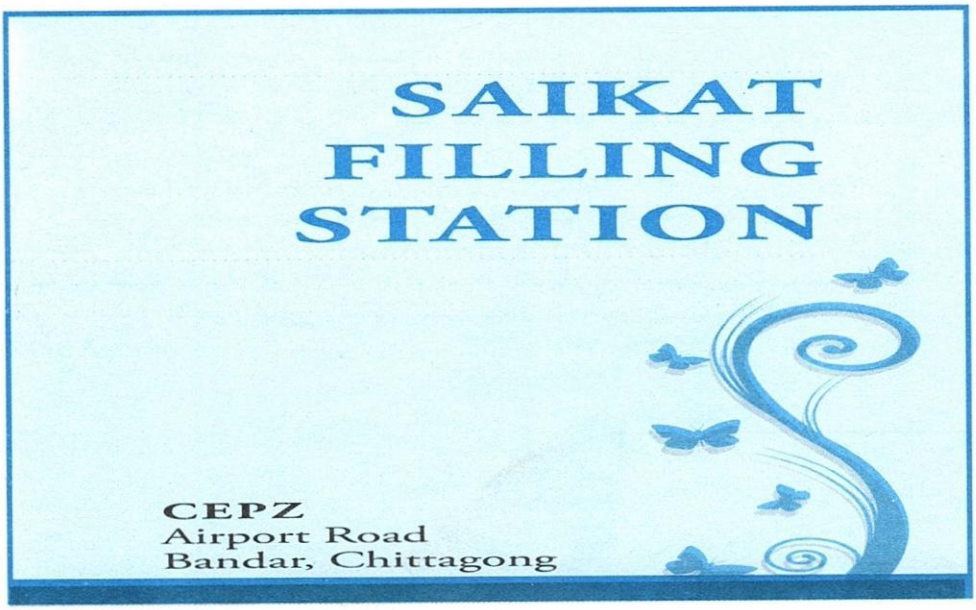

الإنسان المعاصر والعبودية

السيد أحمد الجنيدي أحمد*

إن ما تمر به الأمة اليوم من مصائب وشدائد وهزائم، إنما هو بسبب ابتعادها عن المنهل الصافي،والمعين الكافي عن كتاب ربها وسنة نبيها – صلى الله عليه وسلم– لذا كان لا بد لكل مسلم من وقفة إيمانية صادقة نحاسب فيها أنفسنا، ونتحسس نقاط الضعف ونقف أمامها؛ لكي نحاول محاولة الجاد المتوكل على الله أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله حالنا وتنهض أمتنا.

لا شك في أن الله تعالى لم يخلق المخلوقات بصفة عامة، والإنس والجان بصفة خاصة عبثاً وإنما خلقه لغاية نبيلة، ومهمة عظيمة. قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) وقال تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)

إذن فالغاية من خلق الجن والإنسان العبادة، والعبادة اسم جامع شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة منها والباطنة، وحتى تكون العبادة مقبولة ينبغي أن يتوافر فيها ركنان، وشرط، أما الركنان فهما:

١_ إخلاص النية لله تعالى لقوله جل جلاله: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) وتكون إخلاص النية لله تعالى بتوجيه العمل لله تعالى ونسب الفضل له في أن وفق العبد لهذا العمل وعدم إرادة المخلوقين بهذا العمل.

٢_ اتباع النبي– صلى الله عليه وسلم– لقوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

فلا يجوز مخالفة هدي النبي –صلى الله عليه وسلم– ولا ينفع إخلاص بغير اتباع، ولا ينفع اتباع بغير إخلاص.

أما الشرط فهو: الاعتزاز والافتخار بالعبودية: إذ أن العبودية شرف للإنسان إذ بها يتساوى العبد بالملائكة الأبرار والأنبياء الكرام. ومعلوم أن العبودية لله توجب على العبد الاتصال الوثيق بالله تعالى، بحيث لا يرد العبد لله أمراً، بل تصبح نفسه نذراً لله تعالى، فهو يعيش لله ويمشي في الله ويذبح لله ويُقتل في سبيل الله مصداقا لقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) حياة متصلة بالله تبارك وتعالى.

إنها العبودية التي تُلزم العبد أن يقول: {وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}

لا معنى حقيقي للعبودية من غير عبادة واستسلام وانقياد للمعبود وهو الله جل جلاله لا معبود بحق في الكون إلا هو تعالى.إن العبد المسلم يستشف مظاهر هذه العبودية ويعبر عنها بالسجود للواحد الأحد ويعلمها علم اليقين عندما يدعو بارئه تبارك وتعالى قائلاً: "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك".

انظر– رحمك الله– إلى معاني العبودية والانقياد والاستسلام والإيمان بقضاء الله والتسليم بحكم الله.

دعونا– أيها الأحباب– أن نعرج بكم قليلا لنرى أمثلة من حياة الصحابة– رضوان الله عليهم– لنرى كيف كان الواحد منهم يطبق العبودية حق التطبيق. فهذا الصديق– رضي الله عنه– يخرج ماله كله في سبيل الله، وهذا عثمان –رضي الله عنه– يجهز جيش العسرة، وهذا عمرو بن الجموح يأبى أن يتخلف عن الجهاد وهو صاحب العذر قائلاً: "لأطئن بعرجتي هذه الجنة" هكذا هم الرجال الذين عرفوا معنى العبودية لله والأمثلة كثيرة تضيق عن الحصر.

---

*محاضر بقسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية

النبوية الشريفة. وقد نهى الإسلام عن الإسراف لمافيه من أضرار، وهو سلوك يتعدى الحدود المعقولة، قال تعالى: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) [الإسراء: ٢٩] وقال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف : ٣١]

وإذا نظرنا إلى هَذا الأمر من زاوية التَربية البيئية الإسلامية لوجدنا إن الاستخدام الجائر للموارد البيئية التي سخر الله لنا هو سلوك ضار وخطير على هذه الموارد؛ لأنه يستنزفها. والنتائج السلبية لهذا السلوك الجائر سببت الكثير من المشكلات البيئية، مثل: تلوث التربة والهواء والتدمير التدريجي لطبقة الأوزان والتغيرات المناخية، وقطع الأشجار وإزالة الغابات، وانقراض بعض الأنواع النباتية والحيوانية، ومشكلة التصحر وغيرها من المشاكل.

إن عالم اليوم عرضة لخطر نفاد الموارد البيئية والطبيعية ومعرض إلى خطر النفايات الصناعية والذرية، كل ذلك يشكل أزمة أخلاقية، ولا يجوز للمسلم أن يظل مكتوف الأيدي حيال هذا الاستنزاف السائد، بل له أن يتدبر أمره ويلتزم بحماية البيئة بنبع من إيمانه بخالقه، ويجب عليه أن يغير أسلوب حياته ومعيشته ليحافظ على النظام البيئي الذي يعيش فيه، وينعم بمصادره وخيراته. إن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية هما من واجبات الفرد والمجتمع، وديننا الإسلامي الحنيف يدعونا إلى النظافة للحفاظ على الأرض نظيفة والهواء نقيا والماء صافيا . ويقصد بالتربية البيئية الإسلامية وضع منهج وسياسات تعليمية تهدف إلى خلق كوادر قادرة على فهم مقومات النظام البيئي الذي خلقه المولى عز وجل، وأمرنا أن نحافظ عليه، ولا نسرف في استنزاف موارده والتعامل مع القضايا والمشكلات البيئية المختلفة من خلال طرق وأساليب علمية وتربوية سليمة يكون للتعاليم الإسلامية دور فعال في نصح فعال وإرشاد المسلم.

ولا بد من وضع استراتيجية للتربية البيئية الإسلامية بحيث تتعامل أهداف برنامج تعليمي بيئي مع كافة المراحل التعليمية، من مراحل التعليم قبل الأساسي حتى التعليم الجامعي، ويجب أن يكون نتاج هذه الاستراتيجية إدراكا كاملا لمفاهيم ومباديء القضايا والمشكلات البيئية.

التربية البيئية في الإسلام

محمد معين الدين*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد اهتم الدين الإسلامي الحنيف بالتربية اهتماما كبيرا، وقد راعت تعاليمه الكريمة أن تكون التربية البيئية شاملة بكل جوانب الحياة الطبيعية والإنسانية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كما حرص الإسلام على أن تكون التربية الإسلامية عملية مستمرة على مدى حياة المسلم، سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في الحياة عموما. ويجب أن تكون التربية البيئية الإسلامية متعددة الأساليب ومتداخلة المعارف، ويجب أيضا أن تشجع المشاركة الفعالة في معالجة مشاكل البيئة ووضع المزيد منها في الحسبان، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تربية المسلم على حسن استخدام الطريق، ومنع الأذى والضرر عنه، فقد أرشد الرسول – صلى الله عليه وسلم– المسلمين إلى نظافة الطريق، ورفع الأذى عنه في كثير من أحاديثه الشريفة:
" إماطة الأذى عن الطريق صدقة". و"الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة ، أدناها إماطة الأذى عن الطريق". و"من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة".
و"إن المؤمن ليؤجر في إماطة الأذى عن الطريق".
كل هذه الأحاديث النبوية الشريفة تربي المسلم وتغرس فيه سلوكا بيئيا إسلاميا عن رفع الأذى بكل أنواعه عن الطريق، وصيانته والحفاظ عليه كجزء أساسي من البيئة المحيطة من حولنا.
كما أن هذه الأحاديث جعلت إماطة الأذى عن الطريق بكل أشكاله المادية والمعنوية، عبادة فرض عين على كل مسلم، والمقصود بالأذى ما يضر بالطريق ويشوه منظره وجماله ونظافته ويعيق استعماله ويتسبب في وقوع الحوادث أو إرباك المرور، أو إلقاء القاذورات والمخلفات. فكل ذلك يعتبر من أنواع الأذى؛ لأنه يسبب تلوث البيئة.
إن إشغال الطريق أو جزء منه و أرصفته المخصصة للسير، يجبر المشاة على السير في عرض الطريق ويجعلهم عرضة للحوادث، يعتبر أيضا نوعا من أنواع الأذى الذي يجب على المسلم ألا يتسبب فيه، ويجب عليه أن يزيله.
إن معالجة القضايا البيئية من وجهة النظر الإسلامية مع إعطاء قدر كاف من النصح الإسلامي المدعم بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، يرشح في عقل المسلم السلوك البيئي الحسن، ويجب أن يكون للدعاة من خطباء المساجد دور كبير في النصح والتوجيه من خلال خطبهم ودروسهم، ويمكن تدعيم المناهج والمقررات البيئية في المراحل التعليمية المختلفة بالمنهج الإسلامي الرشيد، والذي يلزم المسلم بالسلوك البيئي القويم الذي يحمي البيئة ويحافظ عليها.
وقد اهتم الدين الإسلامي الحنيف بالبيئة ومواردها المختلفة حية أم كانت غير حية، وأرسى الأسس والتعاليم للتعامل مع هذه الموارد والمصادر البيئية وصيانتها والحفاظ عليها، وقد جعل الخالق سبحانه وتعالى الإنسان خليفته في الأرض ليدير مواردها ومصادرها وخيراتها ويتصرف فيها تصرفا حسنا. قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ) [فاطر : ٣٩]
وقد نزّل القرآن الكريم على سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – ليكون نبراسا شاملا ينير للإنسان حياته وآخرته، ويرتقي به لصلاح دنياه وآخرته. قال تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام : ٣٨]
وأوضح الخالق جل وعلا لعباده كيف خلق الكون، وكيف يسيره على أكمل وجه، وكيف سخر للإنسان السماء ليسقي أرضه وزرعه بالغيث وسخر له البحر، ليأكل منه لحما طريا وخلق الأنعام فيها للإنسان فوائد ومنافع جم، ولكن الإنسان استغل كل هذه المصادر والموارد البيئية التي أعطاها وسخرها له الخالق سبحانه وتعالى واستنزفها بلا حكمة و دون حساب خلافا لما أقره تعالى في كتابه العزيز، وأوصى به الرسول – صلى الله عليه وسلم – في سنته

---

*الأستاذ المساعد بقسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية

مجالات التفكر والاعتبار

ينبغي أن نعرف أن مجالات التفكر والاعتبار هي كل ما سوى الله تعالى مما عرفناه أو سمعنا عنه أو خطر ببالنا. فقد أمرنا الله تعالى بالتفكر في مخلوقاته والاعتبار بها في آيات عديدة من القرآن الكريم. ولكن ذات الله تعالى وصفاته خارجتان عن نطاق التفكر والاعتبار؛ حيث إنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى كنهه تعالى، والدليل على ذلك ما أورده الهيثمي في باب التفكر في الله تعالى: "عن ابن عمر –رضي الله تعالى عنهما– قال: قال رسول الله– صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله." رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو متروك.

ولكن ينبغي التفكر في عجائب الكون والاعتبار بالسابقين للاستدلال على وجود الله تعالى، وكونه صانع الكون وموصوفا بصفات الكمال من قدرة وعلم وغيرهما من الصفات– أي صفة الوجوب والصفات السلبية وصفات المعاني– كما هو معلوم في علم العقائد. والتفكر في المخلوقات والاعتبار بها يوجب الإقرار باتصاف الله تعالى بجميع صفات الكمال. والتفكر المحظور إنما هو في حقيقة ذاته وحقيقة صفاته.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على التفكر والاعتبار والاتعاظ، حتى نكون ممن يرضى بهم الله تعالى ونكون كذلك من المقربين إليه.

أهداف التفكر والاعتبار ومجالاتهما

محمد شفيق الرحمن*

إن التفكر في الكون وعجائب خلق الله تعالى، والاعتبار والاتعاظ بالسابقين من الأمور التي تقرب الإنسان إلى الله تعالى وتبعدهم عن الوقوع في براثن المعاصي والهلاك. وهما عبادتان أوجبهما الله تعالى علينا، ولذا نلاحظ أن القرآن الكريم يدعونا إلى التفكر والاعتبار في آيات كثيرة بصيغة الأمر الذي هو للوجوب، فأحيانا بعين ألفاظ التفكر والاعتبار، وأحيانا بألفاظ أخرى، مثل النظر والتعقل و التدبر وما إلى ذلك. ولا يفوتنا في هذا المقام أن كون التفكر والاعتبار عبادتين يتقيد بالمجالات التي لا ينبغي تجاوز حدودها، وإلا يسبب هذا التجاوز في ابتعاد الإنسان عن خالقه تعالى ووقوعه في بحر المعاصي. كما أنه يوجد لهما مجالات، يوجد لهما أيضا أهداف يسعيان إلى تحقيقها.

أهداف التفكر والاعتبار

إن التفكر والاعتبار يوجدان شعورا حساسيا في قلب الإنسان ينبهه على أنه أشرف خلق الله تعالى في هذا العالم، وأنه على عاتقه مسؤولية تجاه من أكرمه بهذا الشرف، وأنه ليس كمخلوقات أخرى يأكل وينام، ويعيش من أجل الجريان وراء الهوى وقضاء الشهوات. إن التفكر والاعتبار يميزان الإنسان عن غيره من الحيوانات، ويهدفان إلى تحقيق أخلاق كريمة وصفات نبيلة في حياة البشرية، وفيما يلي أهم أهدافهما:

- **تقوية الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته**

لو تفكر الإنسان في نفسه من أين جاء هو؟ و من الذي جاء به؟ وما الغرض من وجوده؟ وما مصيره؟ ومن أين جاء اختلاف اللون واللغات؟ و من الذي جعل بعض أفراد الإنسان غنيا وبعضه فقيرا؟ ومن الذي خلق قوة البصر والسمع والشم والذوق في الإنسان؟ لو تفكر الإنسان فيما أودعه الله فيه من العجائب واعتبر بها لعرف الله تعالى. قال تعالى: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) [الذاريات: ٢١]

وكذلك لو تفكر الإنسان فيمن خلق هذه الكائنات من السماء والأرض والشمس والقمر، ومن زين السماء الدنيا بالمصابيح، ومن أودع في البحار عجائب لا تحصى ولا تعد، واعتبر بهذه الأشياء، لما وسعه إلا أن يعترف بوجود الله تعالى ووحدانيته. فالتفكر في المخلوقات والعجائب الكونية والاعتبار بهما يساعدنا على تقوية إيماننا بالله تعالى.

- **إصلاح النفس والمجتمع**

إن التفكر والاعتبار من أهم وسائل إصلاح الفرد والمجتمع ؛ حيث

إنه إذا تفكر الإنسان في الأمم التي أحاطها عقاب الله تعالى، والأسباب التي جعلتها تستحق العذاب واعتبر بها، وكذلك إذا تفكر الإنسان في الأمم التي أحاطتها نعم الله تعالى، والأسباب التي استحقت بسببها هذه النعم واعتبر بها، وجد في قلبه وازعا باطنيا يحثه على الابتعاد عن الأسباب التي تسبب عقاب الله تعالى، واختيار الأسباب التي تجلب نعم الله تعالى. ومن هنا يحاول هذا الإنسان المتفكر إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين؛ لكي يجتنب من العذاب ويحصل على نعم المولى، وهكذا يحدث إصلاح الفرد والمجتمع بالتفكر والاعتبار. أما إذا خلا التفكر عن الاعتبار– أي إذا وجد التفكر فقط دون الاتعاظ وأخذ العبرة– فحينئذ قلما يحدث الإصلاح.

- **الاكتشاف بمعارف جديدة**

كلما يتفكر الإنسان ويعتبر كلما يكتشف أشياء جديدة، وهذا أمر ليس مخفيا على أحد، وقد رأينا واقع عصرنا أن الإنسان وصل إلى القمر واستمرت محاولته ليصل إلى كواكب أخرى، واكتشف أشياء جديدة هنا وهناك، كل هذه الاكتشافات الجديدة حصلت نتيجة عن التفكر.

---

*أستاذ مساعد قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية.

نشأة أدب الدعوة الإسلامية

ولا يخفى أن أدب الدعوة الإسلامية قد نشأ وبدأ مسيرته منذ أن أشرق نور الإسلام، ونزل أول وحي على رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم– بقوله–تعالى– (اقرأ باسم ربك الذي خلق ...) وقد استمد أدب الدعوة الإسلامية عبر العصور من عدة روافد، منها رافدان مهمان وهما: 1 – القرآن الكريم : فقد أمد القرآن الكريم الدعوة الإسلامية وأدبها بروحه وهديه، ورسم منهجه وطريقة سيره وأدائه ٢– السنة النبوية المتمثلة في أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – وخطبه وأقواله وأعماله، و رسائله وخطاباته.

أهمية أدب الدعوة الإسلامية :

وأما أهمية هذا اللون من الأدب يستمدها من أسباب عديدة، وهي ما يأتي:

١. قوة العاطفة وأثرها الذي جاش به أدب الدعوة الإسلامية ، وهي عاطفة الإسلام.
٢. أن هذا النوع من الأدب سجل ضخم لأمجادنا وكرامتنا وتصوير صادق لوحدتنا وقوتنا.
٣. أنه المصدر التاريخي الموثق والمرجع الهام للحوادث والوقائع التي حدثت في تاريخ الإسلام والمسلمين، والذي كتب الخلود والبقاء والاستمرار له.
٤. أن أدب الدعوة الإسلامية قد واكب وصاحب جيوش الفتوحات الإسلامية والغزوات فكان لسان الدعوة الحقة التي يدعو إليه محمد –صلى الله عليه وسلم– وأتباعه.

استمرار أدب الدعوة الإسلامية على مر العصور :

إن أدب الدعوة الإسلامية قد واصل مسيرته الطويلة واستمر على مر العصور، سواء في عصر الازدهار، أو عصور الانحطاط و سواء في العصر القديم أو في العصر الجديد .

وكان صوته يعلو أكثر في عصور الضعف، ويوقظ الأمة، ويوحد كلمتها. و كثر الشعر الحماسي في عصور الأيوبيين والمماليك ، والغزو الصليبي والمغولي ، فكان أدب الدعوة الإسلامية شعرا حماسيا يحث على الجهاد، ويرفع روح المجاهدين.

كما ارتفع صوت أدب الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر على الرغم من تآمر وعناد أعداء الإسلام، ومناوئيه ضد هذا اللون من الأدب بحجج واهية وافتراءات زائفة.

ويكفينا أن نقرأ في هذا المضمار شعر شوقي، ونثر الرافعي، وخطب حسن ألبنا، ومؤلفات سيد قطب، والسيد أبي الحسن علي الندوي، لنرى أن أدب الدعوة الإسلامية أقوى وأرفع من جميع التحديات و المؤامرات مهما كانت.

أبرز الشخصيات والأدباء الذين ساهموا في أدب الدعوة الإسلامية

ونذكر فيما يلي أبرز الشخصيات والأدباء الذين أسسوا وساهموا مساهمة فعالة وجبارة في أدب الدعوة الإسلامية، وهم :

كعب بن زهير –رضي الله عنه– و حسان بن ثابت –رضي الله عنه– وعبد الله بن رواحة– رضي الله عنه– عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– و عمر بن عبد العزيز –رضي الله عنه– و ابن قتيبة، و علي أحمد باكثير، و مصطفى صادق الرافعي، وأحمد شوقي، و محمد إقبال، والشهيد سيد قطب، و الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي، و الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، و الدكتور عبد القدوس أبو صالح، و الشيخ محمد الرابع الندوي، و الأستاذ محمد حسن بريغش، و الدكتور عدنان رضا النحوي، و الأستاذ محمد قطب، و الدكتور عبد الباسط بدر، و الدكتور حسن الأمراني، والدكتور محمد مصطفى هدارة، والدكتور عبد الرحمن العشماوي وآخرون.

أدب الدعوة الإسلامية في عصوره المختلفة

شاكر عالم شوق*

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى الإنس والجان ليهديهم إلى طريق الحق والغفران، وعلى آله وأصحابه الداعين إلى سبيل الهدى والرحمن ومن تبعهم إلى يوم الدين بإخلاص وإحسان.
أما بعد، فلا شك في أن الأدب هو المرآة الصادقة التي تعكس فيها أوضاع أهله من الشعوب المختلفة في العالم، فتظهر فيها عقائده وآراؤه ومعتقداته وحضارته وعلومه وفنونه وسلوكه وتقاليده وغير ذلك. كما لاشك في أنه قد نشأ الأدب منذ خلق الله تعالى الإنسان على وجه هذه الكرة الأرضية، ويستخدمه الإنسان في التعبير عن ما يجيش في خاطره من فرح ومرح وحزن وأسى، وعما يراه حوله من المظاهر البيئية والكونية ويدور في جوانبه من الأمور ويحدث من الوقائع والأحداث.

مفهوم الأدب:

ذهب الأدباء والباحثون في تحديد مفهوم الأدب إلى مذاهب شتى، نذكرهنا بعضا منها:

١- الأدب: "فن من الفنون الجميلة التي تصور الحياة وأحداثها بما فيها من أفراح وأتراح، وآمال وآلام، من خلال ما يختلج في نفس الأديب ويجيش فيها من عواطف وأفكار، بأسلوب جميل وصورة بديعة، وخيال رائع."

٢- الأدب: "هو تجربة إنسانية، معبر عنها بالألفاظ والجمل، مع شرط مراعاة مطابعة التعبير، وحسن اختيار اللفظ، وتناغم الحروف، وتناسق الجمل، وتلاؤم الكلمات مع الموضوع، والعناية بالصور، واستخدام الخيال عنصرا ضروريا ومتمما في بناء التعبير بناء جيدا."

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن الأدب — حسب ما تعارف عليه الأدباء في القرنين الثالث والرابع الهجريين- هو مأثور الشعر الجميل، والنثر البليغ المؤثر في النفس، المثير للعواطف. فالتأثير شرط في الأدب، أما الشعر والنثر اللذان لا يثيران العواطف كالمنظومات التي تسهل حفظ العلوم، والكتب التي ألفت في العلوم المختلفة، فهذه لا تسمى أدبا. وقد استقر هذا المدلول لكلمة أدب طوال العصور التي تلت العصر العباسي إلى يومنا هذا. ولكننا إذا أردنا أن نعرف الأدب من خلال النظرة الإسلامية فإننا نقول: الأدب كل شعر أو نثر يؤثر في النفس ويهذب الخلق ويدعو إلى الفضيلة ويبعد عن الرذيلة بأسلوب حسن جميل.

مفهوم أدب الدعوة الإسلامية

أما أدب الدعوة الإسلامية فهو الأدب الذي يخدم الإسلام ويدعمع ويدعو إليه، كما يدعو إلى الفضيلة ويمنع عن الرذيلة، ويصدر عن عاطفة الإسلام وفق تعاليمه وأصوله ومبادئه، سواء كان شعرا أو نثرا ، وسواء كان مدحا أو هجاء أو حماسة، أو حكمة.

وقد قال بعض الأدباء والمفكرين الإسلاميين إنه مرادف لمصطلح الأدب الإسلامي، وعبروا عنه بما يلي:

١- عرف الشيخ أبو الحسن الندوي الأدب الإسلامي بقوله: "إنه تعبير عن الحياة وعن الشعور والوجدان في أسلوب مفهم مؤثر." ٢- قال الأستاذ سيد قطب – رحمه الله – : "الأدب الإسلامي: هو التعبير الناشئ عن امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامية". ٣- وقال د.عبد الرحمن رأفت الباشا – رحمه الله – : "الأدب الإسلامي: هو التعبير الفني الهادف عن وقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأديب تعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق – عز وجل- ومخلوقاته، ولا يجافي القيم الإسلامية." ٤- وذكر الدكتور نجيب الكيلاني – رحمه الله – : "الأدب الإسلامي: تعبير فني جميل مؤثر، نابع من ذات مؤمنة، مترجم عن الحياة والإنسان والكون، وفق الأسس العقائدية للمسلم، وباعث للمتعة والمنفعة، ومحرك للوجدان والفكر، ومحفز لاتخاذ موقف، والقيام بنشاط ما."

فالأدب الإسلامي: "هو التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأديب تعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق عزّ وجلّ ومخلوقاته".

---

*الأستاذ المشارك، قسم الدعوة والدراسات الإسلامية.

٦ تفسير قديم يقرب من هذا المعني قال به أحد الصحابة، فعن ابن مسعود أنه قال في تفسير الطبق: لتركبن السماء حالا بعد حال. وهذا ما أشارإليه الإمام الطبري نقلا عن الحسن البصري وأبي العالية وغيرهما. وهذه الاحتمالات والحقائق العلمية لا يمكن إنكارها مطلقا إلى جانب آراء المفسرين القدامى.

وهنا يجدر بالذكر أن أول رواد الفضاء الأمريكي ''نيل أرمسترونغ'' أول من هبط على سطح القمر أشهر إسلامه وقد نشر ذلك في الجرائد الماليزية ونقلته عنها الصحف التي تصدر في سيلان. وهو يروي عن قصة إسلامه بنفسه فيقول: تعود هذه القصة إلى عدة سنوات عند ما كان في زيارة إلى القاهرة ضمن جولة له حول العالم، وبينما كان أرمسترونغ يتجول في أحياء القاهرة الشعبية سمع آذان الظهر ينطلق من الجوامع "الله أكبر... الله أكبر..." فأصابه الذهول وتساءل وسط دهشته البالغة عن هذا الصوت؟.

فأجابه مرافقوه — وهم متعجبون من ذهوله— إنه صوت المؤذن الذي ينبه المسلمين إلى الصلاة. ولكن رائد الفضاء الأمريكي لم يجبهم، واستمر في ذهوله الشديد وسط دهشة المرافقين له. وبعد أيام ألقى بقنبلته وأعلن لكل من حوله في صراحة ودون تردد إن كلمات الآذان التي رنت في أذنيه دون أن يفهمها هي الكلمات نفسها التي سمعها عند هبوط قدميه لأول مرة على سطح القمر!!

عقب عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عكف على دراسة الدين الإسلامي دراسة كاملة وعرف قواعد الدين بالتفصيل، وفي النهاية أعلن إسلامه. وكان من نتيجة هذا الموقف الذي أعلنه رائد الفضاء أن تم فصله من عمله في مركز الفضاء (ناسا) ولكنه قال بكل قوة وإيمان: '' **فقدت وظيفتي ولكنني وجدت** الله''. والله أعلم بحقيقة الحال قال تعالى: (أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون) صدق الله العظيم.

Pro. Md. Moin Uddin Chy.

All Kinds of
Transport Supply
Factory Repuse
Materials and
Food Supply

DELTA ENTERPRISE

Commission Agent (Export & Importer)

Office : Saikat Shopping Complex, Tel : 031 741672
CEPZ Gate, Airport Road, South Halishahar, Chittagong

غزو الفضاء بين العلم والقرآن

محمد رشيد زاهد*

من الحقائق الناصعة التي لاتنكر أن القرآن الكريم هو كتا ب الله الأخير، وهودستورالإسلام الخالد الذي لا تنقضي عجائبه ولاتنفد أسراره على مر العصور وكرالدهور. عندما نزل القرآن الكريم كان له أكثر من معجزة، فلقد تحدى العرب في بلاغتهم ثم مزق حواجز الغيب. فقد مزق القرآن حجاب الزمن الماضي، وروى لنا بالتفصيل تاريخ الرسل، وحوادث من سبقنا من الأمم وتحدى فيها، ثم مزق حجاب المستقبل القريب، وتنبأ بأحداث ستقع بعد شهور وأخرى ستقع بعد بضع سنوات وتحدى. وحدث كل ما أنبأ به القرآن، ثم بعد ذلك مزق القرآن حجاب المستقبل البعيد ليعطي الأجيال القادمة من إعجازه ما يجعلهم يصدقون القرآن ويسجدون لقائله وهو الله.

وتوضيحا لهذا الإعجاز في اختراق القرآن لحجاب المستقبل البعيد اخترت موضوع غزو الفضاء فماذا يقول فيه العلم الحديث؟ وهل في القرآن إشارات دقيقة إلى هذه الحادثة التاريخية؟ فهذا ما أريد أن أتحدث عنها بإيجاز.

فتأمل معنى قوله تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) [فصلت:٥٣]. والمقصود بالآفاق هو الفضاء الكوني، وما يحتويه من عجائب وحقائق هذا الكون الواسع، ولقد تحقق هذا بصورة واضحة بوصول الإنسان إلى القمر لأول مرة عام ١٩٦٩م؛ حيث تم للإنسان أعظم إنجاز علمي في القرن العشرين ويشير إلى هذا الحدث العظيم الآية الكريمة التالية: (فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمرإذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لايؤمنون ، وإذا قريء عليهم القرآن لايسجدون) [الانشقاق: ١٦-١٧].

حيث وجهت الآية الأولى نظر الإنسان إلى الشفق بالقسم به قسما مؤكدا بحمرة الأفق بعد الغروب، وما يحتويه الشفق من حقائق في علم الضوء من تحليل وانعكاس وانكسار وتشتت. وأما الآية الثانية فهي تلفت النظر إلى ظلام الفضاء الكوني وما يحتويه من أجرام سماوية وإشعاعات خطيرة بعد مغادرة الغلاف الجوي وأما الآية الثالثة فتشير إلى القمر عندما يتسق أي عندما تكتمل أبحاثنا عنه، ونعرف كل ما يتعلق به من حقائق علمية أو يكتمل نوره وجماله وعندئذ يؤكد القرآن الكريم سفر الإنسان إلى القمر بركوبه (طبقا عن طبق).

فالمفسرون القدامى فسروا الحال بشدائد يوم القيامة، واختلاف أحوال الإنسان في الدنيا من رخاء إلى شدة ومن صحة إلى سقم. ولكن السؤال: ما مدى ارتباط هذا المفهوم بما قبله من القسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق؟ لماذا لايكون الطبق فعلا إشارة إلى سفن الفضاء؟ ويؤيد هذا المعني جملة أمور:

١ الطبق يأتي في اللغة بمعنى كل غطاء لازم على الشيء، العربات الفضائية محكمة الإغلاق بطريقة توفر الحياة لرواد الفضاء بداخلها وإلا تعرضت حياتهم للموت .

٢ قوله سبحانه : (لتركبن) بمعنى المقاساة أي مقاساة اختلاف أحوال الإنسان فهو عدول عن المعني الأصلي إلى معنى مجازي والأولي الأخذ بالمعنى الأصلي.

٣ ماذكره سبحانه: (طبقا عن طبق) وهذا نص صريح بتعدد المراحل التي تقطعها سفن الفضاء، وتنفصل فيها العربة الفضائية بعضها عن بعض في كل مرحلة من مراحل الرحلة الفضائية.

٤ ذكرالقمر قبل ذكر (طبقا عن طبق) هو إخبار اليوم الذي سيصل فيه الإنسان إلى القمر بواسطة سفن الفضاء وهو ما حدث فعلا في هذا العصر، ففي ٢١ يوليو عام ١٩٦٩م. تمت رحلة سفينة الفضاء أبوللو ١١ الأمريكية ، والتي حملت الرواد نيل أرمسترونغ وألدرين كوليز إلى القمر حيث هبط أرمسترونج وألدرين على سطح القمر لأول مرة في تاريخ البشرية.

٥ ذكر الليل وما وسق قبل ذكر (طبقا عن طبق) فعند الخروج من غلاف الأرض بواسطة سفن الفضاء يتراءى ليل دائم تسير فيه سفن الفضاء وليس هناك نهار فضوء النهار هو طاريء في قشرة رقيقة من الأرض وهذا ما تراءى لرواد الفضاء .

---

*أستاذ مساعد قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية.

ـ تحديات اجتماعية: على مستوى محاربة الثالوث الخطير، وهو الفقر والجهل والمرض، ومقاومة اليأس الذي يدفع بالشباب إلى الوقوع في شباك التطرف أو الضياع، وعلى مستوى المواءمة بين النظم وأنماط السلوك الحديثة وبين المحافظة على الثوابت والخصوصيات الثقافية والحضارية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي.
ـ تحديات تنموية: على مستوى الجهود المبذولة للقضاء على معوّقات التنمية، وعلى مستوى بناء القواعد الثابتة للنهضة التنموية في جميع الميادين في كل دولة على حدة، وفي إطار التضامن الإسلامي بين دول العالم الإسلامي جميعا.
وعلى الرغم من تعدد وجهات النظر حول الوسائل الأجدى والأنفع لمواجهة هذه التحديات، فإننا نقول بتجديد البناء الحضاري، وندعو إلى مراجعات شاملة للسياسات القائمة في كل الميادين، وبصورة خاصة في ميدان التربية والتعليم. ويشكل التعليم القوي والهادف، القاعدة الأولى للبناء الحضاري، وهو المنطلق الأساس لمواجهة هذه التحديات جميعا، ولكن في هذا المجال ايضا تعاني دول العالم الإسلامي تحديات كبرى، لا بد من مواجهتها والتغلب عليها، وأهم هذه التحديات:

أ التقدم الهائل في مجالات الاتصال والمعلوميات والتكنولوجيا الرقمية، وقصور الإمكانات المادية والفنية والأكاديمية لدى العديد من دول العالم الإسلامي عن ملاحقة هذا التقدم والتكيف معه.

ب العولمة وتأثيراتها على تشكيل الهوية وبناء الشخصية، وعدم الإدراك الكامل للمخاطر الحقيقية التي ينطوي عليها نظام العولمة الكاسحة.

ج ضعف الاهتمام بالبحث العلمي، وقلّة الدعم المخصص للباحثين في مجالات المعرفة المختلفة، سواء من قبل الدولة أو من قبل القطاع الخاص، فالتطور والنمو لا يتمّان إلا بالاستناد إلى توظيف نتائج البحث العلمي توظيفاً سليماً وفعالاً.

د حرية التعليم التي تنحصر في الدور الذي يُناط بالدولة، دون أن تتاح الفرص للقطاع الخاص وللمؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية لممارسة الحق في التفكير والاجتهاد لتطوير التربية والتعليم، مما يعطل الطاقات، ويثبط الهمم، ويزرع اليأس من الإصلاح في النفوس، ومما يتعارض كليا مع روح الحضارة العربية الإسلامية والتراث العربي الإسلامي في هذا المجال، حيث كانت تقوم حلقات العلم الحرة في المساجد والجوامع والمنتديات، تناقش فيها بحرية مختلف الأفكار والمذاهب الإسلامية، وتستنبط الحلول للمشكلات والمعضلات التي تواجه المجتمع.

هـ مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المتنامية.

ومهما يكن الحال، فإن هذه التحديات ليست مما لا سبيل إلى التغلب عليه، وتجاوزه إلى آفاق أكثر إشراقاً وأوضاع أفضل حالاً، إذا ما تعرّفنا على العلل التي تُضعف كياننا والعوائق التي تحد من حركتنا، وإذا ما بادرنا إلى القيام بعمل جماعي متناسق يعتمد التخطيط السليم والتنفيذ المتقن، وبروح التضامن والتكافل التي هي قبس من حضارتنا العظيمة التي أشرقت على العالم، وسيعود إشراقها، بإذن الله، على الرغم من كثافة السحب وادلهامّ الخطوب، ليتعرف العالم كلهِ على حقيقة رسالتها الإنسانية ونبل مقاصدها، وأنها حضارة تعارف وتعاون، لا حضارة تناكر وتصادم.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

المسلمون والتحديات المعاصرة

الدكتور محمد سراج الدين*

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالتحديات التي تواجهها الأمم والشعوب هي من سنن الله في الكون، فلقد خلق الله الإنسان في كبد، وجعل الحياة عناء لا ينتهي ومكابدة لا تفتر، من أجل إقامة العدل وإقرار الحق وإحلال السلام بين البشر، وعبادة الله وتطبيق تعاليمه في الأرض، وفق الضوابط والأحكام وموازين القسط التي جاءت بها الشرائع السماوية، والتي بلغت كمالها بالشريعة الإسلامية الخاتمة والهادية إلى الخير والحق والفضيلة والداعية إلى السلام في الأرض والمحبة بين بني البشر والتطلع الدائم إلى نيل مرضاة الله بالعمل الصالح في ظل الأخوة الإنسانية التي لا تفرق بين الناس وتجعلهم سواسية كأسنان المشط، فربّهم واحد، وأصلهم واحد.

لقد اكتسح الاحتلال الأوروبي العالم الإسلامي بدءاً من القرن الثامن عشرالميلادي، واكتمل تطويق الاستعمار للأقطار الإسلامية، في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وفي بداية العقد الثاني من القرن العشرين. وكان الاستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي تحدياً شديد الضراوة بالغ الشراسة، استهدف الأرض والعقل في آن واحد، وكانت مطامحه بعيدة المدى، ولو لم تقم حركات التحرير الوطنية الجهادية في جميع أقطار العالم الإسلامي بكسر إرادة المستعمرين، وإحباط مؤامراتهم، لكان وضع العالم الإسلامي اليوم بالغ السوء.

ويعود جزء من التحديات التي تواجهنا اليوم في العالم الإسلامي، إلى تلك التي سادت في المراحل السابقة، فهي تشكل من حيث العمق والجوهر والهدف والبُعد الاستراتيجي امتداداً لها. بيد أن جزءاً من تحديات هذا العصر، هو ناتج بالضرورة عن التراكم والتعاقب، وعن عدم البتّ في شأنها بالحسم أو بالمعالجة التي تقتضيها الظروف، نتيجة للعجز والتواكل، أو للجهل بأخطارها، أو للاستخفاف بها جملة، أو لسوء الفهم وانعدام الأهلية للتدبير والتسيير وإدارة الشأن العام. كما أن جزءاً آخر، لعله الأكبر من هذه التحديات، راجع إلى طبيعة هذا العصر، لأنها تمخضت عن التطورات التي عرفها العالم خلال العقود القليلة الماضية في شتى الميادين، خاصة ما يتعلق منها بالعلوم والتكنولوجيا، وبالتربية والتعليم، وبالإدارة والحكم وتدبير الشأن العام، وبالاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة، وهي الميادين التي تخلفت فيها دول العالم الإسلامي تخلفاً شديداً.

إن العالم الإسلامي يعيش مرحلة تاريخية محفوفة بالمخاطر الحقيقية، فُرضت عليه فيها تحديات ضخمة، الكثير منها هو وليدُ المتغيرات الدولية المتسارعة التي يهتزّ العالم المعاصر تحت وطأتها، والتي تهدّد استقرار المجتمعات الإنسانية في كل مكان من العالم، وتُلقي بظلالها القاتمة على الحياة العامة فوق هذه الأرض. وفي ضوء ذلك، ويمكن أن نحصر أهم هذه التحديات في ما يلي:

- تحديات سياسية: على مستوى نظم الحكم والإدارة وإقامة العدل وتطبيق الشورى من خلال آليات إجرائية تضمن مشاركة فئات المجتمع المختلفة، واحترام حقوق الإنسان التي اعتبرها الإسلام جزءاً أساسياً من مقاصد الشريعة، ودعا إلى صيانتها، ومدى الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية الإسلامية، واحترام القيم الثابتة للحضارة العربية الإسلامية، وعلى مستوى الممارسات السياسية داخل تنظيمات المجتمع، ومؤسساته الثقافية والسياسية والاجتماعية.
- تحديات اقتصادية: على مستوى الاختيارات الاقتصادية، والإصلاحات، والتطبيقات الهادفة إلى معالجة الضعف الاقتصادي وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية، والتكيّف مع الأنظمة الاقتصادية العالمية.
- تحديات ثقافية: على مستوى التنظير، والتخطيط، والعمل الثقافي في حقوله المتعددة لبناء الفكر القويم المنفتح على العالم بروح سمحة وعطاء مبدع، ومعالجة نوازع التطرف والانغلاق، وعلى مستوى المواجهة المتكافئة مع التيارات الثقافية المتعددة الوافدة من الغرب والشرق معا.

---

* الأستاذ المساعد بقسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية

زيارتي لهذه البلاد بلقاء سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش الأستاذ/عبد الله بن ناصر البوصيري، الذي لقيت منه كل حفاوة وتكريم فنعم الرجل المناسب في المكان المناسب، فكان شخصية فذة يتمتع بعدد من الصفات الحميدة كالحكمة ولين الجانب وبشاشة الوجه والكرم والجود. فتح قلبه ومكتبه ومجلسه أمام كل زائر، وكل سعودي في بنجلاديش فخور بهذا الرجل الذي نذر نفسه ووقته وجهده في سبيل سعادة الآخرين- وفقه الله تعالى- وسدد على درب الخير خطاه.

كما تشرفت بزيارة الملحق الديني في داكا فضيلة الشيخ علي ميغا، وهو رجل فاضل متعاون، وله جهود مشكورة وبصمات واضحة في البلاد، وكذلك التقيت في منزل سعادة السفير بعدد من الشخصيات السعودية التي تعمل في داكا، والتي تربطها بها أعمال إدارية، وعلى رأسهم سعادة الملحق العسكري السعودي صاحب الخلق الجم والسمعة الطيبة. وكان لقاءً وديا ووقتا ممتعا يجل عن الوصف.

كما وقفت خلال هذه الزيارة المباركة على عدد من المشاريع الإنمائية للجامعة في المقر الدائم وفي داخل المدينة. ومما زادني شرفاً مشاركتي إخواني أعضاء مجلس أمناء الجامعة لمدة ثلاثة أيام؛ حيث تم خلال المجلس مناقشة العديد من القضايا المهمة على الصعيد الإداري والأكاديمي والإنشائي، واتخاذ كافة السبل للعمل على تطوير الجامعة-وفق الله تعالى الجميع لما يحبه ويرضاه.

وأكرر شكري وتقديري لمعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبد الله أبا الخيل الذي منحني هذه الثقة لأقوم بهذا الواجب تجاه أخوة لي في هذه الدولة المتعطشة للعلم والعلماء والله الموفق.

أجرى هذا الحوار:
محمد شفيق الرحمن الأزهري
الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية.

استراحة المجلة

لقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم ناصر الحمود*

س: فضيلة الدكتور إبراهيم نرحب بكم أولا في هذه الجامعة ونقدر لكم تجاوبكم وتعاونكم معها للمرة الثانية، ونود أن تعطوا القارئ الكريم نبذة مختصرة عن زيارتكم للجامعة وعن شعوركم وأنتم بين إخوانكم- منسوبي هذه الجامعة- تؤدون رسالتكم.

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تعالى وبعد:

فلقد شرفت بهذه الزيارة التي تمت بطلب من سعادة مدير الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ خلال زيارته للمملكة العربية السعودية حين التقى خلالها بمعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجاءت هذه الزيارة ضمن أوجه التعاون بين الجامعتين؛ حيث وافق معالي مدير الجامعة الدكتور/ سليمان بن عبد الله أبا الخيل على الطلب، ثم جاءت الموافقة النهائية من معالي وزير التعليم العالي، وصدر قرار معالي مدير الجامعة بإيفادي لمدة فصل دراسي للجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ.

وهذه هي الزيارة الثانية؛ حيث كانت الأولى عام ١٩٩٢م. ضمن البرامج الدعوية التي كانت تنظمها المملكة على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وفقه الله. والحقيقة سررت كثيراً بمقدمي لهذه البلاد وسرني أكثر ما لقيته من منسوبي الجامعة من الحفاوة والتكريم وحسن المعاملة.

وكان الغرض من الإيفاد إلقاء دروس علمية في الجامعة في العلوم الشرعية على طلاب الجامعة. وقد تحقق ذلك- ولله الحمد. فباشرت العمل في ٦ من أكتوبر ٢٠٠٩م إلى ١ من فبراير ٢٠١٠م (لمدة أربعة أشهر). ألقيت خلالها عدداً من المحاضرات في التفسير والقواعد الفقهية على طلبة الماجستير، وعددا من المحاضرات العامة على طلاب مرحلة البكالوريوس، ولم تواجهني- ولله الحمد- صعوبات تذكر؛ حيث غمرني إخواني وزملائي في هذه الجامعة بالأخلاق الفاضلة، وأذكر منهم على وجه الخصوص أخي وعزيزي فضيلة الشيخ /قاضي دين محمد، الأستاذ المشارك، قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية، الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في هذا الإيفاد.

وقد وفقه الله تعالى على تواصل مستمر معي هنا وفي المملكة العربية السعودية، ويسعى جاهدا لمصلحة الجامعة مادياً ومعنويا، فله جهود طيبة تشكر ومساعي حميدة، فهو من الشخصيات البارزة والعاملة بجد ونشاط في هذه الجامعة، ولم يبق من مدة الإيفاد، فاضطررت أن أغادر هذه الجامعة. وهذا حال الزمان وهي سنة الله تعالى في هذا الكون بداية ثم نهاية، شباب ثم هرم، ولن أنس هذه الأيام التي قضيتها في ربوع هذه الجامعة بين أخوة لي في الله تعالى، تجمعني معهم رابطة الدين والألفة والمحبة.

وقد رأيت في هذه البلاد أنموذجا رائعا في تعلم الكثير من السجايا الكريمة كالصبر والحلم والكرم والبشاشة في الوجه. والشعب البنغلاديشي شعب طيب ومسالم، همه كسب رزقه من تعب يده متحديا في ذلك كافة الصعوبات، رغم ما يعيشه من ضيق العيش وقلة ذات اليد. ولكن من جد وجد ومن زرع حصد. والصبر مفتاح الفرج وصنعة في اليد أمان من الفقر، هذا هو لسان حال شعب بنجلاديش. تلك الدولة المسلمة التي تعد ثاني دولة مسلمة في جنوب شرق آسيا بعد إند ونسيا. كما أني وجدت أرض بنجلاديش أرض خصبة لتلقي الدعوة والأعمال الخيرية لمن وفقه الله تعالى لبذل الخير والإنفاق في سبيل الله تعالى، وخاصة بناء المساجد وحفر الآبار للشرب وبناء المدارس التي تعنى بالدراسات الإسلامية.

وكان لي جولات في ربوع هذه البلاد، زرت خلالها بعض المدارس والجامعات في شيتاغونغ وفي كوكس بازار. ومن تلك الجامعات التي تشرفت بزيارتها جامعة دار المعارف، وهي جامعة سلفية تعنى بالدراسات الإسلامية لمختلف المراحل العلمية، ويدرس فيها ما يزيد على ألف طالب وطالبة، ويديرها شيخ فاضل وعالم جليل، وهو العلامة الشيخ /محمد سلطان الندوي، الذي تتلمذ على يد الشيخ أبي الحسن الندوي- رحمه الله تعالى. ولقد تشرفت خلال

---

* الأستاذ الزائر للجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ ، والأستاذ بجامعة الإمام

فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك. فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس. قيل له: فإنه إذا أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحا. فإن قال: أنا أقلد بعض الصحابة. قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم، ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله؟ على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه.

وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار، عن ابن القاسم عن مالك، قال: ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع؛ لقول الله عز وجل: {الذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر:١٨].

اعلم أن حاصل جميع حجج المقلدين منحصر في قولهم: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمونَ} [النحل:٤٣]. فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه، وهذا نص قولنا, وقد أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث صاحب الشجة: "ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العيي السؤال". وقال أبو العسيف: الذي زنى بامرأة مستأجرة: وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما علي هو جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فلم ينكر عليه تقليد من هو أعلم منه.

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر. فروى شعبة عن عاصم الأحول، عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة: أقضي فيها فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء, هو ما دون الولد والوالد، فقال عمر بن الخطاب إنني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر. وصح عنه أنه قال له: رأينا لرأيك تبع، وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر. وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفتون الناس ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى. وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة. كان عبد الله يدع قوله لقول عمر، وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي، وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب.

وقال جندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "إن معاذا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا" في شأن الصلاة حيث أخر فصلى ما فاته من الصلاة مع الإمام بعد الفراغ، وكانوا يصلون ما فاتهم أولا ثم يدخلون مع الإمام.

قال المقلدة: وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر وهم العلماء والأمراء، وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به, فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم. وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة:١٠٠]. وتقليدهم اتباع لهم ففاعله ممن رضي الله عنهم، ويكفي ذلك الحديث المشهور: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم.

وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي". وقال: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد". وقد كتب عمر إلى شريح: أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يكن في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبما قضى به الصالحون.

وقد منع عمر عن بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة، وألزم بالطلاق الثلاث فتبعوه أيضا.

واحتلم مرة، فقال له عمرو بن العاص: خذ ثوبا غير ثوبك فقال لو فعلتها صارت سنة. وقال أبي بن كعب وغيره من الصحابة: ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. وقد كان الصحابة يفتون ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حي بين أظهرهم, وهذا تقليد لهم قطعا؛ إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم.

وقد قال تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة:١٢٢] فأوجب عليهم قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم, وهذا تقليد منهم للعلماء. وصح عن ابن الزبير، أنه سئل عن الجد والإخوة، فقال: أما الذي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذته خليلا"، فإنه أنزله أبا, وهذا ظاهر في تقليده له. وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد، وذلك تقليد له.

وجاءت الشريعة، بقبول قول القائف، والخارص والقاسم والمقوم للمتلفات، وغيرها والحاكمين بالمثل، في جزاء الصيد وذلك تقليد محض. وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف والمعدل، وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد، وذلك تقليد محض لهؤلاء. وأجمعوا على جواز شراء اللحمان، والثياب والأطعمة وغيرها، من غير سؤال عن أسباب حلها، وتحريمها اكتفاء بتقليد أربابها. ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء فضلاء لضاعت مصالح العباد، وتعطلت الصنائع والمتاجر، وكان الناس كلهم علماء مجتهدين، وهذا مما لا سبيل إليه شرعا، والقدر قد منع من وقوعه

أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا ولا يدري أمصيب هو فيه أم مخطىء. ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق لجواز الخطأ على متبوعه، وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب.

ذكر أبو عمر بن عبد البر –رحمه الله– في جامعه بإسناده عن ابن مسعود –رضي الله عنه– أنه قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر وقال في جامعه أيضا رحمه الله: وثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم– أنه قال: "تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤساء جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون". وهذا كله نفي للتقليد، وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده.

ذكر–رحمه الله– آثارا نحو ما تقدم ثم قال: وقال: عبيد الله بن المعتمر: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها, وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة, والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل:٤٣].

أجمع العلماء على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه في القبلة إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا. ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبي هريرة –رضي الله عنه– أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قال: "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه".

ففي الختام أقول: إن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائنا من كان، لا تسوغ مخالفتهما ألبتة لأحد كائنا من كان فيجب التفطن؛ لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص بالأمور الاجتهادية لا يتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوحي سالم من المعارض.

وقال أبو عمر بن عبد البر –رحمه الله– في كلامه عن التقليد ما نصه: وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية، فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله، وأنا أورده قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم، أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. وإن قال: حكمت به بغير حجة. قيل له: فلم أرقت الدماء، وأبحت الفروج وأتلفت الأموال، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: {إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا} [يونس:٦٨] أي من حجة بهذا؟ فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجَة، لأني قلدت كبيرًا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي. قيل له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلم معلمك أولى, لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك: كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك.

فإن قال: نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه.

وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وإن أبى ذلك نقض قوله. وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر، وأقل علما؟ ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما، وهذا تناقض؟ فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل له: كذلك من تعلم من معلمك، فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك, وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك, لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك.

فإن قلد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء، أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله. والأعلى للأدنى أبدا. وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضا وفسادا.

قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه: يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به، وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم– لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني. قيل له: أما العلماء، إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة رسوله –صلى الله عليه وسلم– أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه؛ ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض, فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض؟

وكلهم عالم، والعالم الذي رغبت عن قوله، أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه.

فإن قال: قلدته لأني أعلم أنه صواب. قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ فإن قال نعم. أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل. وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني. قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك,

وقال جل وعز: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، قَالَ أَولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ} [الزخرف:٢٣-٢٤]. فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء، فقالوا: {إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} [سبأ:٣٤]. وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ} [الأنفال:٢٢]. وقال عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء:٥٢]. وقال: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا} [الأحزاب:٦٧]. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء.

وقد احتج العلماء بهذه الآيات، في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر. وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا، وإن اختلفت الآثام فيه.

وقال الله عز وجل: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة:١١٥]. وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب على إبطال التقليد. فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم بها، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. أخبرنا عبد الوارث ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة" قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: "أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع".

وبهذا الإسناد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله". ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن حدير عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حبان، عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق.

ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل -رضي الله عن- أنه كان يقول في مجلسه كل يوم، قلما يخطئه أن يقول ذلك: "الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق، والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم"، إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة. وإنما كانت كذلك؛ لأن من يقلد العالم تقليدا أعمى يقلده فيما زل فيه فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من دين الله، وأنها مما أمر الله بها ورسوله، وهذا كما ترى والتنبيه عليه هو مراد ابن عبد البر. ومرادنا أيضا بإيراد الآثار المذكورة.

ثم قال أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله- في جامعه ما نصه: وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء، لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ثم ساق السند إلى أن قال: عن ابن مسعود أنه كان يقول: "اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة" فيما بين ذلك. ومعنى الإمعة كما قال الجوهري في صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضا للذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد، ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن أحدكم إمعة. وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال.

ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، وهو حديث مشهور عند أهل العلم، يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم: يا كميل إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنورالعلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق، إلى آخر الحديث. وفيه: أف لحامل حق لا يصيره له، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن افتتن به، وإن من الخير كله من عرفه الله دينه، وكفي بالمرء جهلا أن لا يعرف دينه. ولا شك أن المقلد غيره تقليدا أعمى يدخل فيما ذكره علي رضي الله عنه في هذا الحديث، لأنه لا يدري عن دين الله شيئا إلا أن الإمام الفلاني عمل بهذا. فعلمه محصور في

اتباع قوله فأنت متبعه, والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. وقال أبو عمر في آخر كلامه في هذا الباب ما نصه: ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار.

أنواع التقليد:

ومن الجدير بالذكر أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد، ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي، كما ذكر عن الصاوي وأضرابه. وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله. وبعض العلماء منع التقليد مطلقا، وممن ذهب إلى ذلك ابن خويز منداد من المالكية، والشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد.

والتحقيق أن التقليد منه ما هو جائز، ومنه ما ليس بجائز، ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة. وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة.

التقليد الجائز: التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالما أهلا للفتيا في نازلة نزلت به، وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا خلاف فيه. فقد كان العامي، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه. وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يعمل بفتياه.

قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر. وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم بغير نكير. فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى، فالأقوال المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها مخالفة للإجماع. وبعض العلماء يقول: إن تقليد العامي المذكور للعالم وعمله بفتياه من الاتباع لا من التقليد. والصواب أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته.

التقليد الممنوع هو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر يرى خلاف ما ظهر له هو للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه.

التقليد الشخصي:

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون، الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء. فإن هذا النوع من التقليد، لم يرد به نص من كتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير. وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة -رحمهم الله- فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره من جميع علماء المسلمين.

قال الشيخ محمد المختار: فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع، ومن يدعي خلاف ذلك، فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول، التزم مذهب رجل واحد معين ولن يستطيع ذلك أبدا؛ لأنه لم يقع البتة. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله- في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ما نصه: باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ} [التوبة: ٣١].

وروي عن حذيفة وغيره قالوا: لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي عنقي الصليب فقال لي: "يا عدي، ألق هذا الوثن من عنقك" فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ} قال قلت يا رسول الله: إنا لم نتخذهم أربابا. قال: "بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمونَ عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه"؟ فقلت بلى فقال: "تلك عبادتهم".

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثم ساق السند إلى أن قال عن أبي البختري في قوله عز وجل: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ} أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم، فجعلوا حلال الله حرامه، وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية.

قال: وحدثنا ابن وضاح، ثم ساق السند إلى أن قال عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ} أكانوا يعبدونهم؟ فقال لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه.

التقليد : المشروع منه والممنوع عنه

محمد شفيع الدين المدني*

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد!

فإن نصوص الكتاب والسنة واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- و أن منصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علما صحيحا قليلا كان أو كثيرا، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على لزوم اتباع الوحي والعمل به لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول طاعة الله ولا يتحقق ذلك فيمن يقلد عالما ليس بمعصوم، لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ في حال كونه معرضا عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده كافية مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فإليكم مفهوم التقليد وأنواعه وبيان ما يصح منه وما لا يصح.

مفهوم التقليد:

التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق. وتقليد البدنة : جعل القلادة في عنق الإبل. ومنه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد) [المائدة: ٢] وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم. ومنه قول لقيط الأيادي: وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا.

التقليد في اصطلاح الفقهاء:

قال ابن الهمام: التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها وقال ابن خويز منداد: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء فهو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله. ثم قال: والمراد بالمذاهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة. ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصا من الكتاب أو سنة ثابتة، سالما من المعارض؛ لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائنا من كان، لا تسوغ مخالفتهما البتة لأحد كائنا من كان فيجب التفطن؛ لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص بالأمور الاجتهادية ولا يتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوحي سالم من المعارض.

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره- مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس- ما نصه: والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية. فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض. وذلك أمر لا خلاف فيه لإجماع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده دليلا، مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع، أن دليله ذلك باطل بلا خلاف. وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار. وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في القوادح: والخلف للنص أو إجماع دعا فسادا لاعتبار كل من وعى. وبما ذكرنا اتضح لنا أنه لا اجتهاد أصلا ولا تقليد أصلا في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع.

الفرق بين التقليد والاتباع:

قال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه, وذلك ممنوع منه في الشريعة, والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلده, والتقليد في دين الله غير صحيح, وكل من أوجب عليك الدليل

---

* أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية

الحقيقة لا يستخدمون هذا المجال يهملونه حق الاهمال. يلزم إقامة الجمعيات والمؤسسات لممارسة الأعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية وبالتالي تحويله إلى وسيلة للدعوة الإسلامية.
علما بأن الرجل الذي يكون هدفا فيلزم على الداعي أن ينتصر علي قلبه تماما حتى يمكن عرض الدعوة عليه بسهولة.

ثامنا: دور المساجد في الدعوة الإسلامية:

كل مجتمع سواء كان مسلما أو غير مسلم يوجد فيه مركز خاص لتجلية المواهب وشعور الناس، يجتمع فيه جميع أعضاء المجتمع فيجدون فرصة ذهبية لتبادل الآراء فيما بينهم وأخذ التوجيهات الصحيحة الإيجابية في الأمور التي تهمهم. ففي المجتمع الإسلامي يعد المسجد مركزا لجميع نشاطات المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأداء جميع أعمال المجتمع والدولة والسياسة والحرب والقضاء والاتفاقية وغيرها في المسجد بجانب اداء الصلاة ، ولكن في عصرنا هذا فقدت مساجد بنغلاديش ذلك الدور الحميد؛ دور عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. في ذلك العصر عصر صدر الإسلام الإمام الذي يصلي بالناس في المسجد هو الذي يقوم بالسيادة والقضاء فهو الرجل الأول في المجتمع. ولكن أئمة المساجد في بنغلاديش في عصرنا هذا فقدوا مكانتهم السابقة، بل وبالعكس يسود هم رئيس المجتمع والحي سواء كان مثقفا أو جاهلا. فهم دائما في ذعر وقلق. فلا يستطيعون أن ينبهوا المصلين إلى القيام بمسئولياتهم في أمور الدولة والمجتمع. فنظرا إلى هذه المشاكل والظروف أود عرض الاقتراحات التالية على الأئمة الكرام:

- يلزم على الإمام أن يكون عالما حاذقا وداعيا مخلصا ويكون مدربا.
- إعداد خطب الجمعة بتعاون العلماء البارعين المتخصصين وإلقاؤها بالبنغالية لو يمكن.
- جعل المسجد مركزا وحيدا لتعليم القرآن الكريم صحيحا.
- أن يكون مركزا لنشر العقيدة الصحيحة.
- إتاحة الفرصة للنساء للمشاركة في الجماعة.
- تخصيص المواعيد للوعظ والنصح والإرشاد للنساء.
- تنفيذ المشاريع الخيرية الاجتماعية من المسجد —إن أمكن.

الاقتراحات والتوصيات:

١- يجب على الداعي أن يكون مؤهلا للاستفادة مباشرة من القرآن والسنة، واستخراج الأصول الأساسية للدعوة منهما.
٢- أن يكون له معرفة كاملة في أصول العقيدة ومنهج الحياة الإسلامية.
٣- أن يكون له علاقة مباشرة مع المؤسسات الدعوية في العالم.
٤- أن يكون عالما بتعاليم الأديان ومصادرها ونشاطاتها المتنوعة.
٥- أن يكون عالما بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدبلوماسية للعالم الإسلامي وموقفه الاستراتيجي.
٦- أن يكون عالما باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة، مثل الفاكس وآلة التصوير والإنترنيت والبريد الإلكتروني والكمبيوتر والطباعة.
٧- أن يتدرب على كتابة المقال وإعداد التقارير وقيادة الناس والوعظ والنصح وفهم طبيعة الناس وأسلوب المحادثة والنقاش وأن يكون حاملا لأخلاق جميلة.
٨- أن يتوفر فيه جودة الكلام واستخدام العبارات الفصيحة وأن يكون ماهرا في العربية والإنجليزية جانب لغته الأم.
٩- أن يمارس الأدب الإسلامي، ويكتب لعامة الناس بعبارات سهلة.
١٠- أن ينبه الناس ويُفهمهم عن مؤامرات المنظمات غير الحكومية.
١١- أن يقوم بتوحيد صفوف العلماء لإيقاظ المجتمع.
١٢- أن يوجد التعاون والتنسيق والبرامج المتعارفة فيما بين الدعاة.
١٣- أن يقوم الدعاة بتأسيس مؤسسات ثقافية إسلامية.
١٤- أن يقوموا بتعليم العقيدة الصحيحة وإيقاظ مشاعر النساء وإخطارهن عن مسئولياتهن.

الخلاصة:

يمكن لنا القول بأن الدعوة الإسلامية بمنزلة الروح في إقامة منهج الحياة الإسلامية. وفي أداء هذه المسئولية يكمن فلاح البشرية وسعادتها ونجاتها. وهذا فرض على كل مسلم. ولأداء هذه المسئولية لا يحتاج إلى شهادة جامعية بل يقوم بها كل مسلم حسب علمه ومعرفته. فكل مسلم يدعو الناس إلى الله فهو داع. وينبغي للداعي أن تشمل دعوته جميع مجلات الحياة، فلا يكون في نظامه ضيق ولا في حدود مرسومة، بل يتفق بدعوته الحياة الدنيا، فهذه المجالات التي قدمناها في هذه المقالة لهي في أمس الحاجة إلى الاصلاح و الريادة. و بذلك يمكننا أن نقوم برد فعل لكيد الشيطان.

يفهموا هذه المؤامرات جيدا وأن يشعروا أهمية التيقظ العام ثم القيام بأخذ الإجرائات اللازمة لمواجهة هذه المؤامرات وإخطار عامة الناس عنها. ولهذا الهدف يلزم إصدار النشرات والدوريات.

سادسا: الدعوة الاسلامية عند الناس خاصة بين طبقات الحرفيين:

١. الفلاحون ٢. العمال والموظفون ٣. التجار ٤. الأساتذة

الفلاحون:

إن بنغلاديش دولة تعتمد على الزراعة. جل سكانها فلاحون. الفلاحون الذين يقطنون القرى هم يكونون دائما ساذجي الفطرة شريفي الطبع. وهكذا جل السكان الأميين في الدولة هم الفلاحون. فهناك آلاف من الفلاحين — وبخاصة في المناطق الشمالية في بنغلاديش– لا يعلمون حتى الشهادتين ناهيك عن معرفتهم كيفية أداء الصلاة فيربو عدد الجاهلين عن الصلاة – فضلا عن غير المصلين — على مئات آلاف. فهم بحاجة ماسة إلى الدعوة الإسلامية. وتبعا يكون ممارسة الدعوة وانتشارها فيما بينهم أسهل وأيسر نظرا لطبيعتهم السليمة غير المنحرفة ولكن الفقر فقر الدعاة. فقط يحتاج إلى داعية. لو قام الطلبة والطالبات والأساتذة والمعلمات وبالتالي جميع المصلين بتعليم هؤلاء الأميين والجاهلين أمور دينهم وتبليغ مبادئ الإسلام إليهم ففي وقت قصير يخرج الدعوة الإسلامية بنتيجة إيجابية وبهذا الطريق يجد هؤلاء الجاهلون سبيل الرشد والهداية.

العمال:

إن عددا كبيرا من سكان الدولة عمال، ويفهم من العمال هم عمال المصانع و سواق الركشة والسيارات والعمال الذين يعملون لدى المؤسسات وغيرها ويحصلون على الرواتب فهم أيضا بحاجة إلى الدعوة الإسلامية. فلو كان تبليغ الدعوة الإسلامية إليهم حسب تخطيط جاد احرزت نجاحا كبيرا. وينبغي للداعي أن يكون على علم بصيرة كاملة حول العمال، وأن يكون شفوقا لهم، وأن يعايشهم في حالات العسر واليسر. لو تكلم الداعي مع سائق الركشة لمدة دقيقتين فقط؛ ذهب إلى المصانع ولقي مع العمال والموظفين ودعاهم إلى الدين الحق والاستسلام له كاملا فنجد كثيرا منهم يلبون دعوته. وإضافة إلى ذلك يلزم تشجيع أصحاب المصانع والمسئولين على القيام بأعمال الدعوة وممارسة النشاطات الدعوية فيما بين العمال والموظفين بطرق مختلفة. وبعد الحصول على الإذن من أصحاب المصانع أو المسئولين يمكن للداعي أن يجمع العمال لفترة قليلة ويدعوهم إلى الدين، وللفت انتباههم يقوم الداعي بتقديم بعض الهدايا إليهم. وهذا أمر هام ، لأن البعثات التنصيرية تصرف أموالا هائلة للفت انتباههم فلماذا لا يستطيع الدعاة أن يقدموا بعض الهدايا؟ وفي الحقيقة يرغب كثير من الدعاة في الأخذ أكثر من التضحية والعطاء.

التجار:

عرض الدعوة الإسلامية على التجار لا بد أن يكون من أسلوب تجارى. وفي هذا المجال ينبغي للداعي أن يكون خبيرا بأحوال التجار وأمور التجارة، فيحاول لإفهامهم بعد عرض السعادة والخسارة الدنيوية والأخروية بأن الفلاح الأخروي هو الفلاح الحقيقي، وأن حياة الدنيا هي ظل زائل وهي مزرعة الآخرة. فلا بد أن يكون جميع الأعمال والنشاطات للنجاح والسعادة في الآخرة. كل داع يذهب إلى السوق قليلا كان أو كثيرا ويتعامل مع التجار. فإذا يقوم الداعي حسب تخطيط جاد بالمعاملة الحسنة وإقامة العلاقة الوطيدة مع التجار، وأثناء المحادثة معهم يمارس الأعمال الدعوية فينجح في دعوته دون أن يصرف وقتا طويلا وإضافة إلى ذلك يمكن القيام بأعمال الدعوة بإقامة الجمعيات التجارية ولكن يحتاج إلى تخطيط جاد.

الأساتذة:

لا شك أن الداعي رجل مثقف. فيسهل عليه إقامة العلاقة الحميمة مع الأساتذة. يعرف كيفية التعامل مع الأساتذة ولغة المحادثة والتكلم معهم والنقطة التي يناقشها فيما بينهم. وبهذا الطريق لو يمكن عرض الدعوة على واحد من الأساتذة وإرضاءه على ممارسة الأعمال الدعوية فبوسيلته يجد كثير من الناس وبخاصة الطلاب منهم سبيل الرشد والهداية. فطبقة الأساتذة هي مجال رائع للدعوة الإسلامية، وهذا المجال ذو نتاج كبير، فلا بد من الاهتمام بهذا المجال أكثر من مجالات أخرى.

سابعا: مجال الدعوة في الخدمات الصحية:

عندما يكون الإنسان مريضا فيحسب نفسه ضعيفا. في هذا الوقت لو عاده أحد وقدم إليه المواساة ويمد إليه يد المساعدة فيتأثر به كثيرا. فمجال الصحة الخدمات الصحية هو مجال هام للدعوة. لأن جميع الناس يتعرضون للمرض والمشاكل الصحية قليلا أو كثيرا. فيمكن استخدام هذه الفترة الحساسة لممارسة الأعمال الدعوية. عندما يذهب الداعي بالمريض إلى الطبيب يكون مشكورا. وأثناء ذلك يدعوه إلى الصراط المستقيم؛ إلى الله ورسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم. فيتأثر به كثيرا. وهكذا لو يقوم الطبيب بالأعمال الدعوية فأيضا يكون أنجح. ولكن الدعاة في

لمواصلة مسيرتها الإعلامية. فأعتقد أن هذه الجرائد إن لم تغير أسلوبها الحالي ولم تتخذ أي إجراءات لازمة فلا تنجح في أداء رسالتها في الساحة الإعلامية.

الوسائل الإلكترونية:

وهي : الإذاعة والتلفاز والأشرطة المرئية والمسموعة والدش والقمر الصناعي:
فيا للعجب على ما يبث عبر الإذاعة والتلفاز في بنغلاديش! كلما نشغل الإذاعة نسمع أغنية الأفلام الخبيثة، وأغنية "الباندراي" و"قوالي" التي تفوح منها رائحة الشرك باسم الأغنية الدينية والتبجيلية. وإن التلفاز أيضا لا يقل بشاعة وشناعة عن الإذاعة، بل ينشر عبرها المسرحيات والأغنية والإعلانات والأفلام التي تثير الشهوة ومسرحيات خاصة تشجع على التدخين وشرب المسكر والعلاقة المحظورة بين الفتيان والفتيات. ومن ناحية أخرى لا ينشر برامج دينية إلا قليلا في أيام مخصوصة مثل العيدين ويوم العاشوراء ويوم مولد النبي –صلى الله عليه وسلم– وليلة القدر وغيرها، على صورة ممسوخة ومحرفة وبيد المبتدعين الذين ليس لهم علاقة بالتعليم الإسلامي الخالص وليس لهم خبرة ومعرفة كاملة في العلوم الشرعية بل عقيدتهم منحرفة وفاسدة.
أرى أنه يلزم على مؤسسة إسلامية بعد النظر والفحص الدقيق أن تهتم بإعداد جماعة تقدر على تشغيل التلفاز والقمر الصناعي وتنسيق البرامج والجدول في الإذاعة والتلفاز. والتي يمكن لها إدارة وسائل الإعلام الحكومي بعد تأسيس دولة إسلامية خالصة.

خامسا: نشاطات المنظمات غير الحكومية في بنغلاديش:

النشاطات الاقتصادية * الأعمال الخيرية الاجتماعية
على وجه العموم تسمى المنظمات غير الحكومية بـ "NGO". ولكن من ناحية القانون هي تلك المؤسسات الخيرية التي لم تؤسس لأجل الربح وإنما لأجل الخدمة. فمن مجال خدماتها: محو الجهل والأمية، تقديم خدمات الأمومة والطفولة، تطوير المجتمع، وتوزيع القروض بين المحتاجين و غير ذلك. فإذا نظرنا إلى هذه الناحية نجد هذه المنظمات غير ضارة للمجتمع السليم بل تدعي للمدح. ولكن هناك أسئلة تدور في القلوب: هل الوضع الحقيقي هكذا؟ وهل الصورة الحقيقية هي نفس الصورة التي تصفها هذه المنظمات؟ وهل نشاطاتها مركزة فقط على هذه المجالات؟ وبعد كل شيء هل هذه المنظمات تسعى في الحقيقة لصالح الشعب؟ مع الأسف الشديد، إذا ألقينا نظرة الإحساس والشعور في نشاطات هذه المنظمات لا نجد الجواب على هذه الأسئلة إيجابيا؛ لأن جل هذه المنظمات تسعى لصالح أعداء الإسلام وتدبر المكائد والمؤامرات ضد الإسلام والمسلمين.

الأعمال الخيرية:

إن المنظمات غير الحكومية تكتسب أموالا هائلة من الدول الخارجية. وهناك سكان الدول المتطورة حتى الطلاب منهم يقدمون النقود لدى هذه المنظمات لمساعدة سكان بنغلاديش الذين يتعرضون دائما للبؤس والفقر ومن ناحية أخرى للعواصف والفيضانات والكوارث الطبيعية. ولكن هذه المنظمات تتخذ بعض الخطوات القليلة لتطوير المجتمع وتوصيل المساعدات إلى المستحقين و يصرفون جزءا كبيرا بمعدل ٨٠٪ منها لتحقيق أهدافها الخبيثة. وهناك بعض المنظمات هدفها الوحيد هو تنصير المسلمين والهنود الفقراء بتقديم المساعدة استغلالا من ضعفهم وفقرهم. ولهذه الأمور تحاول هذه المنظمات للحصول على التأييد السياسي كما تحاول لبسط شبكة المؤامرات في المجتمع. فيلزم على الدعاة والمؤسسات الدعوية أن يكونوا على علم وبصيرة كاملة وأن يكونوا يقظين وعاة لمواجهة تحديات هذه المنظمات الخبيثة. فينبغي لهم أن يجمعوا الأموال ويحصلوا المساعدات من العالم الإسلامي والمنظمات الإسلامية في العالم لبناء المدارس ودور الأيتام والمستشفيات وتنفيذ الأعمال الخيرية ورعاية الفقراء والمساكين، وإخطار الناس عن مؤامرات المنظمات الخبيثة وأهدافها الفاسدة. وبهذا الطريق يستطيع الدعاة أن ينتصروا على قلوب الناس، وينقذوهم من المؤامرات.

التيقظ والوئام:

إن الشيء الآخر الذي يقوم به المنظمات غير الحكومية جانب مساعدة الناس ومحاولتها للقضاء على الفقر هو إيقاظ الناس وتنظيمهم وإقامة التنسيق والوئام فيما بينهم هدفا إلى استخدامهم للحصول على مصالح هذه المنظمات. ولهذا الهدف أسست منظمات مثل "براك" و "آشا" و "بروشيكا" و "غنو شاستيا" و "كيار" و "إيه دي آر إيس" و "ورلد بيشن" و "نيزيرا كوري" و "غنو شاستيا كيندرو" و "شونيربر بنغلاديش" وغيرها من أمثال هذه المنظمات (أنظر: "دوئنيك بنغلا"، ٢٥ يونيو ١٩٩٤م) إن التيقظ العام حتمي لتطوير البلاد سريعا، ولكن هذا التيقظ عندما يكون بأيدي اليساريين والمعادين للإسلام فلا تكون إلا مؤامرة سرية ضد الإسلام والمسلمين؟ لذا يلزم على الدعاة أن

المثل في عالم الأدب بشعراء الإسلام مثل الشيخ سعدي و الرومي وحافظ وإقبال وغيرهم رغم أنه كان موضوع شعرهم وأدبهم هو الإسلام.

المشاكل التي يعاني منها مسلمو بنغلاديش في الأدب:

من المعلوم أنه لا يمكن الرقي ورفع المستوى الأدبي بدون قراءة واسعة ودراسة عميقة للأدب. فمسلمو بنغلاديش لا يهتمون بقراءة ودراسة الأدب البنغالي ومن ناحية أخرى فإن الشخصيات الإسلامية البارزة قد فشلوا في إرشاد الشعب وتوجيههم نحو هذا الأمر والواقع. حتى أن المؤسسات التعليمية الإسلامية أيضا ليست لها دور حميد في هذا المجال. فهم ليسوا على علم ومعرفة كاملة في أن الإسلام كيف اهتم بالأدب وشجع عليه واستخدمه في أداء دوره، وأن القرآن الكريم قد ارتفع حتى من حيث المستوى الأدبي إلى منزلة لم يوجد له نظير. إن تطوير المستوى الأدبي لا يمكن بالمعنى الصحيح إلا بمساعدة ورعاية الدولة. ولكن في تاريخ دولة بنغلاديش لا توجد أي حكومة اهتمت بهذه الناحية وساعدت على تطوير مستوى الأدب الإسلامي. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض المنظمات والمؤسسات الإسلامية التي كان بإمكانها أن تلعب دورا حميدا في هذا المجال ولكنها لم تهتم بها؛ لأنها تعاني من عدم التخطيط الجاد، وتواجه الظروف الاقتصادية السيئة، وتتعرض لفقدان العاملين المخلصين البارعين والإعداد النفسي لمواجهة جميع المشاكل التي تعوق دون تطوير مستوى الأدب الإسلامي.

فبعد التعرف على هذه المشاكل يمكن لنا أن نقدم بعض الاقتراحات، وهي كما يلي:

- يلزم على الدعاة الذين يقومون بالدعوة في ساحة بنغلاديش أن يفهموا جيدا بأن الأدب والثقافة والفنون هي أثبت وأجود طريقة للدعوة. يمكن إيقاظ مشاعر الناس بكتابة المقالات في الصحف والجرائد وإقامة الندوات و المؤتمرات ومحافل النصح والإرشاد وخطب الجمعة حيث يجتمع المصلون في المسجد.
- الاهتمام بقراءة ودراسة الأدب البنغالي في المؤسسات التعليمية الإسلامية، وممارسة النشاطات الثقافية، وتنظيم المسابقات في مختلف موضوعات الأدب البنغالي، وتقوية الربط والعلاقة بين الأدباء البنغاليين جميعا والتشاور معهم حول الموضوعات الأدبية والمشاركة معهم في المناقشة الأدبية.
- يلزم على المؤسسات والمنظمات الإسلامية أن تكون نشيطة أكثر وأن تتخذ خطوة موضوعية. كما يلزم أن تعلم أساليب علمية لممارسة الأدب وتجلية المواهبات الأدبية ثم يطبقها جيدا.
- مطالبة الحكومة والمؤسسات الحكومية وفرض الضغوط عليها للمساعدة واتخاذ الخطوات الجيدة لتطوير مستوى الأدب الإسلامي والثقافة الإسلامية.

رابعا: وسائل الإعلام و هي قسمان:

الوسائل المطبوعة، والوسائل الإلكترونية

في الحقيقة يتكون المجتمع المتطور بناءا على تعاليم البلاد وآدابها, والوسيلة الأساسية لتطوير مستواهما هي وسائل الإعلام. وفي هذه الناحية سكان دولة بنغلاديش يعتمدون على وسائل الإعلام ويتأثرون بها بشكل كبير. وليس هناك مجال للشك وعدم الاعتراف بأن وسائل الإعلام جعلت العالم كأسرة صغيرة فتنشر الأخبار من قاصي البلاد إلى دانيها. القمر الصناعي والتلفاز والهاتف والكمبيوتر والإنترنيت وفاكس بدأت ثورة إيجابية في وسائل الإعلام. وفي هذا المقال أود تحديد النقاش حول وسائل الإعلام بوسيلتين هامتين. وهما: الوسيلة المطبوعة والوسيلة الإلكترونية.

الوسيلة المطبوعة:

المجلات والصحف والجرائد اليومية والأسبوعية والشهرية والدورية. وهي مرأة الحضارة الحديثة. لها أثر راسخ في حياة الشعب. وهي وسيلة هامة للإعلام وتنظيم الرأي العام. ولأجل كون زمام جل الصحف والجرائد بيد اليساريين المعاندين للإسلام فإنهم يخدعون عامة الناس الساذجين حول الإسلام والدين الإسلامي الحنيف؛ يكتبون عنوان الأخبار استهزاء بأقوال العلماء وآرائهم وتعبيراتهم للأمور الدينية. يدخلون في قلوب عامة الناس بحكمة وذكاء بعد أن يتعرفوا على طبيعتهم وميولهم. لو يريدون أن يبثوا أية فكرة جديدة في نفوسهم فيختارون أسلوبا حكيما، إما بصورة قصة صغيرة عجيبة أو بطريقة طرافة وفكاهة، وهكذا هم يتخيلون ويتفكرون ويبسطون الشبكات لصيد الأمخاخ السقيمة التي لم تبلغ حتى الآن إلى الرسوخ في الدين والعقيدة. ونتيجة عن ذلك يكون صحف اليساريين المدعومين من قبل الأعداء المعاندين وجرائدهم ومجلاتهم العارية أكثر انتشارا وقبولا لدى عامة الناس. فلا يوجد بيت أو مدرسة أو مؤسسة إلا وفيها سيطرة هذه الجرائد. ومن ناحية أخرى فإن الجرائد الإسلامية لم تبلغ إلى ذلك المقام الرفيع من الانتشار والقبولية. فهي تحظى بأي إعلانات حكومية أو دعم مادي و معنوي تعاني المشاكل المادية

أردنا توسيع نشاط الدعوة في هذه المدارس نحتاج أولا إلى البحث عن العلماء والشخصيات الإسلاميين فيها يمكن توسيع نشاط الدعوة فيها بواسطتهم ووسيلتهم. وهكذا يهتدى كثير من الناس إلى الطريق الجاد.

المؤسسات التعليمية التي تديرها الدول الأجنبيه والمنظمات غير الحكومية:

لقد قامت المنظمات غير الحكومية بإدارة حوالي عشرين ألف مؤسسة تعليمية. ومن بين هذه المنظمات غير الحكومية منظمة "براك" فهي أسست جامعة غير حكومية، معترفة من قبل الحكومة. وإضافة إلى ذلك فإن هذه المنظمات أسست عدة مدارس إنجليزية (English Medium School) ما يبلغ عددها إلى ٧ أو ٨ معادلة مع جامعة لندن ومسجلة لدى الملحق الثقافي البريطاني بداكا (British Council). والهدف من هذه المؤسسات هو تغريب آفكار المسلمين والحفاظ على مصالح الغربيين باسم التعليم. فهم يحاولون لتنصير أبناء المسلمين المعصومين وارتدادهم عن الدين الإسلامي الحنيف، وذلك بتعليمهم الدين الإسلامي وتاريخ المسلمين بطريقة مشبوهة، وبث الأفكار الخبيثة وغرس جذور العقائد الفاسدة في نفوسهم. ولكننا نحن المسلمين ساكتون وصامتون.

فإذا أردنا ممارسة النشاطات الدعوية فيما بين المنظمات غير الحكومية فلا بد من مراعاة الأمور التالية:

- تقوية أواصر الربط والعلاقة بهم والعمل بداخلهم.
- إقامة المنظمات الإسلامية كبديل عنها، تقوم بمثل أنشطة تلك المنظمات غير الحكومية.
- توعية الناس عن خطورات المنظمات غير الحكومية على المجتمع السليم.
- تنظيم أقوال الناس وتوحيد كلماتهم وإرضائهم على منع الحكومة عن السماح للمنظمات غير الحكومية بممارسة نشاطاتها.

ثالثا: الأدب والثقافة:

إن الأدب والثقافة والحضارة هي جزء لا يتجزأ عن المجتمعات البشرية، فكلما وجد المجتمع وجد الأدب والثقافة. في ضوء المواهب الفطرية يقوم الأدباء بممارسة الأدب والشعراء بممارسة الشعر، والمتفننون ببناء الذكريات. والذين يطالعون أدبهم ويقرؤون شعرهم ويتمتعون بذكرياتهم فهم يتأثرون بهم تأثرا مباشرا أو غير مباشر، قليلا كان أو كثيرا. فإذا كان الموضوع جيدا كان التأثير إيجابيا. وإذا كان الموضوع فاسدا يكون التأثير سلبيا ومؤديا إلى الفساد النفسي والخلقي والعقلي. فمثلا بمشاهدة الفيلم المرئي الشهير "الرسالة" (The Message) يزداد خوف الله وتقواه ويزداد الإخلاص والحب للإسلام وتدمع العيون برؤية ذكريات الأسلاف المخلصين. وبالعكس لو يرى في نفس الشاشة فيلما فاحشا ممسوخ الذوق تشتعل شهوته وأحيانا يتسبب هذا لانحرافه وضلالته. لذا فإن هذه المجالات تستدعي أهمية كبرى لممارسة الدعوة الإسلامية فيها وتوسيع نشاطاتها حتى تؤثر في نفوس الناس تأثيرا إيجابيا وتنقذ مجموعة كبيرة من الناس من الضياع والضلال.

إذا ألقينا نظرة الإحساس والشعور في الساحة الأدبية في بنغلاديش رأينا أن زمامها وقيادتها بيد القوة المعاندة المعادية للإسلام و المسلمين. فنرى جل الصحف والجرائد يملكها هؤلاء العلمانيون المعاندون، فمن هذه المنابر الأدبية والإعلامية ينشرون الأفكار الخبيثة الفاسدة التي تمس مشاعر المسلمين وتهز كيانهم بطرق مختلفة. فلا نجد أي مقال إلا وفيه هجوم مباشر أو غير مباشر على الإسلام والإسلاميين. ومن هذه الجرائد جريدة "بروتوم آلو" (الضوء الأول) اليومية التي تعد من أكثر الجرائد انتشارا وقبولا. أصدرت هذه الجريدة يوم ١٩٩٩/١١/٤م. في هذه المناسبة قام المسؤولون عن هذه الجريدة بإصدار عدد خاص لها، اشتملت على ست عشرة صفحة، تضمنت عديدا من المقالات التي شنت هجوما مباشرا أو غير مباشر على الإسلام والإسلاميين بطريق يستدعي الانتباه و الإعجاب.

لقد تقدم الأدب البنغالي تقدما ملموسا من حيث مستواه الأدبي. ولكن الأدب البنغالي الإسلامي لم يبلغ إلى هذا المقام ولم يحرز هذا التقدم. وعلى سبيل المثال نذكر شعرا من الأشعار الإسلامية الذي نشرته مجلة "المدينة" الشهرية في العدد الصادر في مايو عام ١٩٩٩م:

أيها المؤمن! صمم لإعلاء كلمة الله — بيديك ارفع راية القسط والعدالة
في جميع النواحي يدب الخلاف والفساد — فلإقامة دين الله نريد الجهاد
أنت ابن الأمة الإسلامية البطلة — فلا تكن خائفا يلحقه الندامة

لا شك أن هذا الشعر جميل ورائع من حيث المعنى والموضوع، لكنه من حيث المستوى الأدبي ضعيف جدا. كان الشعراء المسلمون يكتبون وينشدون الأشعار في عصر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولكن لم يتطرق الضعف إلى شعرهم من حيث المستوى الأدبي لأجل الموضوع، بل كان شعرهم جميلا رائعا لم يقدر أحد أن يعارضهم. وقد ضرب

وفيما يلي سرد لبعض المعلومات عن المؤسسات التعليمية:

١- المدارس الدينية:

نقصد من المؤسسات التعليمية الدينية المدارس التي يجري فيها منهج التعليم الديني. ففي بنغلاديش نلاحظ ثلاثة أنواع من المدارس الدينية:

أ - مؤسسات تعليمية على منهج المدرسة الحكومية- المدرسة العالية:

وهي عبارة عن المدارس التي تجريها الحكومة بتمويلها و تتلقى مساعدات حكومية وتشرف على تجديد مناهجها وإصدار مقرراتها إدارة مجلس التعليم للمدارس الحكومية. وعدد المدارس في مختلف المراحل-حسب إحصائيات حكومة بنغلاديش: المدارس الابتدائية: ١٧٣٥٧، ومدارس "الداخل المتوسطة": ٧٣٩٥، ومدارس "العالم الثانوية": ١٠٢٠ ، ومدارس "الفاضل البكالوريوس": ٨٩٠، ومدارس "الكامل": ١١٥

وإذا ألقينا نظرة الفحص على هذه المدارس و مناهجها و مقرراتها، نجد أنها لم تهدف لتربية الأجيال، فالمتخرجون في هذه المدارس لايتأهلون للقيادة الشاملة في البلاد، فلهم و ظائف! إما في المسجد! أو في المدارس الإسلامية معلما للمواد الدينية، و ليس لهم دخل في الدوائر الرسمية و المكاتب الحكومية، و ليس لهم قدم صدق في تطور البلاد اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا، و للدعوة في هذه المدارس ميادين فسيحة لإجراء الأنشطة الدعوية من ذيلها إلى رأسها.

ب- مؤسسات تعليمية على المنهج "المدارس الأهلية" القومية:

أسست هذه المدارس الدينية تقليداً لمدرسة دار العلوم ديوبند وتأثرا بها هدفا ومنهجا. وأول مدرسة قومية أسست على هذا المنهج في بنغلاديش في عام ١٩٠١م بمنطقة هاتهزاري من محافظة شيتاغونغ. وبعد ذلك انتشرت هذه المدارس بسرعة في ربوع البلاد، وتلقت قبولا واسعا في أوساط الشعب. فوصل عددها حسب إحصائيات عام ١٩٦٤م إلى ٤٤٣ مدرسة. أما الآن فيربو عددها على ستة آلاف مدرسة. أسست هذه المدارس بمساعدة المتبرعين بطريقة خاصة كما تجرى أيضا بمساعدتهم ماديا ومعنويا فليس لها اعتراف حكومي ، فالقائمون على هذه المدارس أسسوا هيئة واسعة النطاق التي تشمل جميع هذه المدارس، وبها ينظمون الاختبارات، وباسمها يصدرون الشهادات. ومن هذه الهيئات: وفاق المدارس، واتحاد المدارس وما شابه ذلك. ففي عام ١٩٧٨م أسست هيئة وفاق المدارس.

ج - المدارس الفرقانية:

في هذه المدارس الفرقانية يجري فيها تعليم القرآن الكريم بأحسن أسلوب. ويزيد عددها على عشرين ألف مدرسة. يوجد هذه المدارس بجوار كل مسجد تقريبا. و في هذه المدارس يمكن القيام بأعمال الدعوة الإسلامية جيدا بتوفيق من الله وعونه. فالأساتذة لو يقومون أثناء الدرس بشرح جميع قوانين الإسلام وعرضه كنظام حضاري صالح بديل لجميع الأنظمة العالمية الفاشلة في تحقيق السعادة والطمأنينة والسلامة والرفاهية في المجتمعات الإنسانية، فحينئذ تخرج الدعوة الإسلامية بنتائج مرجوة؛ لأن هؤلاء الطلاب وهذه الأجيال الناشئة هم رجال المستقبل وبناؤه.

المؤسسات التعليمية من المدارس والكليات والجامعات التي ترأسها الحكومة:

لقد اتخذ الاستعمار البريطاني بعد دراسة عميقة لتاريخ الأمة الإسلامية العريقة خطة ناجحة ومدروسة لتقسيم الشعب وتمزيق وحدتهم وتفريق كلماتهم وهدم كيانهم وغرس بذور الخلاف والتفرقة في نفوسهم حتى يفشلوا ويذهب ريحهم. فقسم التعليم -الذي هو الوسيلة الناجحة لتطوير الشعب والأمة- إلى قسمين: التعليم الديني والتعليم العام. وبهذا الطريق تم وضع جدار متين بين العلوم الدينية والعلوم العصرية. فالطالب الذي يدرس على منهج التعليم الديني بعيد عن العلوم العصرية، والطالب الذي يدرس على منهج التعليمي العصري العام لا يعرف عن الدين إلا أمورا مشبوهة ومنحرفة. وهذا التقسيم الخبيث مازال مستمرا في بلادنا منذ الاستعمار إلى يومنا هذا. وعلى هذا المنهج يوجد مؤسسات متنوعة مثل الجامعة والكلية والمدرسة ومعهد التكنولوجيا وغيرها. وإحصائية هذه المؤسسات كما يلي: المدارس الابتدائية الحكومية ٧٨٥٩٥، المدارس المتوسطة الحكومية٢٣٠٤٩، المدارس الثانوية الحكومية-١٢٥٥٣، الكليات الحكومية (الثانوية العليا)-٤٩، الكليات غير الحكومية-١٣٧٢، الكليات العسكرية-١٠، الكليات الحكومية (بكالوريوس)-٤٣٨ الجامعات الحكومية-١٨، الجامعات الخاصة غير الحكومية- ١٩ كليات الطب الحكومية-١٣، كليات الطب غير الحكومية-٥، كليات الأسنان-٤، كليات الهندسة-٤ ، كليات الزراعة-٤، كليات التكنولوجيا-٢٠، كليات القانون-٢٠، معهد الدبلوم في التجارة-٥ ، معهد التدريب المهني-٢٦، كليات تدريب المعلمين-١١، معهد تدريب المعلمين للمدارس الإبتدائية-٥٤. هذا المنهج التعليمي منهج علماني. فمجال تعليم الدين فيه محدود جدا. لذا نرى أن هذه المؤسسات التعليمية مجالات خصبة للدعوة الإسلامية. فإذا

الطريقة الثالثة: حركة إقامة المجتمع الإسلامي بقيادة السيد/ أبو الأعلى المودودي وقبله الإمام محمد عبده والإمام جمال الدين الأفغاني والإمام حسن البناء الشهيد. وإتباعا لطريقهم وانتهاجا بمنهجهم قامت هناك مجموعة ممتازة بهذه الحركة مثل الشيخ عبد الرحيم والشيخ عباس على خان وغيرهما -رحمهم الله تعالى.

ما ذا تعني كلمة "المجالات"؟:

إن في الحياة مجالات مخصوصة للأعمال حيث يتم تنفيذها فيها. فمثلا مجال الفلاح الأرض والساحة، ومجال الأستاذ المدرسة والمكتبة والكتب والصحف والجرائد، وهكذا فإن للدعوة الإسلامية مجالات كثيرة في ساحة بنغلاديش. وهناك كثير من المجالات التي لم نستخدمها أو لم نبلغ إليها. ففي هذا البحث أحاول تخصيص مجالات عدة تحمل آمالا لنشر الدعوة الإسلامية، كما أحاول عرضا سريعا لأوضاعها الحقيقية الحية. بعد سرد موجز ومناقشة مختصرة حول مجالات الدعوة بين الماضي والحاضر فإننا الآن نحاول للنقاش حول مجالات ووسائل شتى للدعوة الإسلامية. ومن هذه المجالات الدعوية ما يلي:

اولا: النقاش: الندوات والمؤتمرات، مجالس النقاش، والنصح والإرشاد، وحفلات تفسير القرآن الكريم، و الاحتفال بالأيام

الندوات والمؤتمرات:

لا شك أن في الندوات والمؤتمرات فرصة ذهبية لممارسة الدعوة. فهي تساعد في إعداد الشعب والجيل. وكل من جامعات بنغلاديش تعقد مؤتمرات مختلفة حول موضوعات متنوعة هامة، لكنا نلاحظ أن هذه المقالات التي تطرح هناك لا تلائم عامة الناس لأسلوبها الرفيع. وللجامعة أن تعقد موتمرات و ندوات خاصة في الدعوة و أساليبها و مناهجها و تاريخها و خصائصها، وأهدافها الاجتماعية والدينية لربط الدين بالواقع اليومي. وبهذا يمكن أن نستغل هذه الندوات و تلك المؤتمرات في حقول الدعوة كثيرا.

ومن هنا أقترح مايلي:

١. لا بد أن تكون الموضوعات شاملة لجميع الجوانب للدعوة الإسلامية.
٢. أن تكون في متناول عامة الناس من حيث الأسلوب و التيسير.

إقامة ملتقى الفكر الإسلامي: في هذه الأيام تنعقد احتفالات كثيرة لتفسير القرآن الكريم في أماكن مختلفة. وحيث إن المحاضرة تكون مباشرة من القرآن الكريم في مثل هذه احتفالات نرى إقبال الناس كثيرا إليها. ولكن في أغلب الأوقات لا تنجح الحفلة في الخروج بنتائج مرجوة لسبب فقدان التخطيط الجاد الهادف. على سبيل المثال نذكر حفلة تفسير القرآن التي تنعقد في شيتاغونغ لمدة خمسة أيام في كل سنة. يحضر في هذه الحفلة مئات الآلاف من المستمعين ولكنها تفشل في تحقيق هدفها لأجل عدم وجود تخطيط جاد لتحقيقه. ففي مثل هذه الحفلة لا بد أولا من تحديد الهدف، ثم التخطيط الجاد لتحقيقه، وفي ضوء هذا التخطيط يجري العمل على قدر ما يمكن الحصول على الهدف المرجو. فمثلا لو أعلن برنامج تلاوة القرآن الكريم صحيحا من حفلة تفسير القرآن ثم يهتم بإقامة جمعيات أو مؤسسات في كل قرية ومنطقة، وفي العام التالي يقوم بإعداد تقرير مفصل عن البرنامج، ثم يناقشه ثم يخرج بنتيجة موضوعية، ثم يعلن برامج جديدة في ضوء تقرير السنة الماضية. وبهذا الطريق لو يمكن إقامة الربط والعلاقة بين الدعاة وبين الناس فتنتج الحفلة في تحقيق هدفها ويجد الناس ثمرتها ونتيجتها.

الاحتفال بالأعياد المتنوعة:

إن الاحتفال بالأعياد المختلفة أمر معروف في بلادنا. فينبغي للدعاة أن يجمتعوا فيها ليستخدموا هذه المناسبات وسيلة للدعوة مع مراعاة أن لا يكون فيها أي شيء غير إسلامي. مثلا تجميل المسجد ليلة النصف من شعبان وغيرها؛ لأن مثل هذه المزخرفات ليست سببا للإسراف والتبذير فحسب، وإنما هي مخالفة صريحة للإسلام.

ثانيا: المؤسسات التعليمية:

يقال إن العلم هو العمود الفقري للشعب. وكما أن أحدا لا يقدر على القيام دون العمود الفقري، كذلك لا يستطيع الشعب أن يقوم بمجده وكرامته دون العلم. وبدون العلم لا يمكن تجلية المواهب الشخصية. ولأجل ذلك تكلم الإسلام أولا عن التعليم، فكانت أولى آية نزلت هي: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) [العلق: ١] والتعليم الخالص عن الخطأ والشوائب هو تعليم الوحي السماوي الخالد. أما التعاليم المنحرفة المتأثرة بالاتجاهات الباطلة والتي لا يمكن بها الارتقاء الروحي، فهي تعاليم فاسدة لا تفيد شيئا في العاجل والآجل. لذا فإننا نرى جون ميلتون يقول في تعريف **التعليم:** Education is the harmonious development of body, mind and soul (يعني التعليم هو التطور المتناسق للجد و النفس و الروح) ولكن مع الأسف الشديد أن هذه الأهداف لا تتحقق من المنهج التعليمي السائد في بنغلاديش.

وعبد الله وغيرهم من التابعين. وبهذا الصدد نجد حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه قال: لقد وعدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بانتصار الهند، فلو كنت حيا في ذلك الوقت. فهذا الحديث يدل صراحة على أن الصحابة كانوا يعتقدون قدومهم إلى هذه المناطق رمزا للسعادة ويفضلون سفرهم إلى الهند لنشر الدعوة الإسلامية بالمعنى الصحيح. وبدعوتهم دخل الناس في دين الله أفواجا.

خصائص دعوتهم:

١– إن الدعوة الإسلامية كانت في المرحلة الأولى؛ في عصر الصحابة والتابعين إلى التوحيد الخالص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء فريضة الحج، كما كان أصل دعوتهم على تعليم التوحيد وتزكية النفوس.

٢– كانوا يعتقدون أن تعليم الأجيال الناشئة وتربيتهم على الأسس الصحيحة من أهم المسئوليات الدينية، حتى يستطيعوا أن يلعبوا دورهم ويؤدوا مسئولياتهم تجاه الأمة الإسلامية.

آثار دعوتهم:

أ– لم تكن جهودهم محصورة على تضاعف عدد المسلمين فحسب؛ بل كانوا يهتمون كثيرا بتربية المسلمين تربية إسلامية.

ب– كانت طبيعة دعوتهم مركزة على الأعمال الخيرية والتيقظ.

ج– والدعاة كانوا ينتخبون القرى مركزا أو حصنا للدعوة، ومن هنا ينشرونها إلى جميع أرجاء البلاد.

المرحلة الثانية: ابتداء من بنغال بيد اختيار الدين محمد بختيار الخلجي إلى سقوط نواب سراج الدولة. وهي مرحلة ذهبية للدعوة الإسلامية. لقد كانت الدعوة الإسلامية تجري بالتعاون والتنسيق بين الدعاة والسلطة، فرأينا العلماء في ذلك العصر منقسمين إلى فئتين:

الفئة الأولى: وهم الذين كانوا يعتكفون في المساجد والمعابد، ومن هنا ينشرون الدعوة الإسلامية بين الناس، منهم: الشيخ شاه جلال، شاه فران، بدر شاه، خان جهان علي وغيرهم. ففي ذلك العصر كان هؤلاء الدعاة يضحون بنفوسهم لنشر الدين الحنيف وإعلاء كلمة الله العزيز فيها بين الناس. فبدعوتهم المخلصة دخل الناس في دين الله أفواجا في حين كانوا متورطين في التفرقة العنصرية ومشتتين إلى فئات دينية مختلفة ومعانين من جور الأديان الباطلة.

الفئة الثانية: كانت طبيعة دعوة هذه الفئة مغايرة عن الفئة الأولى، فهم لأجل ذلك أسسوا أولا المدارس والجامعات، فمن هذه المؤسسات التعليمية التي تذكر في التاريخ: مدرسة دار الخيرات لركن الدين كائكواذا، ومدرسة شرف الدين أبو توامة بشونار غاؤن، ومدرسة تقي الدين عربي بموهي سنتوش، وغيرها.

المرحلة الثالثة: بعد سقوط نواب سراج الدولة حتى مغادرة بريطانيا من شبه القارة الهندية عام ١٩٤٧م. وهي الفترة العصيبة للدعوة.لقد واجهت الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة بعراقيل متنوعة وعوائق مختلفة. وعلى الرغم من ذلك تتلألأ صفحات التاريخ بنشاطات نخبة ممتازة من الدعاة المخلصين الذين لعبوا دورا رائدا في نشر الدعوة الإسلامية قائمين على صخرة الإيمان والتوحيد والوحدة الإسلامية. وبهذا الصدد يذكر ثورة العلماء و المشائخ، وحركة الدولة الإسلامية بقيادة السيد الشهيد أحمد بن عرفان البريلوي، وحركة الفرائض بقيادة الشيخ/ شريعت الله، وهكذا نشاطات الجماعة التبليغية التي تأسست بيد الشيخ محمد إلياس قبل عقود من الزمان ومازالت مستمرة حتى الآن على هدفها ونشاطاتها وطريقة دعوتها.

المرحلة الرابعة: من عام ١٩٤٧م إلى يومنا هذا، وهي النهضة الإسلامية الحديثة Islamic Renaissance

هناك طرق عديدة لنشر الدعوة الإسلامية في بنجلاديش، وفيما يلي بيان ذلك:

الطريقة الأولى: بعد المرور من الفترة العصيبة قامت جماعة من العلماء المثقفين والدعاة المخلصين بتأسيس مدارس مختلفة. ومن هذه المدارس كانوا ينشرون الدعوة الإسلامية بإعداد أجيال مثقفة وكوادر مخلصة للقيام بعبء مسئوليات الدعوة.

الطريقة الثانية: بممارسة الآداب الإسلامية ودعوة الناس إلى التثقف بالثقافة الإسلامية الراقية التي كانت في زعامتها الشاعر المحنك الكبير محمد إقبال، وتأثر بنشاطاته الأدبية الشاعر المناضل قاضي نذر الإسلام والشاعر فروخ أحمد والشاعر غلام مصطفى إلى هذه الساحة الأدبية والثقافية والفكرية لتجلية مواهب الأمة الإسلامية، وتذكيرهم بنشاطات وذكريات الأسلاف الذين بذلوا قصارى جهودهم لنشر العلم والدين وترويج الخير في مجتمعات البشر حتى اعترف بدورهم العدو قبل الصديق.

الدعوة الإسلامية في بنجلاديش: الواقع والمتوقع

البروفيسور الدكتور محمد غياث الدين حافظ*

اختلف العلماء في تعريف الدعوة الإسلامية تبعا لاختلافهم في تحديد معني الدعوة من جهة و تفاوت نظراتهم إليها من جهة أخرى، والتعريفات للدعوة كما يلي:

ذكر الشيخ محمد الغزالي بأن الدعوة "برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم، وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين." وكما قال **أحمد غالوش** بأن الدعوة هي: "العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلي تبليغ الناس الإسلام مما حوى عقيدة و شريعة وأخلاقا.

وعرف **الدكتور عبد الرؤوف شلوي** الدعوة بقوله: "الحركة الإسلامية فى جانبيها النظرى والتطبيقى" أي أن ظاهرة الدعوة الإسلامية هي أن تروج في المجتمع هيئة يستطيع بها السكان أن يغيروا عقيدتهم السابقة ويؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر إيمانا راسخا فيعود المجتمع من الظلمات إلى النور، ويجد سكانها طريقهم الجاد إلى الحق والثواب، وبهذا يتحقق فلاح العاجل والآجل معا.

أصل الدعوة الإسلامية:

هناك بعض العلماء يعتقدون أن الدعوة الإسلامية بدأت من سيدنا نوح عليه السلام، ولكن بعد البحث والنظر الدقيق نرى أن هذا الرأي غير صحيح، بل أبونا آدم عليه السلام هو الذي بدأ بها. فنرى ابنه هابيل يقول لأخيه قابيل — كما يحكي لنا القرآن : (لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين) [المائدة: ٢٧–٢٨]

فيفهم من هذه الآية أن الدعوة قد بدأت من عصر آدم عليه السلام، وبعد ذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين بالوحي السماوي إلى أقوامهم في فترات مختلفة من الزمن ليقوموا بالدعوة الإسلامية، و يدعوا أقوامهم إلى الدين الحق الذي ارتضى به الله. نرى سيدنا نوحا وإبراهيم ويوسف وموسى وعيسى ونبينا محمدا– عليهم الصلاة والسلام– كلهم سلكوا نفس الطريق وتمسكوا بنفس المنهج. وآخر الكتب السماوية الذي نزل على خاتم المرسلين هو كتاب دعوي، إلا أنه لم يسم بكتاب الدعوة، بل هو قران مجيد في لوح محفوظ.

وقد ورد في القرآن الكريم: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [آل عمران: ١٠٤] فيصح لنا أن نقول بصراحة: بأن جميع الأنبياء والمرسلين ونبينا محمدا –صلى الله عليه وسلم– كانوا دعاة مخلصين.

وقد ورد لفظ "الدعوة" في ستة مواضع من القرآن الكريم بكلمة "الدعوة" كما وردت في أماكن كثيرة اشتقاقاتها. ففي جل الأماكن استعملت كلمة "الدعوة" بمعنى الدعوة إلى الطريق الحق. لذا فإن هذه الكلمة ليست كلمة مبتدعة.

الدعوة الإسلامية في بنغلاديش بين الماضي والحاضر:

عند تقسيم مراحل الدعوة الإسلامية في بنغلاديش **الدكتور قاضي دين محمد وعبد المنان طالب** قسماها إلى ثلاث مراحل ولكن بعد الفحص والتدقيق يمكن لنا أن نقسمها إلى أربع مراحل:

المرحلة الأولى انتشار الدعوة الإسلامية بدون إشراف السلطة، وذلك من عام ٦٣٠م إلى عام ١٢٠٤م. بقدوم الصحابة والتابعين. يشهد لنا التاريخ بأن هناك مجموعة من الصحابة والتابعين قدموا إلى شبه القارة الهندية لنشر الدعوة الإسلامية إلى المناطق الشرقية، فمنهم أبو وقاص مالك بن الوهيب من الصحابة، ومأمون ومهيمن وأبو طالب

*البروفيسور قسم علوم القرآن والدرسات الإسلامية

Universal Declaration of Human Rights وفي البند الـ ٤٣ من International Covenant on civil and Political Rights (ICCPR).

إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد حدد علاقة المسلم مع المسلم في هذه الخطبة، فذكرفيه: " إنما المؤمنون اخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم". وأيضا: قال: " إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب" . هكذا رفع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لواء الأمة الإسلامية والأخوة الإسلامية. وقد نجد ذكر علاقة الناس مع الناس والأخوة العالمية في بند الأول من منشورات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان The Universal Declaration of Human Rights

ولقد اهتم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اهتماما بالغا في تحقيق حقوق العبد، وذلك في وصيته التي رواها عنه أبو ذر الغفاري ـ رضي الله تعالى عنه ـ " اخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فيلطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم."(صحيح البخاري، ج١، ص٩.) ليس ذلك فحسب. بل إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فك رقبة زيد بن حارثة ـ رضي الله عنه ـ وتبناه، وأعلن حقوق العبد كحقوق الأحرار. وهذا مانرى صداه في النبد الـ ٤ من The Universal Declaration of Human Rights وفي البند الـ ٨ من International Covenant on civil and Political Rights (ICCPR)

إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد دس فكرة التفرقة العنصرية على أساس اللون أو القبيلة أو الطائفة أو الجنسية، وجعل جميع الإنسان سواسية من حيث الحقوق والمكانة الإنسانية، حيث قال: " ليس لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى". وانطلاقا من هنا نرى أنه قد ذكر في البند الأول من The Declaration on the Elimination of all forms of Racial Discrimination. بأن اللونية هي جرم عظيم ضد الإنسانية. وأيضا في The United Nation Charter ، وفي The Universal Declaration of Human Rights بأن اللونية هي

من العقبات والعوائق التي تعرقل الأخوة والمودة والاستقرار في العالم.

هكذا فقد ثبت لنا : كيف كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دائم اليقظمة والاهتمام بتحقيق حقوق الإنسان والتأكيد عليها، والإدلاء بتوجيهاته وتعليماته العظيمة الهادفة إلى حمايتها من التعرض لأي نوع من الانتهاكات. وما وصلت إليه الحضارة العالمية اليوم عبر قرون محتلفة من وضع القوانين واللوائح حول حقوق الإنسان ، ما هو إلا مظهرا من مظاهر التأثر بذلك الموقف الإنساني العظيم الذي قدمه نبي الرحمة والإنسانية.

الختام:

وفي الختام نستطيع أن نقول : إن القوانين الوضعية التي عالجت قضية حقوق الإنسان منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا، لم تعالجها تلقيائيا. إنما فعلت ذلك مضطرة مكرهة، في وجه المطالبة الشعبية الملحة، إما عن طريق الحركة المنظمة، أو بالثورة العارمة الغاضبة من قبل البؤساء والمحرومين. ومع ذلك فإنها لم تستطع أن تحقق حقوقهم وتوفي بمطالبهم الأساسية التي طالما ترقبوا لها.

بينما كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أعلن عن حقوق الإنسان ابتداء وتلقائيا، دون إجبار أو مطالبة من أحد. وإنما تلبية لنداء الفطرة الإنسانية، وإحساسا منه بضرورة توفية المتطلبات اللازمة للحياة البشرية، وتنفيذا لقانون السماء على الأرض، فكانت توجيهاته وتعاليمه ربانية في الجوهر، وإنسانية في الطبيعة، وشاملة في المعاني، ومستقلة بثقافتها وأفكارها، وصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، ومحققة للخير والسعادة لكل البشر، دون تفرقة عنصرية أو طبقية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومتضمنة الكرامة الإنسانية بكافة صورها وأشكالها، وحاملة في طيها القيم والأخلاق الإنسانية السامية، وكفيلة للإنسان ببناء مجتمع مثالي، يسوده العدل، والأمن، والأمان، وترسيخ حضارة عالمية منشودة.

ويتضح موقف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من حقوق الإنسان في الخطبة التاريخية التي ألقاها الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي ملك الحبشة، والتي تعتبر نموذجا رائعا في مجال المفاوضات والعلاقات الدبلوماسية، حيث جاء فيها : "أمرنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم، والدماء. ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات".

إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد هاجر إلى الطائف بعد ما ضاقت عليه أرض مكة بما رحبت، ولكنه قد أصيب من أهل الطائف من الأذى والمحنة والتعذيب، فرجع إلى قومه بمكة. فصار أهل مكة أشد عضبا عليه ، وحاولوا أن يمتحنون، ففي هذه الحالة الضيقة كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعرض نفسه يوما على قبائل العرب في الموسم، ويدعوهم إلى الإسلام، ويخبرهم بأنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه، فعرض نفسه يوما على رجال الخزرج الذين وفدوا إلى مكة من يثرب لأداء الحج، فلقيهم بالعقبة، وكان عددهم اثنا عشر، وعلى رأسهم عبادة بن الصامت ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، فبايعوا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على : "ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولايزنوا، ولايقتلوا أولادهم، ولايأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصون في معروف" . ففي هذه البيعة ـ نحن نلاحظ ـ : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد اهتم بحقوق الإنسان، وهي حق اختيار الدين، والحق على حفظ النفس والمال والعرض.

إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد هاجر من مكة إلى المدينة المنورة سنة ٦٢٢هـ ، وكانت سكان المدينة يومئذ على ثلاثة أقسام، وهم : المسلمون المهاجرون والأنصار، والمشركون، واليهود. وهكذا نرى أن سكانها وقتئذ كانوا من مختلف الأديان والأجناس، ولكن كلهم قد ساعدوا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأووه ونصروه، وجعلوه على رأس الحكومة. فنفذ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هناك دستورا باعتباره رئيس الحكومة، واتفق معهم على معاهدة، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، وشرط لهم و اشترط عليهم حيث ورد فيها :

"أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم هم أمة واحدة. فيلزم لقبائل يثرب الدية للقتل والفدية تعانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، والمسلمون الذين عليهم الدين وكثرة العيال، فالمسلمون الباقون يعطونهم الفدية أو العقل بالمعروف. وأيضا اشترط النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا يجير مشرك مالا لقريش، ولا نفسا، ولا يقتل مؤمنا من دون جناية توجب القتل. ولليهود دينهم ، وللمسلم دينهم، وأموالهم وأنفسهم. ثم ذكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حقوق اليهود في المجتمع، فنجد في هذا الدستور ٥٣ بندا، وأكثرها يعالج حقوق الإنسان، مثل: المساواة في المجتمع، والحرية الدينية، وحق النفس، والعرض، والمال، وحق المواطنين.

وإننا نجد في خطبة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي ألقاها في حجة الوداع ضوءا خاصا وعناصر جوهرية حول حقوق الإنسان، وهذه هي الخطبة القيمة التي تأثرت بها واستفادت منها جميع القوانين التي وضعت في قضية حقوق الإنسان. قد ذكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه الخطبة التاريخية: " أيها الناس! إن دمائكم وأموالكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" . ثم قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " فمن كانت عنده كانت عنده أمانة، فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولاتظلمون، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعيرة، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية". قد أخذ موضوع أمن الحياة والمال مكانة في إعلان الأمم المتحدة سنة ١٩٤٨م حول حقوق الإنسان في بنود: ٣، ٦، ١٧.

وأيضا فقد ذكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في خطبته تلك حقوق الزوجين والمرأة، حيث قال:" إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حقا. ولكم عليهن : ألا يؤطئن فرشكم غيركم ، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة مبينة. واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئا.وأنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله. واتقوا الله في النساء".

وما نراه اليوم في الوثائق والاتفاقيات العالمية حول حقوق الإنسان، ما هي إلا إنعكاسات لهذه التعاليم والمبادئ السامية التي جاء بها نبي الإسلام الرحمة. حيث نجد بحثا خاصا لحقوق المرأة والزوجين في البند الـ١٦ من The

هذا الدستور حجر الزاوية في تاريخ الحقوق الإنسانية، بل في تاريخ الحكومات المستقلة أيضا. ويطلق عليه أيضا : "Charter of English Liberties". ثم ألغى الملك هذا الدستور ، وحاول لانتهاك الحرمات والتعدي على أعراض الناس وحقوقهم، مما أدى إلى نشوب معركة دامية بين الملك والرعية، وانتهت إلى إبرام دستور آخر عرف في التاريخ بـ "The Petition Of Rights" ، وذلك في سنة ١٦٢٨م. وفي سنة ١٦٨٩م إنه قد تم إصدار دستور آخر، بعنوان: "The Bill of Rights" . فبهذه الوثائق انتقصت هيمنة الملوك وسلطاتهم الاستبدادية، حتى اضطروا إلى إعطاء الرعايا حقوقهم الشرعية في العدالة والقضاء وغيرهما . ولهذا سميت هذه الوثائق الثلاثة : "The Bible of English Constitution" . وهي ما شجعت ودفعت شعوب الأمريكا الشمالية وفرانسا إلى تصعيد الحركة والثورة الشعبية ضد حكوماتهم في المطالبة بحقوقهم التي انتهت إلى إصدار قانون باسم "Bill of Rights"، في سنة ١٧٧٦م، ضمانا للحقوق الأساسية لسكان أمريكا، الذي كان ينص على :

"All men are by nature fully free and independent, and have certain inherent rights...namely the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property and obtaining happiness".

ثم بعد ذلك أعلنت أمريكا عن استقلاليتها (Declaration of Independence)،

ووضعت لها دستورا، ذكر في مقدمته :

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with creation in alienable rights that among those rights are life, liberty and pursuit of happiness".

وفي سنة ١٧٨٩م أصدر الثوريون الفرنسيون إعلانا عن حقوق الإنسان باسم: "Declaration of rights of man and the citizen". الذي كان ينص على: "Men are born and remain free and equal in rights".

وذكر فيه أيضا من الحقوق : حق الحرية، وحق التملك، وحق الأمن والأمان، وحق الحرية الدينية، وحق الحرية الفكرية. ثم استمدت أوروبا وبلاد آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من البلاد فكرة حقوق الإنسان من فرانسا وأمريكا.

موقف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من حقوق الإنسان:

ولد نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مجتمع العرب، وكانت البداوة سائدة على هذا المجتمع، فحرم هذا المجتمع من الحضارة والمدنية عبر التاريخ. وما كانت هناك حكومة مركزية، فكان لكل قوم شيخ مستقل. وكانت سيادة مكة في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أيدي أبي جهل وأبي لهب وعتبة وشيبة، الذين كانوا يأتون الفاحشة ويقطعون الأرحام ويسيئون إلى الجوار، ويأكل القوي منهم الضعيف، وما كانت فيهم أي فكرة عن حقوق الإنسان، حتى بعث الله فيهم الرسول الأكرم محمد بن عبد الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد لاحظ منذ صباه أن الناس ينهمكون في القتال والجدال في أدنى شيئ ويشتغلون في الحروب الدامية دون أي سبب معقول، ويأكلون أموال اليتامى ظلما ، وينتهكون حرمات النساء والأرامل، فالضعفاء يحرمون من حقوقهم الأساسية في هذا المجتمع، في هذه البيئة كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينمو ويترعرع، فلما بلغ أشده ووصل إلى عنفوان شبابه،ساهم في تنظيم منظمة اجتماعية باسم " حلف الفضول"، تهدف هذه المنظمة إلى إقامة الأمن والسلام في المجتمع وإزالة الفتنة، وإقامة الأمن في طرق المسافرين والوافدين ومساعدة البؤساء والفقراء والمساكين والأرامل، ونصرة المظلومين، وإجلاء الظالمين عن مكة.

هكذا حاول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في إقامة حقوق الإنسان في المجتمع قبل مبعثه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، كما نجد ذلك في لسان شريكة حياته خديجة بنت خويلد ـ رضي الله تعالى عنها ـ في بداية نزول الوحي حينما قال لها : " لقد خشيت على نفسي". فقالت: "كلا، والله ما يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق".

الأول : الحقوق الاقتصادية، وهي حقوق المطعم والملبس والمسكن والعلاج، وحقوق الحصول على الوظيفة وممارسة الحرفة، وحقوق الفقراء والمساكين والمحرومين في أموال الأغنياء وغيرها.

الثاني : الحقوق الاجتماعية، وهي التي يتساوي فيها جميع الإنسان، بقطع النظر عن اللون والجنس والعرق والدين أو الموقع الجغرافي. مثل : حرية الفكر، وحرية إبداء الرأي، وحرية الدين، وحرية تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية.

الثالث : الحقوق الأخلاقية. ومن أمثلته : عدم التدخل في حق الآخرين. وحق محاربة الفحش والعرى. وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحق العطف والحنان للصغير والتوقير للكبير، وحقوق الأيتام والمحرومين على المجتمع.

إن العالم في العصرالراهن لايفهم من حقوق الإنسان إلا تلك التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في مجلسها العام في ١٠ دسمبر١٩٤٨م ، باسم (The Universal Declaration of Human Rights) ، والتي تحتوى على ٣٠ بندا مما يتعلق بحقوق الإنسان، من بينها ١٩بندا يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، و٦ منها يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبإمعان النظر في التاريخ البشري يتبين لنا ما ارتكبه الحكام المستبدون وجبابرة وطواغيت المجتمع من الظلم والاضطهاد في حق الضعفاء والمستضعفين، في كل بقعة من الأرض، وفي كل زمن، منذ أن مكن الله الإنسان في الأرض. وما شرعوا من القوانين والعادات والتقاليد مما تخدم مصالحهم ويحقق مطامحهم فقط على حساب حياة أولئك المحرومين. وهذا ما جعل تلك الجبابرة والحكام الظالمين يتصدون لدعوة الأنبياء والرسل كلما جاءوا إليهم بالدعوة إلى الله، وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للإنسان. كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) [سبأ: ٣٤] ولذا كانت حرب الأنبياء والرسل ضد الأقوياء والطواغيتَ، في مطالبة حقوقَ الضعفاء منهم وإيصالها إليهم.

يقول جون لوك (John Loke) : إن الإنسان خلق بحقوق كثيرة، فحقوق الحياة والمال والحرية هي من الحقوق الأساسية التي أقرها الإنسان منذ قديم الزمن. وقد حصل عليها الإنسان في المجتمعات البشرية ما قبل التاريخ، ثم أن نظم الحكم الحديثة قد اعترفت بتلك الحقوق، وبذلت جهودها للحفاظ عليها.

حقوق الإنسان عبر التاريخ:

إن فكرة حقوق الإنسان هي فكرة قديمة. و في قديم الزمان فقد قام الملك حمورابي (٢١٣٠ - ٢٠٨٨ق.م) بوضع قانون ينص على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان قبل مبعث عيسى ـ عليه السلام ـ بألفي سنة. ويعتبر هذا القانون هو الأول من نوعها، ويسمى بقانون حمورابي أو القانون البابلي (Babylon Code) . ويوجد في تاريخ الإغريق القديم والرومان: أنه كان الناس حينذاك يتمتعون بحقوق كثيرة، مثل حق التصويت والانتخابات، والحقوق القضائية وغيرها.

وفي القرن السابع الميلادي بعث الله نبينا محمدا ـ صلى الله عليه وسلم - إلى كافة الناس بالرسالة الخاتمة ، تتسم بالشمولية والعمومية والعالمية والصلاحية للتطبيق في كل زمان ومكان، فلعبت دورا أساسيا وحيويا في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها، فأحاديث الرسول وتوجيهاته وأعماله وميثاق المدينة وخطبته في حجة الوداع، ماهي إلا محاولة تاريخية، وخطوات فعالة واقعية في تحقيق حقوق الإنسان وحمايتها من الضياع والتدنيس.

فلما ابتعد الناس عن التمسك والالتزام بمبادئ الإسلام وتعاليمه السامية، تسلط عليهم الحكام الظالمون والطواغيت، فحرموا الرعية وعامة الشعب من حقوقهم، إلى أن حدثت الثورات الشعبية الغاضبة العارمة ضد أولئك الحكام الغاشمين الديكتاتوريين، في المطالبة بالحقوق الأساسية، مما أدى إلى إبرام الوثائق والاتفاقيات بين الحكام والمحكومين حول الحقوق الأساسية.

ففي سنة ١١٨٨م ناضل سكان جزيرة سيبيريا للحصول على حقوقهم الأساسية في الحرية الذاتية، وأمن الحياة وكرامتها، وحق المسكن والتملك من الملك –الفنس. ثم بعد ذلك قد أعلن ملك المجر –الهنغري– اندرو الثاني عن حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين في سنة ١٢٢٢م. وفي سنة ١٢١٥ الميلادية أصدر الملك "جون" (John) في بريطانيا دستورا أساسيا لحقوق الإنسان الذي اشتهر في ا لتاريخ بـ "Magna Carta" . والذي كان يتكون من ٦٣ بندا. يعد

حقوق الإنسان وموقف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منها

البروفيسور الدكتور/ أبو القاسم محمد عبد القادر*

تقديم:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،فإن الله سبحانه وتعالى قد شرف الإنسان وكرمه في هذا الكون، حيث قال : (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا) [بني إسرائيل: ٧] ومن مظاهر هذا التشريف وذاك التكريم: أنه قد أعطى الإنسان حقوقا كثيرة، تتمثل في نواحي الحياة الإنسانية الخلقية والفطرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والحضارية. ومع ذلك فقد تعرضت الإنسانية ـ وما زالت ـ للحرمان من هذه الحقوق وانتهاكات صارخة لأغراضها وحرياتها، على مر العصور والأزمان .

وقد اتخذ نبي الإنسانية والرحمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ الخطوات العملية اللازمة الكفيلة بتنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، إلى أن وصلت جميع الحقوق إلى مستحقيها الشرعيين. بالإضافة إلى توجيهاته وإرشاداته القيمة التي من شأنها أن تؤدي دورا فعالا في حمايتها والحفاظ عليها، والتي استفاد منها العالم بأسره عامة، والأمة الإسلامية خاصة. ولكن الحضارة المعاصرة المادية قد اخترعت طرقا تمس كرامة الإنسان، وتنال من شرفها، وتعرضها للهوان والابتذال. ومن ثم فإن قضية حقوق الإنسان قد أصبحت تشكل خطورة بالغة وأهمية قصوى من بين القضايا التي تهم العالم المعاصر شرقا وغربا. وفي القرن العشرين الميلادي شهد العالم الحربين العالميتين الكبيرتين اللتين راحت ضحاياها آلاف الملايين من الرجال والنساء الأبرياء، فوق ما لحق بالحضارة الإنسانية من الدمار والخراب الشامل من جراء تلك الحروب الملعونة. وفي ظل هذه الظروف القاسية الأليمة فقد أعلنت الأمم المتحدة في عام ١٩٤٨ م بما أطلقت عليه : The Universal Declaration of Human Rights (الإعلان العالمي حول حقوق الإنسان). وفي هذا البحث سنحاول ـ إن شاء الله ـ إلقاء الضوء على قضية " حقوق الإنسان وموقف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منها" بإيجاز.

مفهوم حقوق الإنسان :

تترجم لفظة "حقوق الإنسان" في الإنجليزية بـ "Human Rights"، وهي مشتقة أصلا من الكلمة الفرنسية "Droits de L'home" . وأن أول من استخدمها هو العالم توماس فين (Thomas Paine) في سنة ١٧٨٩م، وذلك في قرارات الجمعية القومية الفرنسية. ثم استخدمتها السيدة إيليا نور روزابلت (Mrs. Elenor Roosevelt)، في منشورات الأمم المتحدة حول الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان (The Universal Declaration of Human Rights). وإلى جانب هذا، فإننا لو بحثنا عن كلمة " حق" أو " حقوق" في أحاديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لوجدناهما قد أستخدمتا فيها في نفس المعنى في مواضع كثيرة قبل أربعة عشر قرنا . إن حقوق الإنسان هي الحقوق الأساسية التي تثبت للإنسان بمجرد الولادة، وهي التي تحتفظ بالقوانين والقيم الأخلاقية للإنسان. وذاك كما يقول العلماء السياسيون والاجتماعيون : إن حقوق الإنسان هي الحقوق الأساسية للإنسان التي يحفظها الحكام للمواطنين؛ فإن الإنسان كيان اجتماعي بطبيعته، بحيث لا يمكنه مواصلة الحياة على وجه هذه الأرض، إلا بمساعدة من الأخرين. ومن هنا كان على إنسان مراعاة المسئوليات والواجبات تجاه الإنسانية. وهي التي تطلق عليها كلمة" حقوق الإنسان". وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي:

---

* عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

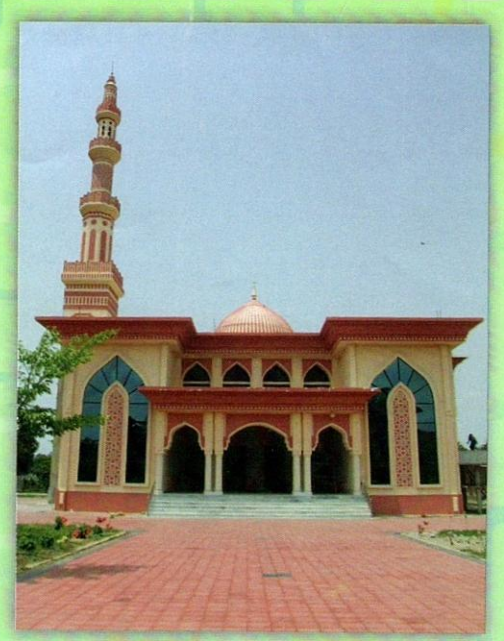

IIUC কেন্দ্রীয় মসজিদ

IIUC শরীয়াহ অনুষদ

IIUC কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

IIUC বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ

IIUC উসমান (রাঃ) ছাত্রাবাস

IIUC ক্যাম্পাস

المحتويات

حقوق الإنسان وموقف النبي ﷺ منها ١

البروفسور الدكتور أبو القاسم محمد عبد القادر

الدعوة الإسلامية في بنجلاديش: المجالات المتنوعة والقع والمتوقع ٦

الأستاذ الدكتور محمد غياث الدين حافظ

التقليد: المشروع منه والممنوع ٥١

الأستاذ محمد شفيع الدين المدني

استراحة المجلة ٠٢

لقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم ناصر الحمود

المسلون والتحديات المعاصرة ٢٢

الدكتور محمد سراج الدين

غزو الفضاء بين العلم والقرآن ٤٢

الأستاذ محمد رشيد زاهد

أهداف التفكر والاعتبار ومجالاتهما ٦٢

الأستاذ محمد شفيق الرحمن

التربية البيئية في الإسلام ٨٢

الأستاذ محمد معين الدين

الإنسان المعاصر والعبودية ٠٣

الأستاذ السيد أحمد الجنيدي أحمد

أدب الدعوة الإسلامية في عصوره المختلفة ٢٣

الأستاذ شاكر عالم شوق

مسئولية الشباب فى نشر الوعي الإسلامي ٤٣

محمد رياض الحق عبد المنان

الرحلة التربوية ٥٣

محمج عبيد الله

دخول عام وخروج عام ٦٣

عبد الولي علي صومالي

الرائد

الراعي

الأستاذ محمد شفيع الدين المدني

المستاشرون

الأستاذ الدكتور محمد غياث الدين حافظ

الدكتور محمد سراج الدين

الأستاذ محمد رشيد زاهد

الأستاذ محمد مصطفى كامل

الأستاذ محمد علي حسين

الأستاذ محمد معين

رئيس التحرير

الأستاذ محمد شفيق الرحمن

هيئة التحرير

الأستاذ محمد هارون الرشيد

الأستاذ محمد عارف بالله

أسرة التحرير

محمد سهيل صالح

محمد أفلاطون كوثر

محمد خالد مرشد

محمد فخر الدين

معروف العالم

المساعدون

محمد شهيد الإسلام

إفتخار أحمد

إلياس أرمان

محمد غياث الدين

محمد شهاب الدين

الكتابة

محمد مبين الرحمن

محمد عبيد الله خان

محمد عتيق حسين

الرائد

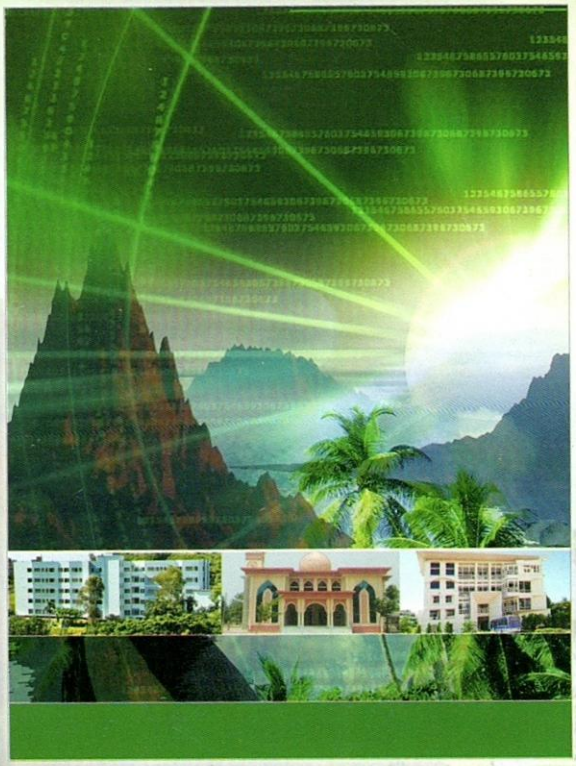

Qur'anic Sciences & Islamic Studies
International Islamic University Chittagong

قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, CTG.
Acc. No: D-708
Date: 23